সজনে নির্জনে

নিখিলচন্দ্র সরকার

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচবণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮৩

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

মুদ্রাকব :
শ্রীনিশীথকুমাব ঘোষ
দি সত্যনাবাযণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সবণী
কলিকাতা-৭০০০০৮

অকৃত্রিম সুহৃদ

৺বিশ্বরঞ্জন দে-র

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

এমনিতে কেউ এখনো আলাদা হয়ে যায়নি। তবে আসা-যাওয়া কমে গেছে। আগের টান আর নেই। তিনি আছেন বলেই সুতোটা ধরে রেখেছেন। এখনই এর একটা বিহিত করা দরকার। এই বাড়ি তিনি আর কতদিন পাহারা দেবেন! তাঁরও তো বয়েস হয়েছে। কল্যাণীরও একদিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন তো এটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি হবে। এসব কথা ভাবলে মনের মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে ক্ষীরোদবাবুর। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বড় দুই মেয়ে বাসনা আর জয়ন্তী। একজন কলকাতায়, অন্যজন দিল্লীতে থাকে। ওদের দুজনেরই খুব ভাল বিয়ে হয়েছে; বড় জামাই সুব্রত কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়র। মেজটির দিল্লী ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টে অধ্যাপনার কাজ করে। গেল বছর ও ডক্টরেট করেছে। মেয়ে দুটোর কপাল ভালই বলতে হবে। বাসনার দুই মেয়ে। ওর বড় মেয়ে মৈত্রেয়ী বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। এবার সেকেণ্ড ইয়ার হলো। ছোট মেয়ে রাণা নাইন-এ পড়ে। ইউম্যানিটিজ গ্রুপ।

জয়ন্তীর এক ছেলে। শুভ। ও-ও এবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেবে। শুভ পড়াশুনোয় খুবই ভাল।

ওরাও ছেলেমেয়ে সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। আগের মতন আর ঘন ঘন আসে না এখানে। তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর হয়ে যায়, তারপর হয়তো হুট্ করে কেউ এলো। ক'দিন থেকেই আবার চলে যায় ওরা। ওদেরও দোষ নেই। ওরা এসে যেন তাঁর নিঃসঙ্গতা, দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। খুব খারাপ লাগে।

ক্ষীরোদবাবুর দুই ছেলে হিমাংশু আর প্রবীর। বড় ট্রম্বে অ্যাটোমিক এনার্জিতে কাজ করে, বোম্বের বান্দ্রায় থাকে। অন্যজন পাটনায়, ডাক্তার। মোটকথা পরিবারটি ছোট নয়, বড়ই। জয়েণ্ট ফ্যামিলি। ক্ষীরোদবাবুর বড়দা আশুবাবু। তাঁর ছেলেমেয়েরাও কেউ এসে এখানে বরাবরের জন্যে থাকে না। সাত-আট বছর হয়

আশুবাবু মারা গেছেন। তিনি এখানেই থাকতেন, রেল কোম্পানীতে কাজ করতেন। আশুবাবুর একটিমাত্র ছেলে। মণিময়। মণিময়ই এ-বাড়ির ভাইবোনদের মধ্যে সকলের বড়। মণিময় কলকাতায় থাকে ওখানেই কাজ করে। মণিময়ের তুটিই বোন—অঞ্জলি ও কৃষ্ণ অঞ্জলির অনেক আগেই বিয়ে হয়েছে। তার বছর পাঁচেক প' কৃষ্ণার। অঞ্জলিরও খারাপ বিয়ে হয়নি। ওর স্বামী শিবেনের ব' ব্যবসা আছে। টাকা-পয়সাও এই ক' বছরে ওর আরো বেড়েছে এক কৃষ্ণারই যা কপাল মন্দ। বিয়ের তিন-চার বছর পরেই ওর স্বামী অ্যাকসিডেন্ট-এ মারা গেছে। একটি ছেলেই এখন ওর একমাত্র সম্বল।

আশুবাবুর মৃত্যুর পরও হেমলতা বছর দেড়েক এ-বাড়িতে ছিলেন। ক্ষীরোদবাবু তাঁর বউদিকে এখানেই থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু থাকেননি তিনি। মণিময়ের কাছেই তিনি চলে গেছেন। সকলে একসঙ্গে থাকলে ভালই লাগে। বাড়ির চেহারাই যেন বদলে যায়। এত ফাঁকা মনে হতো না ক্ষীরোদবাবুর কাছে। এ নির্জনতা যেন মনের ওপর কী এক দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে। তাঁর ভাল লাগে না। এভাবে একা একা থাকা যায়! কল্যাণী কলেজে চলে গেলে তুপুরটা যেন আরো দীর্ঘ, ভারী মনে হয়।

সকালবেলাটায় ঠাকুরঘরেই আজকাল বেশী সময় কাটান। তাছাড়া বাগানের কাজও কিছু কিছু করেন। মাটি পরিষ্কার করে দেন, গাছের পাতা ছাঁটেন, আগাছা ঘাস সরিয়ে ফেলে নতুন ফুলের বীজ পোঁতেন, ফুলের চারাগুলিকে সযত্নে লালন করেন। কল্যাণীও এসব কাজে তাঁকে সাহায্য করে। লছমনের ওপর তিনি যেন অতখানি ভরসা করেন না আর। আসলে শারীরিক শ্রমটা তাঁর প্রয়োজন এবং এটাই তাঁর এখনকার প্রতিদিনের অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। অনেক জাতের গোলাপ ফুটেছে তাঁর বাগানে; রজনীগন্ধা, ডালিয়া, নয়নতারা, কাঠচাঁপারা যেন এই বাগানের নতুন চেহারা এনে

দিয়েছে। গেটের কাছে দুটো শিউলি গাছ। ফুলের গন্ধে বাড়িটা এখন ভুরভুর।

অন্য দিনের চেয়ে আজ তো একটু আগেই ঘুম ভেঙেছে ক্ষীরোদবাবুর। বেড্‌সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন তিনি। শিয়রে টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন। সামান্য জল খেয়ে গ্লাসটা আবার রেখে দিলেন জায়গা মতন। ঘড়ি দেখলেন। সবে সাড়ে চারটে বেজেছে। পাশের বিছানায় স্নেহলতা তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ক্ষীরোদবাবু আর শুয়ে থাকতে পারলেন না। উঠে পড়লেন। মনের মধ্যে আজ খুশির এক ভোমরা অনুক্ষণ গুনগুন করে চলেছে। আজই সকালে মণিময়রা আসছে। এসে ক'দিন নাকি এবার থাকবে এখানে। কতদিন যে ওদের দেখেন না তিনি! কেন যেন সবাইকে একবার ভীষণ দেখার ইচ্ছে! সকলকে নিয়ে আবার একটু হইচই করতে চান।

শোওয়ার ঘরের লাগোয়াই বাথরুম। হাত-মুখ ধোওয়ার জন্যে চলে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এলেন, বাসি কাপড় গেঞ্জি ছাড়লেন। এখনো স্নেহলতার ঘুম ভাঙেনি। কি ভেবে ক্ষীরোদবাবু হাসলেন সামান্য। তিনি এগিয়ে এলেন ক' পা, একটু ঝুঁকে মশারিটা তুলে একসময় বললেন, 'কি অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও, এবার উঠে পড়।'

স্নেহলতা সামান্য বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরলেন। ঘুমঘুম গলায় বললেন, 'বড্ড বিরক্ত কর তুমি, এখনও তো অন্ধকার!'

'অনেকক্ষণ সাড়ে চারটে বেজে গেছে, উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা জলখাবার করতে করতে দেখবে বেলা হয়ে গেছে, আর একটু পরেই তো ওরা আসবে।' বলে ক্ষীরোদবাবু মুখটা বাইরে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মনে মনে হেসে মশারির দুটো কোণা ছেড়ে দিলেন।

'এই সাত সকালেই যে কি শুরু করলে!' স্নেহলতা লেপের বাইরে মুখ এনে জড়িয়ে জড়িয়ে একটু তাকালেন। ঘুমের ঘোরটা

কেটে গেছে অনেকখানি ছোট মতন একটা হাই তুলে বললেন, 'তোমার পাস্ন-আহ্নিক হয়ে গেছে?'

'এই তো যাচ্ছি।'

স্নেহলতা এবার উঠে বসেছেন মশারিটা সরিয়ে ক্ষীরোদবাবুর চোখে চোখে চেয়ে হাসি হাসি মুখে শুধোলেন, 'তুমি কি আজ একটুও ঘুমোওনি নাকি?'

'হুঁ —, ঘুমিয়েছি তো!'

'কই, দেখে তো মনে হচ্ছে না।' আবার হাই তুললেন স্নেহলতা।

ক্ষীরোদবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ওকে দেখলেন একবার। পরে মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছো, কাল বারে বারে ঘুমটা কেটে গেছে, কতদিন পরে মণিময়রা আসছে বল তো! বউমা ছেলেমেয়েগুলোকে যে কতকাল দেখি না।' ক্ষীরোদবাবু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

'ওদের আসতে তো এখনও দেরি আছে, তুমি যাও, আমি সব ঠিক করছি এদিকে।'

ক্ষীরোদবাবু আর দাঁড়ালেন না। তাঁকে আজ বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ছেলে বউ মেয়ে জামাই নাতি নাতনীতে বাড়িটা দিন কয়েকের মধ্যেই ভরে উঠবে। সকলের কাছেই তিনি চিঠি দিয়েছেন। '...এবার পুজোর ছুটিটা তোমরা এখানে এসে কাটাবে। তোমাদের সবাইকে দেখবার খুব ইচ্ছে। আমার বয়েস হয়েছে, শরীরও ভাল থাকে না। কখন কি ঘটে যায় বলা যায় না। জানি না, এটাই তোমাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা কিনা। অবশ্যই আসবে। সবাইকেই আমি আসতে লিখে দিয়েছি।' সব চিঠির একই বয়ান। সকলেই একসঙ্গে এখানে এসে ক'টা দিন থাকুক, এটাই তিনি চেয়েছেন। সবার সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাত হবে। ক'টা দিন একটু আনন্দে কাটাবেন, এটুকুই তার মনোসাধ। এরপর আর হয়তো কোনদিনও দেখাই হবে না। কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি আর

বেশী দিন নেই। রাধামাধবের কাছে তিনি নিয়ত প্রার্থনা করেন, তাঁর দয়াল ঠাকুর যেন সকলকে সুখে রাখেন। চিঠির উত্তরে সবাই আসবে জানিয়েছে। কে জানে, এই হয়তো শেষ। আজ মণিময়রা আসছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই বাকীরা এসে পড়বে। মনের এই সুখ যেন তিনি আর গোপন রাখতে পারছেন না। আগে থাকতেই তিনি ভেবে ভেবে চাল ডাল তেল ঘি ময়দা কিনে রেখেছেন। জামাইরা ছেলেরা মুরগী খেতে ভালবাসে, লছমনকে দিয়ে হাট থেকে পছন্দ মতন মুরগী আনিয়েছেন। মণিময় খিচুড়ি ভালবাসে, সেজন্যে লালার দোকান থেকে গোবিন্দভোগ চাল এনে রেখেছেন। সকলের কথাই তিনি এই ক'দিন ভেবেছেন। ওদের আসার দিনগুলোর জন্যেই যেন তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করে রয়েছেন। নিঃসঙ্গ এই বাড়িটা আবার অনেকদিন পর হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠবে। কতকাল যে তাঁরা এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত! শরতের এই প্রত্যূষ যেন আজ তাঁদের কাছে বহুদিনের এই দুর্লভ উপহার নিয়ে এসেছে।

ভাবতে ভাবতে ক্ষীরোদবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। একটু শীত-শীত করছিল তাঁর। কুয়াশার রেণুগুলো ছুটে এসে তাঁর গায়ে-মাথায় পড়ছে। পুবের আকাশ আরো একটু পরিষ্কার হয়েছে। গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে শিশির ঝরছে। গেটের মুখে শিউলির গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে। পাতলা কুয়াশার গায়ে মিষ্টি গন্ধটা এখন মাখামাখি। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে আতা গাছ থেকে একটা বাদুড় উড়ে গেল। ক'টা কাকও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে হরিতকি গাছের ডালে এসে বসেছে। পাখিদের কিচির-মিচির শব্দ আরো বেড়েছে। ভোরের রঙটা দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছে। আজকের সকালটা যেন তাঁর কাছে নতুন এক স্বাদ নিয়ে এলো। দেবতার করুণা যেন সর্বত্র ঝরে পড়ছে। মনের মধ্যে যে কী এক আনন্দের ঢেউ উঠেছে! বুকের ভেতর তার শব্দ তরঙ্গ। এই সুখের যেন কোন পরিমাপ নেই। এক অলৌকিক পুলকে মাতামাতি।

ক্ষীরোদবাবু এই পবিত্র প্রত্যূষের কথা ভেবে মনে মনে প্রণতি জানালেন। কিছুক্ষণ পর খুশিভরা মনে তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকলেন।

এদিকে স্নেহলতা আরো খানিকক্ষণ বিছনায় বসে থেকে একসময় উঠে পড়লেন। চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টালেন। স্টোভ ধরিয়ে কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে একবার কল্যাণীকে ডাকলেন, 'আর ঘুমোতে হবে না, এবার উঠে পড।' কল্যাণীকে জাগিয়ে দিয়ে আর দাড়ালেন না স্নেহলতা। ঘরে এসে বিছনাপত্তর গোছগাছ করে রাখলেন। জানলা খুলে দিলেন। নিজের হাতে ঘরদোর ঝাঁট দিলেন। জল ছিটোলেন পরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

এবার সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে। গাছের পাতা ঘাস মাটি তখনো ভেজা। কারা যেন কথা বলতে বলতে আসছে শুনতে পেলেন। বুকের ভেতরটা খুশিতে একবার দুলে উঠল। বাড়ির ছেলেরা আজ কতকাল পর ঘরে ফিরছে। উঠোনে নেমে পড়েছেন স্নেহলতা। গেটের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলেন, লোকগুলো তাঁর চেনাজানা কেউ নয়। তবু গেটটা তিনি খুলে রাখলেন। রাস্তার দিকে কয়েক বার উঁকি-ঝুঁকিও মারলেন। রেল-ইয়ার্ডে মালগাড়ি সাইডিংয়ের তালবেতাল শব্দ। রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেস তো এই সময়, কি এরও আগে এসে পড়ে। বুকের ভেতরটা তাঁরও যেন কেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে। একটু পরে গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। 'ওই গাড়িতেই ওরা আসছে' মনে মনে স্নেহলতা কথাগুলো বললেন। বলে যেন প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ততক্ষণে কল্যাণীও উঠে পড়েছে। সেও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মাকে বলল, 'জল গরম হয়ে গেছে, চা করবো?'

'আর একটু দাঁড়া মা, ওরা আসুক আগে।' স্নেহলতা ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এতবড় বাড়িটা আজকাল সব সময় ফাঁকা থাকে। এভাবে থাকা যায়! ওদের কথা মনে হলে মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে যায়। বুকটা

ভারী হয়ে আসে। 'তোরা যদি এখানে আর আসতে না চাস, বাড়ি তবে বেচে দে না, কি হবে এ বাড়ি দিয়ে!' মনে মনে স্নেহলতা ছেলেদের কাছে এই অভিযোগ যে কতবার করেছেন! কিন্তু কোন লাভ নেই। বরং এসব ভাবতে গিয়ে তাঁর নিজেরই দুঃখ বেড়েছে মাত্র। এখনও কল্যাণী তাঁদের কাছে আছে। ও-ও যদি চলে যায়! আর একসময় তো যাবেই। আজ হোক কাল হোক, ওকে পরের ঘরে তো পাঠাতেই হবে। তখন এখানে তাঁরা থাকবে কি করে? বাড়িটা যে আরো খাঁ-খাঁ করবে। একদিন ক্ষীরোদবাবুকে তিনি বলেছিলেন, 'এই তোমায় বলে রাখছি, কল্যাণীর বিয়ে হয়ে গেলে এ বাড়িতে কিন্তু আমি আর একদণ্ডও থাকব না।'

'যাবে কোথায় শুনি?'

'এখন আর বলে কি হবে, তখনই দেখতে পাবে।'

'আমাকে সঙ্গে নেবে তো?' ক্ষীরোদবাবু হেসে উঠেছিলেন।

'হ্যাঁ গো, মোটেই ইয়ার্কি নয়। স্নেহলতার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কল্যাণী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে এলো। তার মনও খুশিতে বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছে। দাদাভাইয়ের সঙ্গে আরো একজন আসছে। ভাবতে ভীষণ মজা লাগছে।

জামরুলগাছে একটা পাখি এসে বসল। পাখিটার গায়ের রঙ হলুদ, চোখ এবং গলার কাছে কালো টান। আজ ক'দিন ধরেই ওটা এখানে আনাগোনা করছে। স্নেহলতা শুনছেন, পাখিটা এলেই বাড়িতে নাকি লোকজন আসে। লোকে বলে, ওটা নাকি কুটুম নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় পাখিটা উড়ে গেল। মনে মনে স্নেহলতা বললেন, 'ওরে পাখি, তুই রোজ রোজ এখানে আসিস, তবু আমার প্রাণটা জুড়োবে।' আবার দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেললেন। লেবুগাছে ফুল ধরেছে, হালকা বাতাসে এই গন্ধটাও ভাসছে। গাছের ডালে ডালে মৌমাছির গুঞ্জন, প্রজাপতিরা উড়ছে।

এমন সময় গেটের সামনে কুলিরা এসে দাঁড়াল। স্নেহলতা

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি জোরে জোরে ডাকলেন, 'কল্যাণী, ওরা এসে পড়েছে রে।' বলেই কি এক গভীর আকুলতা নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কুলিদের পেছন পেছন রুবিও এসে দাঁড়াল। পরে নীচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

স্নেহলতা ওকে বুকে টেনে নিয়ে চিবুকে চুমু খেলেন। আদর করলেন, বললেন, 'কিরে, এতদিনে বুঝি এই ঠাম্মিটাকে মনে পড়ল?'

'আমি কি জানি, বাবাকে খুব করে বলবে তো!'

'আহারে, মুখটা কি রকম শুকনো লাগছে!'

'আমি যে দৌড়ে দৌড়ে আগে চলে এলাম।' কথা বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল রুবি।

'ভাল করেছিস, খুব ভাল করেছিস, এতক্ষণ শুধু ছটফট করছিলাম।' ওকে জড়িয়ে ধরেই স্নেহলতা আরো ক'পা এগিয়ে এলেন। কি মনে পড়তেই রুবিকে আবার শুধোলেন, 'হ্যাঁরে, তোর ওই ঠাম্মি আসেনি?'

'হুঁ, আমরা সবাই এসেছি, প্রণবকাকুও এসেছে।'

'প্রণবকাকু?'

'এলেই দেখবে।' রুবি হাসতে হাসতে বলল।

'তুমি ওকে ছেড়ে দাও না মা।' কল্যাণী হাসি হাসি চোখে রুবিকে দেখল একবার। হাতের ইশারায় ওকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

'বাপের মতনই ঢ্যাঙ্গা হয়েছে, কতটুকু দেখেছিলাম!'

কুলিরা বারান্দায় বসে জিরোচ্ছিল।

শোভনা শাশুড়ীকে নিয়ে আস্তে আস্তে গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে। স্নেহলতা ওদের দেখে এগিয়ে গেলেন। শোভনা একগাল হেসে স্নেহলতাকে প্রণাম করল উপুড় হয়ে, পরে শাশুড়ীকেও।

স্নেহলতাও নত হয়ে হেমলতাকে প্রণাম করলেন। হেমলতা

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। অনেক দিন পর আবার দু' জায়ে দেখা। ওঁরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন। শোভনা দাড়িয়ে পড়েছে। স্নেহলতা পেছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'বউমা, তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে চল।' একটু পরে কি মনে পড়ে গেল হঠাৎ। স্নেহলতা আবার শোভনার মুখের দিকে তাকালেন, সহাস্য মুখে বললেন, 'তাই তো, আমার দাদাভাইকে যে দেখছি না ?'

'ওদের সঙ্গে আছে, এলেই টের পাবেন।'

'হ্যাঁরে স্নেহ—' হেমলতা বাড়িটার চারদিক দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জঞ্জাল হলো কি করে ?'

'এ আর কি দেখছো দিদি, আরো তো হয়েছিল !

'লছমনটা তাহলে সারাদিন করে কি ?'

'ওর কথা আর বলো না, আজকাল যা বাবু হয়েছে না ও !' একটু থামলেন স্নেহলতা, অভিমানের গলায় বললেন, 'বাড়ির লোক বাড়ি থাকবে না তো, জঙ্গলের আর দোষ কি ?'

'খুব বুঝি রাগ হয়েছে ?' হেমলতা মিষ্টি করে হাসছিলেন।

'হবে না ? আমি একা আর কত সামলাব ?'

'সে তো বুঝতেই পারছি। চিঠিটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিস।'

'এবার কিন্তু তোমায় আর ছাড়ছি না দিদি।'

'শোন বউমা, স্নেহ কি বলে !'

'এর মধ্যে তুমি আবার বউমাকে টানছ কেন ?' স্নেহলতা এবার শোভনার মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'বুঝলে বউমা, এবার আর তোমার শাশুড়ীকে যেতে দেব না।'

'বেশ তো, এখানে থাকলে তো উনি ভালই থাকবেন।'

সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এসেছেন স্নেহলতারা। একটু পরে কি ভেবে তিনি হেমলতার চোখে চোখে চেয়ে বললেন, 'যাই বল দিদি, তোমার চেহারাটা কিন্তু অনেক ভেঙে পড়েছে।'

'এখনও যে বেঁচে আছি রে স্নেহ, কিছুই হজম হয় না আজকাল।'

স্নেহলতা হাসলেন সামান্য, 'এখানকার জলহাওয়া গায়ে লাগলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'সে বয়েস কি আর আছে রে!'

'কলকাতায় থেকে যেন তুমি আরও বুড়িয়ে গেছ দিদি।'

হেমলতা হেসে ফেলেছেন, স্নেহলতাও।

স্নেহলতা শোভনাকে দেখলেন আবার, বললেন, 'ছুটিছাটায় এসে তো কিছুদিন থেকে গেলেও পার, তোমাদের বাড়ি ঘরদোর, তোমরা যদি না আস ভাল লাগে?'

'আপনার ছেলেটিকে এবার খুব করে বলে দেবেন তো। আমার কথা আমলই দিতে চায় না।'

'তোমরা হলে গিয়ে ঘরের লক্ষ্মী, তোমরা না এলে কি ঘরের শ্রী থাকে?'

স্নেহলতা বড় জা-কে নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসলেন। শোভনা তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কল্যাণী বেরিয়ে এলো হাসিমুখে এগিয়ে এসে একে একে সবাইকে প্রণাম করল। পরে শোভনার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছ বউদি?'

'আমরা তো ভালই, তোমার খবর কি বলো?'

'আমার আবার খবর কি, যেমন দেখছ!'

'তুমি কিন্তু ভাই আরো সুন্দর হয়েছ।' শোভনা হাসতে হাসতে খুড়ী শাশুড়ীকে বলল, 'কল্যাণীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন কাকীমা।'

'আমার আর আপত্তি কি, দেখে-টেখে দিলেই পার তোমরা।'

কল্যাণী মুখ টিপে হাসছিল, বলল, 'তুমি আগে ভেতরে এসো তো বউদি। তোমাকে অত ঘটকালি করতে হবে না।' কল্যাণী এক-রকম জোর করেই শোভনাকে টেনে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

শোভনা যেতে যেতে বলল, 'কাকাবাবুকে দেখছি না !'

'বাবা এখন পুজোর ঘরে।'

একটু পরে মণিময় প্রণব আর শঙ্কর গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্নেহলতা ওদের দেখে আবার উঠোনে নেমে এলেন। শঙ্কর প্রণবের একটা হাত ধরে রয়েছে। একটু আড়ালে সরে গিয়ে অবাক হয়ে স্নেহলতার দিকে চেয়ে আছে, ডাগর ডাগর চোখ, মিষ্টি চেহারা। স্নেহলতা সস্নেহ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'কি দেখছিস রে দাদাভাই, আয়, আমার কোলে আয়।'

শঙ্কর আরো সরে গেল পেছনে। কিন্তু স্নেহলতা ছাড়লেন না, কোলে তুলে নিলেন, 'কি রে মণি, দাদাভাই যে আমাকে চিনতেই পারছে না।'

মণিময় হাসল, 'অত ব্যস্ত হয়ো না, এখন ব্যাপারটা একবার বুঝে নিচ্ছে।' মণিময় ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এ মা, বুড়ো ছেলে কোলে উঠেছে, কী বোকা !'

স্নেহলতা শঙ্করকে আদর করতে করতে বললেন, 'লজ্জা কি রে দাদাভাই, বল বেশ করেছি। জানিস না তো, তোর বাপও এই কোলে উঠবার জন্যে কত কান্নাকাটি করেছে, বড় হয়েও উঠেছে। একবার উঠলে আর নামায় কার সাধ্যি, নামালেই ভ্যা—।'

শঙ্কর খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

'তোর লেজটা একবার দেখিয়ে দে তো ঠাম্মিকে।' মণিময় হাসছিল।

'ভাল হবে না বাপী !'

মণিময় প্রণাম করল কাকীমাকে, প্রণবও। মণিময়ের মুখে সিগারেট ছিল। প্রণব বাড়ি ঢোকার আগেই সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে। মণিময় অল্প অল্প হাসছিল কাকীমার মুখের দিকে চেয়ে। কাকীমা প্রণবকে চিনতে পারেননি। খানিকক্ষণ পরে মণিময় মুচকি হেসে বলল, 'এর কথাই তোমাদের লিখেছিলাম।'

স্নেহলতা একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে!'

'মনে করে দেখ তো চিনতে পার কিনা!' ওর চোখ-মুখে কৌতুক।

'মনে আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।' স্নেহলতার মুখের ওপর লজ্জা লজ্জা আভা।

'সুধীরকাকাকে মনে আছে তোমার?'

'সুধীরকাকা?' স্নেহলতা অস্ফুটে টেনে টেনে বললেন। তখনো তিনি প্রাণপণে কোন সূত্র খুঁজছেন যেন।

'হ্যাঁ, এখনও চিনতে পারলে না?' মণিময় এবার জোরে জোরে হাসল, 'তোমার আর আজকাল কিচ্ছু মনে থাকে না দেখছি। সুধীরকাকাকে মনে করতে পারলে না? বাবার সঙ্গে কাজ করত, দাবা খেলার খুব নেশা ছিল, আমাদের এই বাড়িতেও তো কত এসেছে।'

'হ্যাঁ রে, এবার মনে পড়েছে; মাথাটা একদম গেছে আমার।' স্নেহলতা হেসে ফেললেন।

প্রণবও হাসছিল। এতক্ষণ পরে সে কথা বলল, 'আমিও এ-বাড়িতে বহুবার এসেছি, আমরা ওপারে অনন্তপুরে থাকতাম, মাও অনেকবার এখানে এসেছে।'

'আর বলতে হবে না, এবার মনে পড়েছে সব। তোমার মা ভাল আছে?'

'কই আর ভাল থাকে, প্রায়ই তো ভোগে।'

'আজকাল এমন হয়েছে যে, কিছুই আর মনে রাখতে পারি না, খালি ভুলে যাই। কিছু মনে করো না বাবা।'

প্রণব কেমন সঙ্কুচিত হলো, বলল, 'না না, কি আবার মনে করব, তাছাড়া অত মনে থাকারও কথা নয়, সে তো অনেক কালের ব্যাপার।'

'মণি, তুই ওকে নিয়ে ভেতরে আয়, আমি যাচ্ছি।'

মণিময় প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'এখানে কিন্তু কোন লজ্জা-টজ্জা করবে না, করলে তুমিই ঠকবে।'

ওর কথা শুনে স্নেহলতা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বললেন, 'ওমা, লজ্জা করবে কেন, ও তো ঘরের ছেলের মতনই।'

'ওসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না তো কাকীমা, মণিময়দা ইয়ার্কি মারছে।'

মণিময় হেসে হেসে বলল, 'লজ্জা করলেই লোকসান, আমাদের আর কি!'

'মোটেও লজ্জা করছি না।'

স্নেহলতা প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার মণিময়দা একটি বিচ্ছু।'

প্রণব জোরে জোরে হাসল। পরে বলল, 'একটু হাত-মুখ ধোবো যে কাকীমা!'

'আগে জিরিয়ে নাও, নতুন জায়গা, চট করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।' স্নেহলতা শঙ্কর আর হেমলতাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

মণিময় ও প্রণব চেয়ারে এসে বসল। মণিময় এখানকার পুজো, থিয়েটার, এককথায় ওদের ছেলেবেলার অনেক গল্প করছিল প্রণবের কাছে। রোদ বারান্দা ধরে এখন জানলা-দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কুয়াশার দানাগুলো শুকিয়ে মিলিয়ে গেছে এতক্ষণে। বাতাস অনেক হালকা।

'বাবু?' কুলিরা তখনো বসে আছে।

মণিময়ের খেয়ালই ছিল না। ওদের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রণবকে বলল, 'চল, ভেতরে চল, আগে চা খেয়ে নিই, পরে জামা-কাপড় ছাড়ব।'

ভেতরে বেশ বড় হলঘরে খাবার টেবিল পাতা রয়েছে। চার-

দিক মিলিয়ে আটটা চেয়ার পাতা আছে। পাশে আরো দু-তিনটে বেতের গদি-আঁটা চেয়ার।

'কি, এসেই যে চিৎ হয়ে পড়লে!' মণিময় শোভনার দিকে তাকাল।

'বেশ করেছি।' শোভনাও হাসতে হাসতে জবাব দিল।

স্নেহলতা কাপে চা ঢালছিলেন, ঢালতে ঢালতেই বললেন, 'বসো প্রণব।'

'আর কি, কাকীমার নজরে পড়ে গেছেন।' শোভনা প্রণবের দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসল।

'অনেক আগেই পড়েছি।' প্রণবও হেসে ফেলল।

কল্যাণী এসে মণিময়কে প্রণাম করল। প্রণবকেও করতে গেল। প্রণব বাধা দিল।

মণিময় মৃদু হেসে বলল, 'কি আশীর্বাদ করব রে, বলে দে।'

'বা রে, তুমি করবে আশীর্বাদ, আর আমি তা বলে দেব?'

'ঠিক আছে, তোর একটা তাড়াতাড়ি ভাল বর আসুক।'

কল্যাণীর মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছে। সামান্য হেসে মার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'তুমি বসো তো গিয়ে, আমি সব করছি।'

স্নেহলতা প্রণবের পাশে এসে বসলেন।

মণিময় আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমায় গ্লাসে দিস, ভর্তি করে।'

স্নেহলতা ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছেন, বললেন, 'অভ্যেসটা এখনো ছাড়িসনি দেখছি।'

শোভনা যেন এতক্ষণে একটা কিছু বলার সুযোগ পেয়ে গেল, বলল, 'চেহারার নমুনা দেখে বুঝছেন না কাকীমা!'

'থাক, তোমাকে আর মাতব্বরি করতে হবে না, মার কাছে মাসীর গল্প!' একটু থেমে কি যেন ভাবে মণিময়। পরে ধোঁয়া গিলতে গিলতে ফের বলল, 'এদিকে তুমি যে দিন দিনই একটি মা

জগদম্বা হচ্ছে, সেটা একবার বল।' মণিময় হাসল। বলতে বলতে সে চোখ-মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল। শঙ্করও খিলখিল করে হেসে উঠেছে। মণিময় এবার ছেলের দিকে চেয়ে কি যেন ইশারা করে দেখাল। শঙ্কর হেসে আরো কুটি কুটি, 'এ মা, বাবাটা কি অসভ্য অসভ্য কথা বলছে, শোন দিদি।'

শোভনা ধমক দিল ছেলেকে, 'কি হচ্ছে শঙ্কর!'

'বাবাই তো বলছে।'

'এসবই তো শেখাবে।'

'আহা, এতে এমন চটার কি হলো তোমার? ও তো একটু বিশুদ্ধ হাসি হাসছে, বাব্বা, হাসিতেও দোষ!' তারপরে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মণিময় বলল, 'হাসিস না রে শঙ্কর, হাসলেও তোর মার রাগ।'

স্নেহলতা বললেন, 'তুই থাম তো মণি, ইয়ার্কি মারার স্বভাবটা দেখছি এখনও তোর যায়নি!'

মণিময় সিগারেট খেতে খেতে হাসছিল, বলল, 'আমার কিছুই যায়নি কাকীমা।'

'কি বলবেন কাকীমা, ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গেও ইয়ার্কি ফাজলামি করবে।'

'এটা মা, এই বংশেরই স্বভাব, দোষ-গুণ যাই বল। তোমার কাকাই কি আমার পেছনে কম লাগে!'

শোভনা মণিময়ের দিকে চেয়ে চোখ পাকাল, বলল, 'নিজে তো প্যাকাটির মতন চেহারা করেছেন!' শোভনা চোখ সরিয়ে এনে হাসল।

'এই চেহারাতেই সময় সময় যে কত ভেল্কী নাচে, টের পাও না?' মণিময় বার বার সিগারেটটা ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে মজা করে হাসছিল; কি যেন ইঙ্গিত ছিল কথার মধ্যে।

শোভনা চোখ-মুখের বিচিত্র এক ভঙ্গি করল, অস্ফুটে বলল, 'অসভ্য।'

'মাথাটা ভীষণ ধরেছে।' মণিময় কপালের দু'পাশের শিরাদুটো চেপে ধরেছে।

স্নেহলতা চোখে চোখে চেয়ে সামান্য উদ্বেগের গলায় শুধোলেন, 'আবার মাথা ধরেছে কেন?'

মণিময় জবাবে বলল, 'ও কিছু নয়, ট্রেন-জার্নির জন্যে হয়েছে, বেশ করে চা খেলেই সেরে যাবে।' একটু সময় চুপ করে থাকল মণিময়, কাকামার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'ছোটকাকা কি এখনও ঠাকুরঘরে?'

'সকালটা তো তোর কাকার ওখানেই কাটে।'

'তোমাদের যে কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল, গেলে না কেন?'

'তোর কাকার কি মর্জির কোন ঠিক আছে; গেলে তো বাসনাদের সঙ্গেও দেখা-টেখা হত।'

'ভাল কথা, বাসনারা কবে আসবে?'

কল্যাণী চা নিয়ে এলো। ওর চোখে চোখে চেয়ে মণিময় এবার সকৌতুকে বলল, 'তুইও তো দেখছি তোর বউদির মতন মুটিয়ে যাচ্ছিস।'

'মোটেই বউদি অত মোটা নয়।' কল্যাণী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'তোমার ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব।' শোভনা মণিময়ের চোখে চোখে চায়।

'তুমি মাইরি, সব ব্যাপারেই অত ফ্যাচফ্যাচ করবে না তো।'

স্নেহলতা হাসলেন, হাসতে হাসতে বললেন, 'এতদিনে যেন বাড়িটার শ্রী ফিরেছে, অন্য সময় যে কিভাবে আমাদের কাটে, তোমায় কী বলব বউমা!'

'ঠিকই তো, এত বড় বাড়িতে লোকজন না থাকলে কি মানায়?' শোভনা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল।

'তবু তো কেউ একবার এখানে এসে থাকতে চায় না।' স্নেহলতার গলায় অনুযোগ।

'বলুন আপনাদের ছেলেকে, সামনেই তো রয়েছে।'

'কি আশ্চর্য, তোমাদের কাছে না এলে আর যাবটা কোথায় বল তো?' হালকা গলায় হাসে মণিময়। চায়ে চুমুক দেয়।

'আমি কিন্তু বাপীকে খুব আসতে বলি দিদা।' একটা কেক খেতে খেতে শঙ্কর বলল।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ—।'

'তোর বাপীটা না ভারী দুষ্টু।' স্নেহলতা হাসলেন। পরে মণিময়ের চোখে চোখে চেয়ে বললেন, 'তোর ছেলে তো বেশ কথা শিখেছে রে!'

'শিখবে না কাকীমা, এরা এ-যুগের ছেলেমেয়ে।' মণিময় হাসল।

'বুঝলে দাদাভাই, তোর বাপীটা ভীষণ হাবাগোবা ছিল।'

শঙ্কর কথাটা ঠিক বুঝল না। না বুঝেই হাসতে লাগল।

'তোকে আমরা এবার এখানে রেখে যাব। কিরে, পারবি না থাকতে?'

'হুঁ—।' শঙ্কর লম্বা করে মাথা নাড়ল।

'তোর লেজটা আগে একটু দেখিয়ে দে তো দিদাকে।'

'আবার, ভাল হবে না কিন্তু!'

'আপনি ওকে রেখেই দিন কাকীমা।' শোভনা চা শেষ করে কাপটা সরিয়ে রাখল।

'তাহলে স্কুলের কি হবে?' শঙ্করের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠেছে।

মণিময় হাসতে হাসতে ওর দিকে তাকাল, 'তোর তো মজাই হলো, স্কুলে যেতে হবে না আর। কেউ আর বকবে না, মারবে না।'

'বল না দাদাভাই, এখানে কি ইস্কুল-টিস্কুল নেই? আয়, তুই আমার কাছে চলে আয় তো!'

শঙ্কর কাছে এলে ওকে পাশে বসিয়ে স্নেহলতা আদর করলেন, 'আমার দাদাভাইয়ের মুখখানি বড় সুন্দর হয়েছে।' তারপর কি একটা মনে পড়ে যেতে মণিময়ের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, 'জানিস মণি, তোরা যে স্কুলে পড়েছিস, সেই স্কুলের রামে তেওয়ারী ট্রেন-অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে।'

'তাই নাকি, কবে এমন হলো?' মণিময় যেন ভাষণ অবাক হয়ে গেল।

'এই তো মাসখানেক।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিময় প্রণবের ওপর চোখ রাখল। মুখের ওপর এক টুকরো বিষণ্ণ ছায়া। আস্তে আস্তে বলল, জান প্রণব, আমি ছেলেবেলায় ওই স্কুলে পড়েছি, আমাদের অঙ্ক করাতেন তিনি, বড় ভালবাসতেন আমায়।'

'তোরা আসবি শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন।'

মণিময় কিছু বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শুধু।

হেমলতা কলঘরে গিয়েছেন। চান-টান না করে কিছুই মুখে দেবেন না তিনি। কলঘর থেকেই তিনি স্নেহলতাকে ডাকলেন গামছাটা দেওয়ার জন্যে।

স্নেহলতা মেয়েকে বললেন, 'তোর জেঠাইমাকে গামছাটা দিয়ে আয় তো মা।'

'চলো বউদি, আমরাও এখান থেকে উঠি।'

'হ্যাঁ, চলো।' ওরা উঠে অন্য ঘরে গেল।

এমন সময় লছমন এসে সামনে দাঁড়াল। কি ভেবে মণিময়কে প্রণাম করল ও।

মণিময় ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কিরে, ভাল আছিস লছমন?'

'হাঁ মণিদা। বহুদিরা আসেছেন তো?' হিন্দুস্থানী উচ্চারণ স্পষ্ট।

'হাঁ হাঁ, আসেছেন, সব্বাই আসেছেন, আর তো ফাঁকি চলবে

না।' মণিময় ওর গলার স্বর নকল করে কথাগুলো বলছিল আর হাসছিল। প্রণবও হাসি চাপতে পারছে না। শঙ্কর তো হেসে গড়াগড়ি।

স্নেহলতা কপট রাগের গলায় ওকে বললেন, 'তোকে না আজ একটু জলদি জলদি আসতে বলেছিলাম!'

লছমন আর দাঁড়াল না সেখানে।

স্নেহলতা ওকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সামানগুলো এবার ভেতরে নিয়ে আয়। খুব লাটুবাব হয়েছ।'

একটু চুপ করে থেকে মণিময় আবার শুধোয়, 'জয়ন্তীরা আসছে তো?'

'নিশ্চয়ই আসবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'অঞ্জলি কৃষ্ণাকেও নিয়ে আসতে লিখেছে তোর কাকা।'

'কৃষ্ণাটা এলে তবু ক'টা দিন আনন্দে থাকবে।' মণিময় এবার আর হাসল না। মুখটা হঠাৎ যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

'ওর কথা মনে হলে বুকটা আমার ফেটে যায়, এই কচি বয়েসেই সাধ-আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেল মেয়েটার।'

'সবাই এলে বেশ মজাই হবে।' মণিময় বিষণ্ণভাবটা কাটাতে চাইছে যেন।

'তবু তো তোরা আসতে চাস না।'

'বিশ্বাস কর কাকীমা, ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না।'

'বছরে এই তো ক'টা মাত্র দিন, বাড়ির ছেলে বাড়ি না এলে কেমন যে লাগে, তা তোরা বুঝবি না মণি, আরো ক'টা দিন যাক, বয়েস হোক তখন বুঝতে পারবি।' স্নেহলতার কথার মধ্যে বেদনা ছিল।

মণিময় কোন কথা বলল না খানিকক্ষণ। সেও বোঝে, কাকা-কাকীর দুঃখটা কোথায়। এ সময়, বিশেষ করে পুজোর ক'টা দিনে এখানে চলে আসার জন্যে তারও মন ছটফট করে, না এলে ভাল লাগে

না, মনে হয় কি যেন একটা অপূর্ণ রয়ে গেল। অন্য সময়ে এ জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায় অনেক। শীতের শুরুতে এখানে যারা আসে, একমাস, দু'মাস থেকে তারা আবার মরসুমী পাখির মতন যে যার জায়গায় ফিরে যায়। এই নিবারণপুরে স্থায়ী বাসিন্দামাত্র দশ-বার ঘর। জায়গাটা দেখতে দেখতে একসময় নির্জন হয়ে আসে। চৈত্র-বৈশাখের খরা বা বর্ষার ঢল অনেকেই দেখতে পায় না। মণিময়রা দেখেছে। দেখেছে বলেই কাকা-কাকীমার জন্যে ভাবনা হয়। কাকীমার চেহারাটাও ভেঙে পড়েছে। কল্যাণীদার বিয়ে হয়ে গেলে তো বাড়ি ফাঁকা। তখন এই নিঃসঙ্গ পুরীতে কাকা-কাকীমা দিন কাটাবে কি করে? ধীরে ধীরে চোখ তুলল মণিময়। চোখের কোলে ম্লান এক ছায়া যেন দুলছে। কাকীমাকে দেখতে দেখতে গাঢ়স্বরে একসময় সে বলল, 'এবার আমার এখানে তোমরা চলে এসো কাকীমা।'

'আমি তো যেতেই চাই রে, কিন্তু তোর কাকাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল; ট্রেনে একদম আর ওঠানামা করতে চায় না।' একটু থেমে স্নেহলতা ফের বললেন, 'আসলে আমি তো বুঝি, কলকাতার ঘিঞ্জি, ভিড় সইতে পারবে না এই ভয়।'

'কি আছে, ভাল না লাগলে ফিরে আসবে!'

'প্রবীরও তো খুব করে লিখছে, তোর কাকাকে নিয়ে পাটনায় গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে।'

'বলছে যখন ঘুরে এসো না।'

এমন সময় চটির শব্দ শোনা গেল। স্নেহলতা বললেন, 'তোর কাকা আসছে, আজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল দেখছি।'

ক্ষীরোদবাবু প্রসন্ন মুখ নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?' পরে স্নেহলতার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওদের খেতে-টেতে দিয়েছ তো?'

'শুধু তো চা খেল।'

'তোমার যেমন বুদ্ধি!' হাত নেড়ে ক্ষীরোদবাবু এক অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন।

মণিময় উঠে এসে প্রণাম করল। প্রণবও পেছন পেছন এসে তাঁকে প্রণাম করেছে।

ক্ষীরোদবাবু প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে চিনতে পেরে হেসে উঠলেন ছেলেমানুষের মতন, বললেন, 'তুমি সুধীরদার ছেলে না?'

'হ্যাঁ।' প্রণব যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করছিল।

'তোমার নামটা যেন কি?'

'প্রণব।'

'তুমি তো আমাদের এখানে আসতে-টাসতে!'

'অনেকবার এসেছি।'

'ও এখন একটা কলেজে কাজ করে কাকা।' মণিময় প্রণবের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে।

'তাই নাকি, বাঃ বাঃ!' ক্ষীরোদবাবু যেন খুব খুশি হয়েছেন। কি খেয়ালে আবার বলতে লাগলেন, 'তোমার বাবা বড় ভালোমানুষ ছিলেন প্রণব। কি অদ্ভুত ব্যাপার জান, সংসারে এই লোকগুলোই আগে-ভাগে চলে যায়। আমার দাদাও আমাকে রেখে অনেক আগেই চলে গেলেন।' ক্ষীরোদবাবু যেন নিবিষ্টমনে আরো কি ভাবছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হলো, ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে বোস তোমরা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুইও বোস মণি।' বলে ক্ষীরোদবাবু আর একটা চেয়ার টেনে নিলেন। পরে স্নেহলতার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝলে গো, মণিটা কলকাতায় থেকে থেকে দেখছি খুব ভদ্রতা শিখেছে।'

'আজ দেখছি তোমার তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।'

'সেজন্যেই কি এভাবে চুপটি মেরে বসে আছ, সময় না হলে বুঝি আর খেতে-টেতে দেবে না!'

'দেখছিস মণি, আমি কি এই বললাম !'

'লক্ষণ দেখে তো সেরকমই মনে হচ্ছে।' ক্ষীরোদবাবু হাসলেন।

'হয়েছে, চুপ কর এবার।'

'ওব্ বাবা, এ যে আবার রীতিমতন ধমক-ধামক, শুনছিস তো মণি !'

একটু পরে রুবি এসে প্রণাম করল। ক্ষীরোদবাবু ওকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'এতদিনে মনে পড়ল এই বুড়োটাকে ?'

'তুমিও তো লিখেছিলে যাবে, কই গেলে না তো ?'

'খুব গোঁসা হয়েছে বুঝি ?' ক্ষীরোদবাবু হাসতে লাগলেন।

'হুঁ—খুব রাগ হয়েছে আমার।'

'আমাব ছোট গিন্নীর আবার বাগ আছে দেখছি !'

'যাও, তোমার গিন্নী হতে আমার বয়েই গেছে।' রুবি ছোট করে চিমটি কেটে উঠে গেল।

শঙ্কর এতক্ষণ সব দেখছিল, কথা শুনছিল। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে কোন ভূমিকা না করে দাদুর পায়ে মাথা ঠেকাল। ক্ষীরোদবাবু ওকে বুকে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, 'তুই কে বে ব্যাটা, আমায় যে বড় প্রণাম করলি ?' তারপর স্নেহলতার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা ওকে একটা কেক বেশী দেবে।'

মণিময় হেসে হেসে বলল, 'বুঝলি তো শঙ্কর, এবার থেকে তুই রোজ দু'বেলা দাদুর পায়ে মাথা ঠেকাবি, দেখবি, সব একটা করে বেশী পাবি।'

হেমলতা কলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে ক্ষীরোদবাবু উঠে এসে প্রণাম করলেন, 'বউদি যে আমাদের ভুলেই গিয়েছিলে।' চেয়ারে বসতে বসতে আবার তিনি বললেন, 'তোমার শরীরে যে আর কিছুই নেই দেখছি।'

'এবার যেতে পারলে বাঁচি।'

'হ্যাঁ, আমাদের তো এবার যাওয়ারই সময় হয়ে এলো !'

মণিময় চুপ করে থাকল। তারও বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে তার বাবার কথা মনে পড়ছিল। তার বাবাও সবাইকে এভাবে রেখে একদিন চলে গেল। এবার কাকা কাকীমা মা, এরাও চলে যাবে এক এক করে। বড় খাবাপ লাগল ভাবতে। কত স্মৃতিই না এই মুহূর্তে ভেসে উঠছে। বুকের ভেতরটা কেন যেন সহসা কান্নায় ভরে উঠল তার। শিশুর মতন কাঁদতে ইচ্ছে করল। কাকার চেহারা আর আগের মতন নেই। ভীষণ ভেঙে পড়েছে। বছর চারেক পর দেখছে মণিময়। আর কতদিন কাকাকে চোখের সামনে দেখবে মণিময়রা! বুকের ভেতরে যেন কিছু বাতাস আটকে গেছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল মণিময়ের। দীর্ঘ করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'কি, আপনি যাবেন নাকি বাথরুমে?' শোভনা প্রণবের দিকে চেয়ে শুধোয়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও, চান-টান আগে সেরে নাও, পরে কথা হবে।' ক্ষীরোদবাবু প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন।

মণিময় বলল, 'এই কল্যাণী, তোর প্রণবদাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।'

প্রণব উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'এগুলো আগে ছেড়ে-টেড়ে আসি।' বলে ঘরে গেল।

শোভনা এগিয়ে এসে কাকাবাবুকে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

'বউমার স্বাস্থ্যও যে খারাপ হয়েছে দেখছি!'

'না না, ওটা ট্রেন ধকলের ক্লান্তি।' মণিময় বলে হাসল।

'তুই থাম তো মণি।' স্নেহলতা কৃত্রিম ধমক দিলেন।

ক্ষীরোদবাবু শোভনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বুঝলে বউমা, বাড়িতে ছেলেপুলে না থাকলে ভাল লাগে না, চোখের সামনে ঘুরবে ফিরবে খেলবে, এটা ভাঙবে, ওটা ফেলবে, হাত-পা ভাঙবে চিৎকার চেঁচামেচি, তবু তো বাড়ি বলে মনে হবে।'

'আর বলবেন না কাকাবাবু। আপনার নাতিটি তো হাঁ করে সব শুনছে।'

'ব্যাটার তাকানোটা একবার দেখছো! ভারী বজ্জাত।' পরে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে বললেন, 'ছেলেরা ডানপিটে না হলে আর হলোটা কি? ওই যে বোগাপটকা মণিটা ও-ও কি কম ছিল নাকি!'

'সে তো বোঝাই যায়।' শোভনা মুখে আঁচল চেপে হাসল।

স্নেহলতা আপত্তি জানালেন, 'মোটেও না, মণি বরাবরই একটু লেতুস মার্কা।'

প্রণব পা-জামা পরেছে। হাতে গামছা, টুথ-ব্রাশ। কল্যাণীকে বলল, 'চলো।'

'আসুন।' কল্যাণী মুচকি মুচকি হাসছিল।

প্রণব কলঘরের কাছাকাছি এসে অনুচ্চ গলায় বলল, 'কি খবর তোমার?'

'কি আবার খবর!' খুশিতে ওর চোখ-মুখ চকচক করছে।

'এসে খুব বিপদে ফেললাম তো তোমাদের!'

কল্যাণী হাসছিল। ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে বলল, 'হুঁ—, ভীষণ বিপদে ফেলেছেন।' পরক্ষণেই ওর চোখে চোখে তাকিয়ে আবার বলল, 'দাঁড়াবার এখন সময় নেই, আমি যাচ্ছি।' কল্যাণী চলে এলো।

মণিময় এবার উঠে দাঁড়াল বলল, 'কি গো কাকীমা, কাকাকে এবার খেতে-টেতে দাও।'

'তাহলেই বোঝ কেমন সুখে আছি।' ক্ষীরোদবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন।

'মণিকে পেয়ে যে খুব নালিশ হচ্ছে, ব্যাপারটা কি?' স্নেহলতা উঠে পড়েছেন। পরে নিজের হাতে লেবু-চা বানিয়ে নিয়ে কাছে এলেন, 'এই নাও।' বলে তিনি আবার ফিরে গেলেন চায়ের টেবিলে।

'হ্যাঁ রে, খালি চা দিলি যে।' হেমলতা বললেন।

'দেখছ তো বউদি, তোমার বোনটি যা হয়েছে না।' ক্ষীরোদবাবু হাসতে লাগলেন।

'এই--, ভাল হবে না বলছি।' স্নেহলতা হেসে হেসে জবাব দিলেন, 'তোমার দেওরটি একনম্বরের বিচ্ছু, দিন দিন বয়েস বাড়ছে না তো কমছে।'

'দেখ দেখ মণি, তোর কাকী কী যা-তা বলছে।'

মণিময় কোন জবাব না দিয়ে হাসল।

'এই নাও দিদি তোমার চা, টোস্ট।' স্নেহলতা নিজের চায়ের কাপটি নিয়ে এসে আবার আগের জায়গায় বসলেন। মণিময়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'হিমানীশের একটি ছেলে হয়েছে জানিস?'

'হ্যাঁ শুনেছি, ও আমায় একটা চিঠিতে জানিয়েছে।' একটু নীরব থেকে মণিময় আবার বলল, 'কতদিন যে ওর সঙ্গে দেখা হয় না, এবার দেখা হবে।'

'না রে, ও এবার আসবে না। আমরাও তো ভেবেছিলাম আসবে, গতকাল চিঠি এসেছে, ছুটি পাচ্ছে না, কাজের চাপ বেড়েছে, লিখেছে, এ অবস্থায় না আসারই সম্ভাবনা বেশী।' ক্ষীরোদবাবুকে সামান্য আহত মনে হলো। তিনি সিগারেট ধরালেন।

'এলে পারত, সবার সঙ্গে দেখা হত।' মণিময় কি ভাবল যেন। খানিকক্ষণ পরে আবার বলল, 'আপনার জন্যে এক টিন ভাল সিগারেট এনেছি।' মণিময় শোভনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার স্যুটকেসে আছে, নিয়ে এসো।'

শোভনা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো আবার। হাতে সিগারেটের টিন।

'দাও, আমার হাতে দাও।' মণিময় টিনের মুখটা খুলে কাকার হাতে দিল। পরে শোভনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মণিময় হেসে হেসে বলল, 'হাত-টাত লাগাও এবার, ক্ষিধে পেয়ে গেছে যে!'

'তুই কিরে মণি!' স্নেহলতা শোভনার দিকে চেয়ে মমতার গলায় বললেন, 'তুমি বসো তো বউমা, এই তো এলে, কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'তাতে কি হয়েছে, হাত-মুখটা আগে ধুয়ে নিই, পরে জলখাবার করছি।'

'আমি তো আছি, তোমাকে এখন আব হাত লাগাতে হবে না।' কল্যাণী বলল।

'বুঝলেন কাকীমা, আপনাব এই মেয়েটি ভাবী লক্ষ্মী।'

'আর বল কেন, ওই তো এখন সব দেখাশোনা কবে. আমি আব কতটুকু কবি!'

'ও যে-ঘবে পড়বে, সেই ঘব আলো কববে দেখবেন।'

'কি হচ্ছে বউদি!' চাপা গলায় কল্যাণী বলল।

মণিময় ইশাবায় কল্যাণীকে ডাকল। ও কাছে এলে মণিময় ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তোব বউদিকে জিজ্ঞেস কব তো, তুমি যেমন আলো করে আছ, সে রকম আলো!'

'না, আমি পাবব না।' কল্যাণী হাসছিল।

'ভাই-বোনে মিলে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনি, বউমার পেছনে লাগা!' স্নেহলতা জোবে জোবে বললেন।

ক্ষীরোদবাবু টিনটা থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে একটু পরে বললেন, 'একটা ভাল ছেলেটেলে দেখ তো, মণি, আসছে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে দিয়ে দেব. ওকে দিয়ে দিলেই আমাব দায়িত্ব শেষ।'

'কি বকম ছেলে হলে ভাল হয়?' মণিময় কি ভেবে স্নেহলতার মুখের দিকে তাকাল।

'ভাল চাকরি-বাকরি করে, বাড়ি-ঘরদোর আছে, বনেদী বংশ, এমন ছেলেই তো আমরা চাই। এই তো আমার শেষ কাজ, তারপর আবার নতুন ধাবা শুরু হবে।' স্নেহলতা হাসছিলেন অল্প অল্প।

'তোর কাকীর আবার বেশী বায়না, আমার কিন্তু অত চাই না, ভদ্র শিক্ষিত হলেই চলবে।'

'আচ্ছা দেখব।' মণিময় কল্যাণীকে ডেকে বলল, 'আমায় আর একটু চা দিস তো রে।'

'এইমাত্র তো পুরো এক গ্লাস খেলে!'

'আরে দে দে, তোর জন্যে কেমন ইয়া জবরদস্ত গোঁফঅলা এক বর নিয়ে আসি দেখ না!'

মণিময়ের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে।

'ভাল হবে না বলছি দাদাভাই, যাও; এসব আজে-বাজে কথা বললে আর চা-ই পাবে না।'

'ঠিক আছে আর বলব না, তাহলে দিবি তো?'

কল্যাণী মাথা হেলিয়ে চা করতে চলে গেল।

ক্ষীরোদবাবু চায়ের পাত্রটা রেখে দিতে দিতে বললেন, 'তুইও চানটা সেরে নে মণি।'

প্রণব বেরিয়ে এলো। মণিময় ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কি, কি রকম লাগছে এখন?'

'দারুণ।'

'আর একটু চা চলবে?'

'কেন চলবে না, জানেন তো, ওসবে আমার না নেই।' প্রণবও মুচকি মুচকি হাসে।

'কল্যাণী, ওকেও একটু দিস রে।'

মণিময়ও জামা-কাপড় ছাড়বার জন্যে নিজের ঘরে এলো। এই ঘরেই তার বাবা থাকত। অনেকদিন পর যেন খুব পরিচিত এই ঘরটার গন্ধ নিতে খুব ভাল লাগছে মণিময়ের। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, সূর্যের আভায় এখন বাগান ভরে রয়েছে।

শোভনা কলঘরে ঢুকল।

বাড়িটা যেন অনেকদিন পর আবার সরগরম হয়ে উঠল।

দুই

সবে রুবি আর শঙ্করের খাওয়া হয়েছে। রুবি ঘুমোতে চলে গেছে। ঘুমে তার দু'চোখ জড়িয়ে ধরছিল। শঙ্কর বাগানে ফড়িং-এর পেছনে ছুটোছুটি করছে। এছাড়া কারো এখনও খাওয়া হয় নি। বেলা গড়িয়ে গেছে, ঘড়িতে এখন একটা বেজে দশ মিনিট। ক্ষীরোদবাবুর খাওয়া বরাবরই বারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, আজ তিনিও এখন পর্যন্ত অভুক্ত রয়েছেন। শোভনা বার দুয়েক তাঁকে খেয়ে নিতে অনুরোধ করেছিল। তিনি হেসে ফেলেছেন, বলেছেন, 'হোক না তোমাদের, মণিদের সঙ্গেই বসব।'

'দেরি করে খেলে আবার আপনার শরীর খারাপ হতে পারে।'

'এই বয়েসের শরীর মা, ভাল আর খারাপ!'

'তোমার কাকা তাহলে ওদের সঙ্গেই বসবে বউমা।' স্নেহলতা আবার অন্য কাজে মন দিলেন।

ক্ষীরোদবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

একটু পরে মণিময়রা এসে টেবিলে বসল। ক্ষীরোদবাবুও এসে বসেছেন। স্নেহলতা শোভনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'তুমিও বসে পড় বউমা, আমি আর কল্যাণী সবাইকে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ বউদি, বসে যাও।'

'যাঃ, এ হয় নাকি?'

'এসে তো একটু বিশ্রামও করলে না বউমা!'

'তাতে কি হয়েছে?' শোভনা থালায় ভাত বাড়ছিল, বলল, 'ওঁদের আগে হয়ে যাক, পরে আমরা একসঙ্গে বসে যাব।'

'সেই ভাল, এখন আমাদের দাও তো।' মণিময় হাসবার চেষ্টা করল। একচুমুক জল খেয়ে নিল।

'দিচ্ছি, দেখছ না, আমার কি দশটা হাত !' শোভনা যেন একটু বিরক্ত হলো।

স্নেহলতা পাঁপর ভাজছিলেন। বললেন, 'রাঁধতে সয়, বাড়তে সয় না।'

হেমলতাও তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নিরামিষ ঘরের রান্না সবে শেষ করেছেন। ক্ষীরোদবাবু তাঁর দিকে তাকালেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'অতক্ষণ ধরে কি সব রান্নাবান্না করলে নিয়ে এসো বউদি।'

'সেরকম কিছুই না।' হেমলতা কল্যাণীর দিকে একবার তাকালেন 'একটা বাটি নিয়ে আমার সঙ্গে আয় তো।'

স্নেহলতা হাসি হাসি চোখে ক্ষীরোদবাবুকে এক পলক দেখলেন, 'সেদ্ধ আর একটা তরকারি, তার মধ্যেও ভাগ বসাবে ?'

'তার তুমি কি বুঝবে ?' একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, 'বউদিকে এর মধ্যে একদিন ধোঁকা রাঁধতে বলবে তো, সেসব খাওয়া তো ভুলেই গেছি।'

স্নেহলতা হাসতে লাগলেন, 'এবার থেকে রোজ দিদিকে তোমার জন্যে ধোঁকা রান্না করে দিতে বলব।'

শোভনা ভাতের থালা সামনে রাখতে রাখতে সহাস্যে বলল, 'আমাদের রান্না খেতে পারবেন তো আপনি ?'

'আমি সবই খেতে পারি মা।'

কল্যাণী বাটিতে করে তরকারি নিয়ে এসেছে। সকলের পাতে একটু একটু করে তা পরিবেশন করল। ক্ষীরোদবাবু মুখে দিয়ে একটা শব্দ করলেন, বললেন, 'এর স্বাদই আলাদা।'

'এখন আর সেরকম নজর নেই, হাতটাও নষ্ট হয়ে গেছে।' বলতে বলতে স্নেহলতা এগিয়ে এলেন।

'তোমার দেওরকে এবার ধোঁকা রেঁধে খাওয়াও দিদি।'

'এ আর কঠিন কি !'

মণিময় একবার সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। পরে খেতে খেতে আস্তে করে প্রণবকে বলল, 'বুঝলে, আমার মার স্পেশাল পেপার হলো ধোঁকা।' কথাটা বলে মুখ টিপে টিপে হাসছিল মণিময়।

'সে তো বুঝলাম, কাকামাবটা কি শুনি!'

'খিচুড়ি!'

'কিরে, অত হাসছিস যে?' স্নেহলতা গরম গরম পাঁপর ভাজা এনে সবার পাতে পাতে দিলেন। প্রণবের কাছে এসে বললেন, 'তোমার দেখছি বাবা এখনও লজ্জাই কাটেনি।'

'পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা কি?' ক্ষীরোদবাবু হাসলেন ওর দিকে চেয়ে।

প্রণবও হেসে ফেলেছে, বলল, 'তখন থেকে কাকীমা শুধু আমার লজ্জাই দেখছেন।'

'দেখব না, অমন চুপচাপ থাকলে কি বলব?'

'সবাই কথা বললে কি করে হবে! দু-একজন শ্রোতাও চাই।'

'সেই ভাল, কথা বলাটাই তো আবার ওর চাকরি।' মণিময় বলে হাসে সামান্য।

প্রণব একটু পরে বলল, 'নাঃ, জেঠাইমার তরকারিটা তো খুব ভাল হয়েছে খেতে!'

'তবে!' ক্ষীরোদবাবু ওর সমর্থন পেয়ে যেন আরো খুশী হলেন।

'ওরকম বলবেন না, আমাদেরটাও মোটেই খারাপ হয়নি।' কল্যাণী কি ভেবে প্রণবকে একবার দেখল। মুচকি হেসে আবার চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

'একজনেরটা ভাল বললেই কি অন্যেরটা খারাপ বোঝায়?' প্রণবও কল্যাণীকে এক পলক দেখল।

'নিশ্চয়ই নয়, এটাই আমি ওদের বোঝাতে পারি না; এই দেখ না, আমি ধোঁকা খেতে ভালবাসি বলে কি অন্যগুলো

বাসি না, নিশ্চয়ই ভালবাসি।' ক্ষীরোদবাবুকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

'কি বুঝছিস রে কল্যাণী?' মণিময় মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কল্যাণীকে ইশারা করল।

'বাবা এতদিনে একজন মনের মত সাপোর্টার পেয়েছে।' কল্যাণী ভুরু নাচিয়ে বলল। পরে মণিময়ের পাশের চেয়ারটায় এসে বসল। একসময় ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে কল্যাণী বলল, 'তাসের প্যাকেট এনেছ তো দাদাভাই?'

'মনে তো হচ্ছে এনেছি। আর না আনলেই বা, এখান থেকে দু' সেট কিনে নেব।' তারপর প্রণবের দিকে চেয়ে মণিময় হেসে ফেলেছে, 'কি গো প্রণববাবু, হবে নাকি একহাত?'

'আমার আপত্তি নেই।' প্রণব মণিময়ের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল কল্যাণী তার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছে। পরে মণিময়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে তাকে কি যেন ফিস ফিস করে বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' মণিময় হেসে হেসে মাথা দুলিয়ে ওর কথা সমর্থন করছিল।

'কিসের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি!' প্রণব হাসতে হাসতে তাকায়।

'কল্যাণী বলছে –।'

'না, বলবে না দাদাভাই।'

'কল্যাণী বলছিল—' মণিময় প্রণবের চোখের দিকে চেয়ে আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। বলল, 'ও তোমায় হারাবে।'

'সব সময় তো কেউ আর জেতে না, হারতেও হয়; আর খেলাতে তো হার-জিত আছেই।'

কল্যাণী মণিময়ের গায়ে আলতো করে একটা ঠেলা দিয়ে একটু অভিমানের সুরে বলল, 'মাগো, তোমায় যদি আর কিছু বলি, পেটে মোটেও কোন কথা থাকে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তাস-টাস নয়, আগে একটু ওদের জিরোতে দে. পরে হবে।'

'খেললে আর কি হবে?'

'ঠিক আছে হবে, আমাদের খাওয়াটা আগে হয়ে যাক।' শোভনা স্নেহলতার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আর আপনি পার্টনার।'

'তবে তো হেরেই ভূত হবে তোমরা।' কল্যাণী উঠে দাঁড়াল এবার।

'দেখ কারা ভূত হয়।'

প্রণব আস্তে আস্তে খাচ্ছিল, সেদিকে চেয়ে কল্যাণী বলল, 'আপনি কিন্তু কিছুই খাচ্ছেন না।'

'পেটটা তো আমার।'

'তাহলে কি হবে, সত্যিই কিছু খাচ্ছেন না আপনি।' শোভনা এগিয়ে এলো, 'ভাত ভাঙুন, ওসব চালাকি চলবে না।'

'ওকে আরেক টুকরো মাছ দাও না বউমা।' স্নেহলতাও কাছা-কাছি এসে দাঁড়ালেন।

'না বউদি, আর দেবেন না, দেবেন না বলছি; খেতে পারব না, সত্যি বলছি পারব না।'

'খুব পারবেন, এ আপনার কলকাতার তিনদিনের বরফ-দেওয়া বাসি মাছ নয়, একেবারে টাটকা, নদীর মাছ।'

'বাসি মাছ খাওয়ার অভ্যেস, একদিনে কি অত টাটকা সইবে?' প্রণব হাসছিল।

'ওসব দর্শন-টর্শনের কথা ছেড়ে আগে খান তো। কিচ্ছু ফেলবেন না কিন্তু!'

স্নেহলতা সস্নেহে বললেন, 'চেয়ে-চিন্তে খেয়ো বাবা, নিজের বাড়ির মতন।'

প্রণব বলল, 'বলেছি তো কাকীমা, খাওয়ার ব্যাপারে আমার অত লজ্জা নেই।'

'থাকলে ও নিজেই ঠকবে, আমাদের কি বলুন ?' বলতে বলতে শোভনা একফাঁকে মাছের একটা টুকরো ওর পাতের ওপর ফেলে দিল, 'কথা না বাড়িয়ে ওই ঝোলটুকু দিয়ে বাকি ভাত ক'টা মেখে লক্ষ্মীছেলেব মতন খেয়ে নিন তো।'

মণিময় ওব দিকে চেয়ে হাসছিল, বলল, 'আরে, অমন আদর কবে যখন বলছে, খেয়েই নাও না।'

প্রণব এক পলক কল্যাণীকে একবাব দেখে নিল, নীরবে হাসল শুধু।

'তোবা ধীবে-সুস্থে খা, আমি উঠছি, বেলা অনেক হলো।' বলতে বলতে ক্ষীবোদবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

মণিময়েবও খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তবু বসে থাকল। একটু পরে বলল, 'তোমবা আর দেরি কবছ কেন, বসে পড।'

'কাকীমা বসুন, কল্যাণীও বসে যাও।' শোভনা তাড়া দিল।

'আমরা একসঙ্গেই বসছি।'

প্রণব খাওয়া শেষ করেছে। হাসি হাসি মুখে বলল, 'যা বে-কায়দায় ফেলেন না বউদি!'

'কিচ্ছু বেকায়দায় ফেলিনি ভাই, আব একটু পবেই দেখবেন বাঘেব খিদে পেয়ে গেছে।'

স্নেহলতা খাবাব টেবিলে বসতে বসতে কল্যাণীকে বললেন, 'তোর বাবাকে পান দিয়ে আয়।'

কল্যাণী উঠে গেল। শোভনা মণিময়েব দিকে তাকাল এক পলক, বলল, 'বা রে, বসে আছ কেন, উঠে পড়!'

'না, আমি উঠব না, বসে বসে তোমাদের খাওয়া দেখব।'

মণিময়েব কথা বলার ধরন দেখে সবাই হেসে ফেলেছে।

শোভনা আড়চোখে প্রণবকে দেখল, 'কি, আপনিও আমাদের খাওয়া দেখার জন্যে বসবেন নাকি?'

'শুনেছি, মেয়েদেব খাওয়ার সময় নাকি থাকতে নেই, সুতরাং, আমি উঠছি।'

মণিময় বলল, 'বাঃ, ফাসকেলাস বলেছ ভাই, এরপর আর এখানে থাকা যায় না।' বলতে বলতে মণিময়ও উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওরা চলে গেল।

হেমলতা দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, 'বেলা গড়িয়ে গেছে, আমিও যাই রে স্নেহ।'

'হ্যাঁ, খেয়ে নাও গিয়ে, অনেক বেলা হয়েছে।'

কল্যাণী ফিরে এসে খেতে বসল কলতলা থেকে ফেরার সময় মণিময় ওর মুখের দিকে অল্প একটু চেয়ে থেকে বলল, 'আমাদের জন্যে পান-টান আছে তো?'

'আছে, এখন আর উঠতে পারব না; আগে খাওয়া হয়ে যাক, পরে।'

'আমার আর কি, তোর প্রণবদাই চাইছিল।'

'চাইলেই পাওয়া যায় না, একটু দাঁড়াতে হয়।' কথাটা বলেই কল্যাণী কেমন সঙ্কুচিত হলো একটু।

মণিময় একটা চেয়ারে বসে পড়ল, বলল, 'খেয়েই নে তাহলে!'

প্রণব ঘরে চলে গেছে।

মণিময় হাসি হাসি চোখে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকায়, বলে, 'তোর মনে আছে কল্যাণী, ওর বাবাকে আড়ালে আমরা কি বলে ডাকতাম?'

কল্যাণী মাথা হেলিয়ে বলল, 'উহুঁ।'

স্নেহলতাও মুখ টিপে হাসছেন। ধমকের গলায় বললেন, 'তুই চুপ কর তো মণি।'

'একটু আস্তে বল, ও শুনতে পাবে।' শোভনা চোখের কি ইঙ্গিত করল মণিময়কে।

'না না শুনবে না, তুমি বল দাদাভাই।'

'আমরা মালবাবু বলে ডাকতাম।' মণিময় ফিক করে হেসে ফেলল।

কল্যাণী খুব জোরে হেসে উঠেছে। মুখ থেকে তার ভাত ছিটিয়ে পড়ল। মণিময়ও হাসছে। কি [illegible] মণিময় একবার ভেতরে গেল। সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে এলো, আগের জায়গায় বসল। তখনো থেকে থেকে ওরা হাসছে।

স্নেহলতা বললেন, 'তবে মানুষটি বড় ভাল ছিলেন, ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেপুলে ছিল, খুব অভাবীও ছিলেন।'

'চাকরিতে খুব সুনাম ছিল ওর বাবার, এক পয়সাও ঘুষ নেননি কখনো।' মণিময় এবার আর হাসল না। সিগারেট টানতে টানতে ফের বলল, 'প্রণবও ওর বাবার মতন হয়েছে, ভীষণ ভাল ছেলে।'

শোভনা বলল, 'কবি শঙ্করকে ও খুব ভালবাসে। ওবাও প্রণব-এর কবি বলতে অজ্ঞান।'

মণিময় বলল, 'বুঝলে কাকীমা, আমরা এক পাড়াতেই থাকি।'

কল্যাণী এখন আর কোন কথা বলছে না, মাথা নীচু করে খাচ্ছে। একটু পরে মুখ তুলল। মণিময়ের দিকে চেয়ে শুধোল, 'তোমরা ও-নামে ডাকতে কেন?'

আসলে ওর বাবা গুড্‌স্‌-ক্লার্ক ছিলেন, চেহারাটিও বেশ নাদুস-নুদুস ছিল '

স্নেহলতা সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। একটু পরে বললেন, 'সুধীরবাবুর মরাটাও বড় অদ্ভুত।' স্নেহলতা নীরব রইলেন খানিকক্ষণ। পরে কি যেন ভাবলেন, বললেন, 'একটা বাচ্চা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়েই নিজের প্রাণটা দিলেন ভদ্রলোক।' বলতে বলতে স্নেহলতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মণিময় আস্তে আস্তে বলল, 'সুধীর জেঠামশায় বাবার তো খুব বন্ধু ছিলেন '

স্নেহলতা একদৃষ্টে মণিময়ের দিকে চেয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ, বললেন, 'তারপর থেকে তোর বাবাও যেন কি রকম হয়ে গেল।'

মণিময় সিগারেট টানছিল। আস্তে আস্তে বলল, 'এর কিছুদিন পরেই তো ওরা এ জায়গা [illegible] চলে গেল।'

'না গিয়ে হয়তো উপায়ও ছিল না ওদের।'

মণিময় একটু সময় নীরব থেকে স্নেহলতার চোখে চোখে চাইল, পরে আস্তে আস্তে শুধোল, 'এ পাড়াটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে এখন, তাই না কাকীমা?'

স্নেহলতা চোখে চোখে তাকালেন, 'আগের জমজমাট ভাবটা আর নেই, অনেকেই বাড়ি-ঘরদোর বেচেবুচে দিয়ে চলে গেছে, যারা বেচেনি তারাও খুব কম আসে।'

'অথচ যুদ্ধের সময়টায় কী লোক এখানে!'

স্নেহলতা এবার সামান্য হাসলেন। বললেন, 'আর এখন বুড়ো-বুড়িরা বাড়ি পাহারা দেয়।' তিনি কি একটা ফেললেন, চিবোতে চিবোতে ফের বললেন, 'তাও এসময় লোকজনের ভিড়টা একটু হয়। এই পাড়াটাই যেন কেমন ধরনের।'

মণিময় সিগারেটের ছাই ঝাড়ল, ফুরিয়ে এসেছে টুকরোটা, আর বার কয়েক টেনে ওটা ফেলে দিল, বলল, 'শৈল কুটিরে তো আজকাল আর কেউ থাকে না, না?'

স্নেহলতা বললেন, 'কে আর থাকবে বল, বিজলীর বিয়ে হয়ে গেছে, সুখেন বাইরে কাজ করে, আর গোবর্ধনবাবু তো মারাই গেছেন। থাকার মধ্যে এক বিজলীর মা, বছর তিনেক হলো তিনিও সুখেনের কাছে গিয়ে আছেন।' একটু নীরব থেকে আবার বললেন, 'শুধু নগেন্দ্র কুটিরের কেউ যায়নি এখনও, ছেলেরা এখানেই চাকরি-বাকরি করে।'

মণিময় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে আবার শুধোয়, 'পুজোটা ঠিক মতন এখনও হয় তো?'

'তা হয়, শিবকালীবাবু যতদিন বেঁচে আছেন হবে, তারপরে আর বলা যায় না।'

'যাই বল, প্রবাসে বাঙালীদের দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর অদ্ভুত একটা চার্ম আছে।'

কল্যাণী ওর চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'লোকজন বেশী থাকলেই ভাল লাগে, তবে এবার মনে হচ্ছে খুব জমবে পুজোটা।' হাসতে হাসতে অন্যদিকে চোখ ফেরাল ও।

মণিময় বলল, 'আমাদের সময়ের মতন আর হবে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'তখন এ জায়গারও তো অন্যরকম চেহারা ছিল। এখন অনেক বদলে গেছে, লোক কত বেড়েছে শহরে!'

'বাড়বেই তো, এত কলকারখানার ছড়াছড়ি, লোকের আর দোষ কি!'

'শহরের আশপাশে নতুন নতুন কত কলোনী হয়েছে, আরো নাকি হবে শুনছি।'

মণিময় বলল, 'রাঁচী টাউনটা তো দেখতে দেখতে এই ক-বছরে সব দিকেই বেড়ে গেছে, আরো বাড়বে দেখবে।'

কল্যাণী খাওয়া শেষ করে থালাগুলো জড়ো করছিল, বলল, 'এখন তো এটা একটা বিজনেস-সেণ্টার।'

শোভনা মাছের কাঁটা চিবোতে চিবোতে বলল, 'লোকে তো আগে এখানে শরীর ভালো করার জন্যেই আসত।'

'হ্যাঁ বউমা, আরো কিছুদিন এরকম আসবে, পরে আর আসবে না।'

মণিময় কি ভেবে হাসল, হাসতে হাসতে বলল, 'উহুঁ, ঠিক হলো না কাকীমা, এরপর তো লোকে আরো বেশী করে আসবে।'

'খালি ইয়ার্কি!' শোভনা মুখভরা হাসি নিয়ে তাকাল মণিময়ের দিকে।

'কেন, বেশী করে আসবে কেন?' স্নেহলতা কথাটার অর্থ ধরতে পারেননি। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন মণিময়ের দিকে।

কল্যাণী হাসছিল, বলল, 'মা এখনও বোঝেনি বউদি।'

'যা, বুঝিনি তো বুঝিনি, তোদের মতন তো আর লেখাপড়া জানি না।'

'না গো কাকীমা, ও আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে।'

মণিময় মুখ ভেঙচানোর মত করে বলল, 'হ্যাঁ—, ইয়ার্কি মারছে!'

'মারছই তো।' শোভনা কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার দাদাটিকে এবার এখানেই রেখে যেতে হবে দেখছি।'

মণিময় হাসতে লাগল, বলল, 'আমার আর কি হবে, ধেই ধেই করে নাচব, খাব, ঘুরব।'

'এবার বুঝেছি।' স্নেহলতা মণিময়কে বললেন, 'তুই এখান থেকে যা তো মণি।'

মণিময় হাসল, কল্যাণীর দিকে চেয়ে বলল, 'তোর বউদির দারুণ বুদ্ধি!'

'না, বুদ্ধি শুধু তোমার একলারই আছে!' শোভনা চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল।

'তোমার একটু বেশী।'

'হয়েছে, আর ঢঙ্ করতে হবে না।'

মণিময় উঠে দাঁড়াল, 'দেখছ, দেখছ কাকীমা, তোমার সামনেই কেমন শাসন-তর্জন করছে, এখন তো কিছু বলবে না!'

'এরপর আরো বকুনি খাবি বলছি।' স্নেহলতা কৃত্রিম ধমক দিলেন।

মণিময় হাসতে হাসতে চলে গেল।

তিন

হাতমুখ-ধুয়ে প্রণব অনেকক্ষণ তার ঘরে চলে এসেছে। ঠিক হয়েছে, এই ঘরটাতেই সে থাকবে। ছোট হলেও ঘরটা এক কোণায় ও নিরিবিলি। দক্ষিণ দিকের জানলায় অল্প ছায়া বিছিয়ে দুটো গন্ধরাজ ফুলের গাছ। পাঁচমেশালী, টাটকা ফুলগুলো থেকে নেশা-মেশা এক সৌরভ আসছে। অনেকখানি জায়গার ওপর এই বাড়ি, সামনে-পেছনে বাগান, মাঝখানে বাড়িটা। বাড়ির সামনের দিকে ফুলের বাগিচা, নানা ধরনের ফুল, ডানপাশে কিছু লেবুগাছ, ঝাউ, ইউক্যালিপটাস গাছও রয়েছে গেটের কাছাকাছি। সিঁড়ি থেকে ছোট ছোট পাথরকুচি বিছানো রাস্তাটা গেট বরাবর চলে এসেছে। ইঁটের খাঁজে খাঁজে রজনীগন্ধার চারা। বাড়ির পেছনে আমবাগান, জামগাছ সফেদা, আতা, বাতাবীলেবু, হরিতকি, পেয়ারা অনেক রকমের ফলের গাছ। রান্নাঘরও পেছনের দিকে। ওদিকটায় অনেকখানি জায়গায় বেগুন, লাউ, সিম, ফুলকপি, লঙ্কার চাষ।

প্রণবের বেশ ভাল লাগছে, কতকাল পরে এখানে আবার সে এলো। একসময় সমস্ত জায়গাটাই তার কত পরিচিত ছিল। আজ এতকাল পরে পুরনো জায়গায় ফিরে এসে তার কী যে আনন্দ হচ্ছে! অনেক কিছুই এখানকার বদলে গেছে, তবু যেন আজো এর সঙ্গে তার আন্তরিক, হৃদয়ের একটা সম্পর্ক আছে। তার ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে, এই পরিবেশ, ধুলোমাটি, জলবায়ু তার কতকালের চেনা! এখানকার কিছুই সে ভোলেনি। সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে পড়তেই এ জায়গার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে। বাবার এভাবে হঠাৎ মৃত্যুটা তাদের কাছে মস্ত বড় আঘাত, দুর্ঘটনা। কলকাতায় নিরুপায় হয়ে কাকার কাছে চলে গেল। তবু মনের গোপনে এ

জায়গাটাই তার কাছে খুব পরিচিত প্রিয় আত্মীয়ের মতনই থেকে গেল।

একটু একটু শীত করছিল প্রণবের। খেতে খেতে আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল। জামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই নিয়ে বাইরে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াল প্রণব। আমগাছেব ছায়া সিঁড়ি ডিঙিয়ে অনেকটা উঠে গেল। পড়ন্ত বেলার আলোটাও এখন একটু একটু করে সিঁড়ি ভাঙছে। প্রণব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওখান থেকে সদর রাস্তা দেখা যায়। উঁচু-নীচু জমি পেরিয়ে দূবে ছোট ছোট পাহাড়ও চোখে পড়ে, ঢালু জমিতে সবুজ ধানের খেত চোখে পড়ল। হুরমু নদীব জলে পাথরেব টিলায় ধোপারা এখনও কাপড় কাচছে। জমির ঢালুতে, ধোয়া ভেজা জামা কাপড়-চোপড শুকোবাব জন্যে মেলে দিয়েছে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, বাতাসে নানা ধরনেব ফুলের মিশ্র গন্ধ। হাওয়ায় অল্প অল্প ধার ছিল। বোদেব মধ্যেও কেমন ঝিমঝিম ভাব, অনেকটা নিস্তেজ যেন।

কয়েকটা বাড়ি ছাডিয়েই পুজো মণ্ডপ। আজ ষষ্ঠী। মাঝে মাঝে ওখান থেকে হইচই ভেসে আসছে। ঢাকের আওয়াজও শোনা গেল কয়েকবাব। কলকাতাব কথা মনে পডল প্রণবের। পাড়ায় পাড়ায় পুজো। হই-হট্টগোল, মাইক, হিন্দী সিনেমাব গান, আলোব খেলা, সব কিছুতেই বাডাবাডি। অথচ ছেলেবেলা থেকে এসব অঞ্চলের পুজো সে দেখেছে, কয়েকবাব পুজো কমিটির মধ্যেও ছিল। এখানকার পুজোব যেন এক ধরনেব শুচিতা ছিল। এটাকে একটা উৎসব বলেই মনে হত। কলকাতায় গিয়ে বুঝেছে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কতখানি। ওখানে এমনিতে খুঁটিয়ে দেখলে, কিছুরই অভাব নেই, হয়তো বেশীই আছে, তবু কেন যেন মনে হত, কোথায় একটা ফাঁক থেকে গেছে, প্রাণের উত্তাপের যেন খুব অভাব। পুজোর ক'টা দিনকে ঘিরে কেমন যেন মাতামাতি শুরু হয়ে যায়। ঘরের লোকজন

কাতারে কাতারে রাস্তায় নামে। এখন এই ঘিঞ্জি, ভিড়, চেঁচামেচি প্রণবের ভাল লাগে না। পুজোর চেহারাটাই দেখতে দেখতে কেমন বদলে যাচ্ছে।

প্রণবরা তখন অনন্তপুরে থাকত, ওদের আর মণিময়দার পাড়ার সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা হত। এর মধ্যেও একটা সুস্থ ব্যাপার ছিল। আরতি কম্‌পিটিসন, দরিদ্র নারায়ণ সেবা হত ; পুজো মণ্ডপ থেকে প্রসাদ না নিয়ে কেউ ফিরে যেতে পারত না, আশপাশের কুলি-কামিনরা এসে ভিড় করত। তাদের সঙ্গে প্রীতির বিনিময় চলত। দল বেঁধে আদিবাসীরা আসত। তারা নাচত-গাইত, খাওয়া-দাওয়া করত। ছোটমতন মেলাও বসে যেত এখানে। ক'টা দিন তাদের কী আনন্দেই না কাটত। বিসর্জনের দিন তাদের মন খারাপ হয়ে যেত। আড়ালে তারা চোখের জল মুছেছে ; কেমন খাঁ খাঁ করত জায়গাটা। কিছুই ভাল লাগত না। ক'দিন খুব জল্পনা-কল্পনা, আগামী বছর কি করে নিবারণপুরকে টেক্কা দেওয়া যায়। নিবারণপুর ভাবত অনন্তপুরকে কিভাবে ডাউন দেবে। বিজয়া সম্মেলন হত, খাওয়া-দাওয়া, প্রণাম শুভেচ্ছা বিনিময়, যাত্রা, আহা, দিনগুলো কী আনন্দেরই না ছিল! আর কি কখনো ফিরে আসবে সে-সব দিন! কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল প্রণব। এখানে সে এখন দূরের মানুষ।

আমের ঘন পাতার আড়াল থেকে একটা পাখি উড়ে গেল। প্রণবের একেবারে মাথার কাছ দিয়ে পালিয়েছে পাখিটা। একমুঠো হাওয়া এসে গায়ে লাগল। পাশেই লেবুগাছ, একটা ডাল প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আলতোভাবে ক'টা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সামান্য রগড়ে তার গন্ধ নিল প্রণব। রোদটা এই মুহূর্তে ডানপাশে ছোটমতন একটা লাফ মারল, যেন এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে রোদটা ক্রমশ পিছু হটছে। প্রণবের কাছ থেকে রোদ সরে গেল, সামান্য এগিয়ে দাঁড়াল সে। দূরে মাঠের ওপর সরের মতন পাতলা

কুয়াশার একটা আবরণ পড়েছে। সামান্য দূরে ঝোপের ভেতর থেকে একটা কুবো পাখি থেকে থেকে ডাকছে। আতাগাছের ডাল বেয়ে ক'টা কাঠবেড়ালি ছুটোছুটি করছে। ভাল করে চেয়ে প্রণব দেখল, আমগাছের পাতা দিয়ে সুনিপুণ ঘর বেঁধেছে লাল পিঁপড়ে। একটা ঝিঁঝি পোকা সমানে ডেকে চলেছে, কি আশ্চর্য, এভাবে ডাকতে ডাকতেই পোকাটা একসময় দম ফেটে মরে যাবে। প্রণবের বড় কষ্ট হলো ভাবতে। এই পরিবেশ, এই বাড়ি, লোকজন সবই তার কাছে এই মুহূর্তে খুব আপন বলে মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরাল প্রণব। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিল সে।

'অত তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন?' কল্যাণী হাসি হাসি মুখে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে সামান্য কৌতুক ও মজা তখনো যেন পুরোপুরি গোপন করতে পারছে না। প্রণব একদৃষ্টে ওকে দেখল খানিকক্ষণ।

কল্যাণী তখনো অল্প অল্প হাসছে, বলল, 'কি দেখছেন অমন করে?'

'তোমাকে।'

'আচ্ছা, এই নিন আপনার পান।' চোখ নত করে কল্যাণী বলল।

প্রণব এবার হেসে ফেলেছে, বলল, 'পান তো খাই না আমি।'

'দাদাভাই যে বলল আপনি পান চেয়েছেন!'

'মণিময়দা বেশ মজা করতে পারে তো?'

কল্যাণী তাকাল, সারা অঙ্গ তার হাসিতে ঝলমল, বলল, 'অত কষ্ট করে সাজালাম, আজ খেয়ে ফেলুন।'

প্রণব ওর চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'এটাও বরং তুমিই খেয়ে নাও: ঠোঁট দুটো তো পানের রসে বেশ টুকটুকে করেছ।'

'ধ্যাৎ—' কল্যাণী সলাজ চোখে একবার দেখল প্রণবকে, পরে সামান্য হেসে হেসে বলল, 'আগে ধরুন তো, ভাজা মসলা দিয়েছি, ভাল লাগবে খেতে।'

'আমাকে বরং একটু ভাজা মসলাই এনে দাও।'

'একদিন খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, ঠিক আছে, খেতে হবে না আপনার।' কল্যাণী মুখ একটু গম্ভীর করে চলে যাচ্ছিল, প্রণব বাধা দিল, বলল, 'তোমার দেখছি রাগও আছে।'

কল্যাণী অভিমানের গলায় বলল, 'বা রে, রাগ করতে যাব কেন? দাঁড়ান, মসলা এনে দিই আপনাকে।'

'তার আর দরকার হবে না, পানটাই দাও আমায়।' প্রণব ওর হাত থেকে পানটা নিয়ে মুখে পুরে দিল। পরে পিক ফেলতে ফেলতে বলল, 'বেশ ভাল লাগছে খেতে।'

কল্যাণী ফিক করে হেসে ফেলল, 'যান, আর প্রশংসা করতে হবে না।'

আতাগাছে একটা কাক এসে বসল। সেদিকে চেয়ে প্রণব পান চিবোতে চিবোতে বলল, 'আতাগুলো বেশ বড় হয়েছে!'

'পাড়বেন?' সোৎসাহে বলল কল্যাণী।

'আজ নয়, কাল।'

'রাত্তিরে বাদুড়ে খেয়ে শেষ করে দেবে।'

'ক'টা আর খাবে, গাছ তো অনেকগুলো।' সিগারেটে আরো কয়েকটা টান দিয়ে প্রণব কল্যাণীর চোখে চোখে তাকাল, কি ভাবতে ভাবতে শুধোল, 'তোমার এবার কোন্ ইয়ার হলো?'

'থার্ড ইয়ার।'

'অনার্স আছে তো?'

'এখন পর্যন্ত রেখেছি।'

'ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?' প্রণব হাসছিল।

'ভীষণ শক্ত!' কল্যাণীও মৃদু হেসে ওর চোখের ওপর নম্র দৃষ্টি রাখল। একটা আমপাতা কুড়িয়ে নিয়ে পাতাটা ছিঁড়ছিল আনমনে।

'প্রথমে শক্ত, পরে সোজা।'

'ওসব পড়াশুনার কথা থাক এখন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল প্রণব। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'জান কল্যাণী, তোমাদের এখানে ছেলেবেলায় অনেক এসেছি আমি।'

'এখন কি রকম মনে হচ্ছে?'

'আগের মতন আর নেই।' একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রণব, বলল, 'কোনদিন যে এ জায়গা ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে, ভাবিনি, কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল!'

'আমারও এখন একটু একটু মনে পড়ছে, আপনি আমাদের বিজয়া সম্মেলনে একবাব গান করেছিলেন।'

'সে তো অনেককালের কথা!'

'গানটা যে আমি মনে মনে তুলে নিয়েছিলাম।' কল্যাণী তাব ডাগর চোখদুটো প্রণবের চোখের ওপর মেলে দিয়ে সঙ্কোচে আবার গুটিয়ে নিল ধীবে ধীরে। এক সলাজ লালচে আভা ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে।

'আমাব কিছু মনে নেই, গানটা তোমার মনে আছে নাকি?' প্রণব হাসি হাসি চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকল।

কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে হাসল, 'আমিও এখন ভুলে গেছি।'

জামগাছের ডালে বসে একটা দোয়েল শিস দিচ্ছিল। প্রণব সিগারেটের টুকরোটা এবার ফেলে দিল, পরে ইশাবায় কল্যাণীকে ডাকল।

ও কাছে এলে মৃদু গলায় প্রণব বলল, 'আমি কিন্তু এখন খেলব-টেলব না, একটু ম্যানেজ কর, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'উহুঁ, ওটি হচ্ছে না, বুঝেছি হেরে যাওয়ার ভয়ে এখন খেলতে চাইছেন না।' কল্যাণী চলে গেল।

মণিময় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কল্যাণীকে ডাকল, 'কই রে, আমার পানটা দে এবার।'

'এই নাও।' কল্যাণী পাশে বসল।

মণিময় পানটা মুখে ফেলে দিয়ে কল্যাণীকে কি ইশারা করল,

পরে গলা ছেড়ে বলল, 'কি প্রণব, শুয়ে পড়লে যে, হবে নাকি এক-হাত ?'

'নিশ্চয়ই।' শুয়ে শুয়েই প্রণব জবাব দিল।

'কল্যাণী, রেডি হয়ে নে রে।' বলে মণিময়ও একটা বালিশ টেনে নিল।'

'আজ ছেড়েই দাও দাদাভাই, তোমরা সবাই এখন ঘুমের ধান্দা করছ।'

'ওরে বাপস্, আমি আর পারছি না, আগে শুয়ে নিই একটু।' বলতে বলতে ধপাস করে শুয়ে পড়ল শোভনা, সায়ার গিটটা একটু আলগা করে দিল, 'পেট আমার ফেটে যাচ্ছে।'

'খাওয়ার সময় খেয়াল থাকে না বুঝি ?' মণিময় একটু সরে গেল।

'এই, সব সময় অত খাওয়ার খোঁটা দেবে না তো !' শোভনা কল্যাণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমায় একগ্লাস জল দাও না ভাই।'

'এরপর আবার জল ?' মণিময় যেন অবাক হলো।

শোভনা এর কোন জবাব দিল না। একটা শারদীয়া সংখ্যা কোলের ওপর টেনে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখতে লাগল।

জল খেয়ে গ্লাসটা রেখে দিতে দিতে শোভনা বলল, 'তুমিও একটু শুয়ে নাও কল্যাণী।'

মণিময় খবরের কাগজে চোখ রেখে সিগারেট টানতে টানতে কৌতুকের গলায় বলল, 'যেভাবে খাট জুড়ে আছ, ও বেচারা আর শোবে কোথায় !'

সামান্য সরে যেতে যেতে শোভনা কল্যাণীর একটা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'এই তো অনেক জায়গা আছে, তুমি এস তো ভাই।'

কল্যাণীও শোভনার পাশে এসে শুয়ে পড়েছে এবার।

মণিময় হাসছিল, 'এখনই আবার নাক ডাকতে শুরু করবে তো ?'

'হ্যাঁ করব ; অসুবিধে হলে তুমি বারান্দায় গিয়ে কাগজ পড় না।'

'শীতের এই অবেলায় আর ঘুমিও না, শরীর আরো খারাপ লাগবে দেখবে।'

'তুমি তো বড় অদ্ভুত মানুষ, কে ঘুমোচ্ছ এখন ?'

'ও, ঘুমোচ্ছ না তাহলে ?'

'আবার ঢঙ দেখ না !' শোভনা হাসল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল মণিময়। পরে শোভনার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, রুবিকে এবার তুলে দাও, সেই তখন থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুমোক, ট্রেনে একদম ঘুমোতে পারেনি মেয়েটা।'

মণিময় এবার নেড়ে নেড়ে বলল, 'তবে আর কি, ঘুমোক ! এবার মা-মেয়েতে ঘুমের জোর কম্‌পিটিসন্‌ চালাও।'

'যেন, তোমার হিংসে হচ্ছে ?' শোভনা টেনে টেনে হাসল।

মণিময়ের কি যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, বলল, 'আরে, শঙ্করটা কি করছে দেখেছ ?'

'তুমি যাও না, দেখে এসো কি করছে।'

'ইয়ার্কি নয়, যাও, দেখে এসে পরে শোও, হাত-পা না কাটে আবার।'

'কেউ ইয়ার্কি মারছে না, আমি এখন উঠতে পারব না।' শোভনা পাশ ফিরে শুলো ; পরে হাসতে হাসতে বলল, 'ছেলের জন্যে কত চিন্তা !' একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলল, 'অত ভাবতে হবে না তোমার, কাকীমা ধরে এনে শুইয়েছে।'

প্রণব যেখানে শুয়েছে সেখান থেকে কল্যাণীকে দেখা যায়, মাঝের দরজা খোলা। প্রণব ওকে একবার দেখল, কল্যাণীও তাকে চোরা চোখে দেখছে। কয়েকবার চোখোচোখি হয়েছে ওদের।

প্রণবের বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন কেমন ফাঁকা লাগল। কল্যাণীর ওই নীরব দৃষ্টির মধ্যে যেন আরো কী কথা আছে। প্রণবের

এই মুহূর্তে আবার কলকাতার কথা মনে পড়ল। বিধবা মা, ভাই বোন সবার মুখ এই পড়ন্ত বিকেলে কেন যেন তার কল্পনায় ভেসে উঠল। নিজেকে এই মুহূর্তে বড় দীন, সঙ্কুচিত মনে হলো। বুকের ভেতর কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, কান্না। শুধু তার বোন বা বাবার কথাই নয়, এখানকার কত তুচ্ছ ঘটনা, কৈশোর, অস্ফুট যৌবনের কত কথা একসঙ্গে মনের ওপর ভিড় করে এসেছে। সব কিছুই যেন তার হারিয়ে গেছে। কোন সুখই তার কপালে সইল না, এমনই অভাগা! এই ক-বছর তার কতই না ওঠা-নামার জীবন। দারিদ্র্য, অবহেলা, কখনো ব্যর্থতা, কখনো বা সাফল্যের কত টুকরো টুকরো ছবি মনের পরতে পরতে জমে রয়েছে। আজ কেন যেন সেই লুকোনো ছবিগুলোকে বের করে দেখতে বড় সাধ হয়েছে তার। চুপি চুপি সেগুলোকে দেখতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতন অকারণ এক অভিমান ও কান্নায় বুকের ভেতরটা তার কেবলই ভারী হয়ে উঠেছে। অন্য পাশে শুয়ে প্রণব এখন মনের এই আবেগ ও কষ্টকে লুকোতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছে না, কিছুতেই সামলাতে পারছে না। এই অবেলায় প্রণবের চোখে এখন জল, কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে সব।

চার

প্রণব কত কী ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। জানলা দিয়ে ঘরে সূর্যের নিবুনিবু, মরা আলোর ছায়া এসে পড়েছে। কল্যাণী ঘরে ঢুকে ওকে এভাবে এলোমেলো শুয়ে থাকতে দেখে নিজের মনেই হাসল একটু। হাঁটু মোড়া, হাত দুটো হাঁটুর মধ্যে, সামান্য কুঁজো ভঙ্গিতে শুয়ে আছে প্রণব। একটা মশা মুখের ওপর এসে বসেছে। কল্যাণী একহাতে মশাটাকে তাড়িয়ে দিল। ওর অন্য হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। আস্তে আস্তে ডাকল, 'এই—, উঠুন।'

কোন সাড়া নেই প্রণবের। আর একটু কাছে এলো কল্যাণী, সামান্য জোরে ডাকল, 'এই -, উঠুন না, আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব, চা যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল।'

প্রণব তখনও গভীর ঘুমে। ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এবার অল্প একটু ঝুঁকে কল্যাণী আস্তে করে ঠেলা দিল. 'এই—. উঠুন, আর কত ঘুমোবেন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

এতক্ষণে প্রণব চোখ খুলেছে। শূন্য দৃষ্টিতে এক পলক দেখল. মনে হচ্ছিল, ঘুমের ঘোর এখনও পুরোপুরি তার কাটে নি। কল্যাণী হেসে ফেলেছে, বলল, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খুব মজার স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি ?'

তাড়াতাড়ি উঠে বসল প্রণব। আচ্ছন্ন ভাবটা এই মুহূর্তে আর নেই। চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল টকটকে দেখাচ্ছে। কল্যাণীর মনে হলো, আচমকা এভাবে ঘুম ভাঙানোটা তার ঠিক হয় নি। চোখ রগড়ে নিয়ে প্রণব কল্যাণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে অল্পক্ষণ চেয়ে থাকল, বলল, 'ভীষণ ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।' একটু থেমে হাসতে হাসতে আবার বলে, 'ঘুমের মধ্যেই শুনছি, কে যেন আমায় ডাকছে, অথচ কিছুতেই চোখ খুলতে পারছি না।'

'বাব্‌বা, কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছেন।'

'যাঃ, এটা আবার তুমি বাড়িয়ে বলছ।'

'একটুও না, চা হাতে নিয়ে সেই কখন থেকে ডাকছি, ঘুমোচ্ছেন তো ঘুমোচ্ছেনই!' কল্যাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। হেসে হেসে বলল, 'এই নিন আপনার চা, দেখুন খেতে পারবেন কিনা।'

প্রণব চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে বলে, 'খুব পারব।'

'ঠিক আছে, পরে আব একবাব গবম চা খাবেন।'

'আমি আবার একটু ঠাণ্ডা চা-ই খেতে ভালবাসি।' প্রণব একটা সিগাবেট ধবিয়ে নিল।

কল্যাণী সবে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। মশা ভন ভন করছে। জানলাগুলো এক এক কবে বন্ধ কবে দিল।

প্রণব সিগারেটে টান দিয়ে কল্যাণীব চোখে চোখে চেয়ে শুধোয়, 'মণিময়দা উঠেছে?'

'কখন! দাদাভাই-ই তো চা কবে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আপনাকে তুলে দিতে বলল।' কল্যাণী মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

'ভালই করেছ, না ডাকলে ঘুমই ভাঙত না দেখছি!' প্রণব চায়ে চুমুক দিল। সিগারেট খেতে খেতে গাঢ় গলায় কল্যাণীকে বলল, 'এই, আমার পকেট থেকে ঘড়িটা দাও না একবাব!'

'কেন, নিজে উঠতে পাবছেন না?' কল্যাণী চোখে চোখে চেয়ে হাসছে।

'চা-টা আগে শেষ করি।'

'একেবারে কুঁড়ের বাদশা।' কল্যাণী পকেটে হাত দিতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে আনল। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রণবের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, 'পকেটে হাত দেব তো?'

'দাও, অত ভয়ের কিছু নেই।'

কল্যাণী ঘড়িটা দেখে প্রণবের হাতে দিল, বলল, 'পাঁচটা বেজে গেছে, আর দেরি করবেন না কিন্তু!'

'বেরোবে নাকি?' প্রণব অবশিষ্ট চা-টুকু শেষ করে কাপটা একপাশে সরিয়ে রাখে।

'দিন, আমার হাতে দিন।' কল্যাণী এগিয়ে এসে কাপটা হাতে নিয়ে বলল, 'চলুন কাছাকাছিই একটু ঘুরে আসব।'

'এখনও তো তৈরী হও নি দেখছি!'

'তৈরী হওয়ার কি আছে, এই শাড়িটা শুধু পাল্টে নেব একবার।'

'এটা পরেই চল না, বেশ তো লাগছে!'

'ঠাট্টা করছেন?'

'মোটেই না।' প্রণব হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে, 'সিরিয়াস্‌লি বলছি।' প্রণব ওর মুখের দিকে হাসি হাসি চোখে চেয়ে থাকল ক-মুহূর্ত। সিগারেটটা শেষ করে টুকরোটা নিবিয়ে দিল।

কল্যাণীর চোখ-মুখ সহসা কী এক লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। একটা ঢোক গিলে বলে, 'কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ুন তো।'

'আমি রেডি, হাত-মুখে জল দিয়ে পাজামা আর পাঞ্জাবিটা পরে নেব, সে আর কতক্ষণ!'

'কেন, এই লুঙ্গি পরেই চলুন না।' কল্যাণী এবার ফিক করে হেসে ফেলে।

প্রণবও হেসে ফেলেছে, বলল, 'হুঁ—, তাও পারি; চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।'

'চেনা না ছাই, এখানে এখন আপনি অচেনা বামুন।' কল্যাণী চোখ টান টান করে হাসি হাসি মুখে কথাটা বলে প্রণবকে অপলকে দেখল।

প্রণব ধীরে ধীরে চোখ সরিয়ে এনেছে। কি যেন তার মনে হলো হঠাৎ, মুখটা কেমন ম্লান দেখাল একটু। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি, আমি এখন সত্যিই এখানে অচেনা।' বিষণ্ণ হাসি ফুটল মুখে। ওর কথার তলায় প্রচ্ছন্ন এক বেদনা রয়েছে যেন।

'আমি কিন্তু সেরকম কিছু ভেবে বলি নি।' কল্যাণী আনত মুখে বলল। সে পরিহাস করেই কথাটা বলেছিল, কিছুই ভাবে নি। অথচ সামান্য এই কথাটা যে ওকে এভাবে ব্যথা দেবে, বিমর্ষ করবে, কল্যাণী তা বুঝতে পারে নি। বুকটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

'কথাটা তো আর মিথ্যে নয়, সত্যিই আজ আমাকে এখানে কে চেনে!' প্রণব এবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কল্যাণীর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, প্যাণ্ট আর হাওয়াই-শার্ট পরব।'

'আপনার যা ভাল লাগে তাই পরবেন।' কল্যাণী চোখ তুলে এক নিমেষ প্রণবকে দেখল। তারপর চলে যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই রুবি এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'এই যে রাঙাপিসী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে, আর আমি কিনা তোমায় খুঁজে খুঁজে মরে যাচ্ছি!' রুবি ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

'কেন রে?'

'তুমি তো এখনও তৈরীই হও নি, যাও, মা তোমাকে ডাকছে।' রুবি যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'তোদের হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—।' রুবি মাথা নেড়ে ওর হাত ধরে টান দিল আস্তে করে।

'চল্ যাচ্ছি।'

কল্যাণীরা চলে গেল। তারপরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল প্রণব। একসময় চোখে-মুখে জল দেওয়ার জন্যে সে উঠে পড়ল। পথে মণিময়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার।

কাপড় পরতে পরতে মণিময় চেঁচিয়ে উঠেছে প্রণবকে দেখে, 'এই যে ভাই, তুমিই খেল দেখালে মাইরি!'

প্রণব মুচকি হেসে বলল, 'কেন?'

'আবার জিজ্ঞেস করছ কেন, দিনের বেলায়ই এই রেটে ঘুম!'

'এ আর এমন কি!'

'না ভাই, তুমি তোমার বউদির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।'

'শুনছেন বউদি?'

শোভনা হাত-মুখ ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্নো মেখে পাউডারের পাফটা আলতো করে মুখের ওপর বুলোচ্ছিল। হেসে বলল, 'শুনেছি ভাই। আপনার দাদা তো খালি আমার ঘুমই দেখছে।'

একটু পরে কল্যাণীও এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে ক্রীম মাখতে মাখতে শোভনার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছে ও, বলল, 'তোমাকে যে চেনাই যায় না বউদি।'

'আবার আমার পেছনে কেন?' শোভনা শাড়ি পরছিল।

মণিময় জামা পরে নিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে বলল, 'তোমাদের হলো?'

'আমরা রেডি দাদাভাই, ওদিকে হয়েছে কিনা একবার দেখ।'

'আমারও হয়ে গেছে মণিময়দা।' প্রণব কি ভেবে শেষ পর্যন্ত পাজামা আর কেটের পাঞ্জাবিটা পরে নিল। পকেটে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, রুমাল, কিছু খুচরো পয়সা রাখল। বুক পকেটে কটা টাকাও রেখেছে। সুটকেসের চাবিটা নিজের কাছেই রেখে দিল। এ-ঘরে এসে প্রণব বলল, 'চুলটা একটু আঁচড়ে নেব শুধু।'

মণিময় ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল, 'এরপর আবার চুল! না প্রণব, তুমিই দেখাচ্ছ মাইরি!'

'তোমরা সাজবে, আর ও বেচারার যত দোষ! না গো, আপনি আঁচড়ে নিন, ইচ্ছে হলে মুখে স্নো-পাউডারও মাখতে পারেন।' বলে শোভনা ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসল।

'এই না হলে কি আর বউদি!' প্রণব চুলটা চিরুণী দিয়ে ঠিক করে নিল।

'কল্যাণীটাই এখন মাইরি যত দেরি করছে। কিরে, হলো তোর?' মণিময় তাড়া দিল।

'আমার হয়ে গেছে, তোমরা বেরোও না।

শোভনা উঠে পড়ল, 'যাও, তোমরা বেরোও।'

প্রণব বারান্দায় এসে দাঁড়াল, 'এত তাড়াহুড়োর কি আছে, এখনো তো বাইরে আলো রয়েছে।'

শোভনা হাসি মুখে বলল, 'মতলবটা কি শুনি, অন্ধকারে বেরোবেন নাকি?'

'সে তো আপনাদের ইচ্ছে।'

শোভনা চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে হেসে উঠল, 'বুঝেছি।'

প্রণবও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদেরই তো এখনো হলো না।'

'এই—, আমার হয়ে গেছে।' শোভনা মিষ্টি করে চোখ পাকাল।

'আর একজন?' প্রণবের মুখে তখনও হাসি লেগে রয়েছে।

'আর একজনও আসছে। বড্ড ভাবনা দেখছি!' শোভনা ছোট্ট করে কি ইঙ্গিত করল যেন। পরে আস্তে আস্তে আবার বলল, 'এখনও ছেলেমানুষ, ধোঁয়া দেখেই আগুন চিনতে হয়, বুঝলেন?'

'আগুনটি কে শুনি?' প্রণব শোভনার চোখে চোখে চেয়ে থাকল।

'আহা, ভাজা মাছটি কি আর উল্টে খেতে পারেন!'

সেই মুহূর্তে কল্যাণী এসে দাঁড়িয়েছে। শোভনা ওকে দেখে মজা করে বলল, 'এসো ভাই, তোমার জন্যে যে আমাদের পা-ই উঠছে না।'

'বউদি!' কল্যাণী চোখ পাকাল। এগিয়ে এসে গায়ে চিমটি কাটল।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে হাসছিল, বলল, 'আগুনই বটে!'

'আগুন, কিসের আগুন?' কল্যাণী কিছু বুঝতে না পেরে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

শোভনা বলল, 'ও তুমি বুঝবে না।'

প্রণব গুন গুন করে গেয়ে উঠল, 'আগুনের পবশমণি ছোঁয়াও…'

'থাক, আর আগুনের পরশমণির দরকাব নেই, এখন চলুন তো!' শোভনা ওকে ছোট করে একটা ঠেলা দিয়ে এগিয়ে গেল।

কল্যাণী রুবি বাগানে নেমে পড়েছে। শঙ্কব এসে প্রণবেব হাত ধরল। ওরা ফুল তুলছিল। বাগানে অনেক গোলাপ ফুটে বয়েছে। টাটকা দেখে কটা ফুল তুলে কল্যাণী খোঁপায় পবল। রুবি কাঁটার ভয়ে তুলতে পারছে না, বলল, 'আমায় দাও না রাঙাপিসী, আমি একটাও পেলাম না।'

'দিচ্ছি।' কল্যাণী অনেকগুলো তুলেছে। দুটো রুবিকে দিল, পরে শোভনার কাছে এসে বলল, 'নেবে নাকি?'

শোভনা হেসে হেসে বলল, 'দাও, ফুলে আর আপত্তি কি!'

'দাঁড়াও, খোঁপায় পবিয়ে দিই তোমায়।'

মণিময় সিগাবেটে টান দিতে দিতে বলল, 'নে, এবাব চল, আর সাজতে হবে না।'

'অত তাড়া কেন, আমরা তো আর অফিস-কাছারি করতে যাচ্ছি না।' শোভনা বলল।

'অন্ধকার হয়ে গেলে আর বেড়াবেটা কি!' মণিময় গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সূর্যের আলো এখন অনেক ঝিমিয়ে এসেছে। মাঠের ঢালুতে, আনাচে-কানাচে কুয়াশার রেণুগুলো লেগে রয়েছে। কিছু বক দেখা গেল নদীর ওপারে পাথরের টিলার ওপর। রাস্তাটা সামান্য উঁচু-নীচু। দূরে দূরে কিছু ঝোপ, বনের সারি; কিছু শালগাছ চোখে পড়ছিল। তাদের মাথায় মাথায় ক্লান্ত, বিষণ্ণ আলোটা টপকে টপকে ঘরের পথ ধরেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মণিময় একসময়

মুগ্ধ হওয়ার গলায় বলল, 'বুঝলে প্রণব, শীতের সময় এদিকটা বেশ লাগে!'

'পুরো বেল্টটাই খুব চার্মিং।'

'ঠিক বলেছ।'

কটা রাড়ি পেরিয়েই ছোটমতন একটা মাঠ। মাঠটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে। প্রণব সেদিকে চেয়ে বলল, 'নদীটা যেন আবো সরু হয়ে গেছে এখন।'

'কি আশ্চর্য, ওরও তো বয়েস হচ্ছে, ওর জীবনেও তো ভাঙাগড়া আছে।' মণিময় সিগারেট টানতে টানতে হাসল।

সবাই হেসে উঠেছে। আরো খানিকটা এসে ওরা বড় রাস্তায় পড়ল। প্রণব মণিময়ের দিকে তাকাল, 'এবার কোন্ দিকে?'

'সোজা, পরে ডানদিকে চার্চের পাশ দিয়ে ক্লাব রোড ধরে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় গিয়ে পড়ব।'

শরতের শেষ বেলার আলোটাও এখন মাঠ থেকে উঠে গেছে। একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। গাছের মাথায়, ডালে, পাতার আড়ালে বসে পাখিরা চিৎকার করছিল। কিছু শুকনো ঝরা পাতা পায়ের নীচে পড়ায় মড়মড় শব্দ হলো। এই বিকেল, ক্লান্ত সন্ধ্যা এতক্ষণে প্রণবের মনেও এক বিষণ্ণতার ছায়া মেলে দিয়েছে। শোভনা কল্যাণী রুবি একসঙ্গে রয়েছে। শঙ্কর আর প্রণব এখন সকলের পেছনে। মণিময় সবার আগে। মাঝে মাঝে কল্যাণী পিছিয়ে পড়ছিল। প্রণবও নীরবে হাঁটছে।

শোভনা প্রণবকে একটু অন্যমনস্ক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছেন অত গম্ভীর হয়ে?'

'কি আর ভাবব, কিছুই নয়।'

'উহুঁ, হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন।'

কল্যাণী হেসে উঠল, বলল, 'কলকাতার কারো কথা হয়তো মনে পড়ে গেছে।'

শোভনাও হেসে হেসে বলল, 'কি, তাই নাকি ? আরে, বলুন না আমাদের, ঠকবেন না।'

'যে বলছে তাকেই জিজ্ঞেস করুন না!'

প্রণবের কথায় কল্যাণী যেন লজ্জা পেল। সে লাজুক কণ্ঠে বলল, 'বারে, আপনার খবর আমি জানব কি করে ?'

মণিময় পেছন ফিরে তাকিয়ে শোভনাদের বলল, 'কি আশ্চর্য, আর একটু জোরে হাঁট।'.

শঙ্কর এবার এগিয়ে এলো সামনে। মণিময়দেব হাত ধবে ও হাঁটছে।

শোভনা বলল, 'তুমি যেমন যাচ্ছ, যাও না। এমন লোকেব সঙ্গে বেড়িয়েও সুখ নেই।' শোভনা আগের মতই ধীবে ধীবে হাঁটছিল।

'এতকাল তো এই লোকেব সঙ্গেই বেড়িয়েছ।'

'ইস্—, কত জায়গায় আমায় নিয়ে গেছ!'

'কী ডাহা মিথ্যে কথা বলছ মাইবি!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো সত্যবাদী যুধিষ্ঠিব।'

'এই—, তোমায় পুবী নিয়ে যাই নি, বল নিয়ে যাই নি ?'

'বিয়ের পর ওই তো এক পুরী, জন্মেব মধ্যে কর্ম কবেছ।'

'ঠিক হ্যায়, এবপব তোমাকে গয়া কাশী বৃন্দাবন মথুরা ঘুরিয়ে আনব, হলো ?'

মণিময়ের কথার ঢঙ দেখে শোভনা না হেসে পারল না, বলল, 'হয়েছে, আব গলা করতে হবে না, ওটা শঙ্করের ওপরই থাক।'

কল্যাণী পিছিয়ে পড়েছে আবাব। প্রণবের পাশাপাশি হাঁটছে, সামান্য হেসে ও ফিসফিস করে বলল, 'এই, ফুল নেবেন ?' কল্যাণীর চোখের ওপর নম্র ভীরু এক ছায়া কাঁপছে যেন। গলার স্বরও মৃদু, আবেগে থরথর।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বেশ তো দেখাচ্ছে।'

'ধ্যাৎ—' চোখের পল্লব ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল কল্যাণী। অনুচ্চ গলায় বলল, 'নিন, ধরুন।'

'এর চেয়ে তো তোমার খোঁপারটাই দেখতে ভাল

'তাহলে যান, নিতে হবে না আর।' কল্যাণী হাসতে হাসতে আবার এগিয়ে গেল।

ওরা চার্চের কাছাকাছি এসে পড়েছে। এদিকটা অনেক নিরিবিলি, ফাঁকা। পথের আশপাশে কিছু গাছগাছালি, ঝোপঝাড় থাকায় অন্ধকার এখানে আরো গাঢ় মনে হচ্ছিল। রাস্তায় কোন আলো ছিল না। এখন রুবি কল্যাণী আর শঙ্কর হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

প্রণব একটু তফাতে। ও মৃদু মৃদু হাসছিল, বলল, 'এই ঝোপের মধ্যে কি আছে জান রুবি?'

'না, কি আছে বলুন না!' রুবি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'শাকচুন্নি আছে।' প্রণব হাসছিল।

কল্যাণী আড়চোখে একবার দেখল ওকে, জিজ্ঞেস করল, 'ওরা বুঝি খুব চেনা আপনার?' কল্যাণী তখনো একদৃষ্টে চেয়ে থাকল।

'চেনা মানে, ভীষণ চেনা, যখন বেরিয়ে আসবে তখন বুঝবে।'

মণিময় হেসে উঠল জোরে জোরে, 'শাকচুন্নি কিরে, এখানে সব বেহ্মদত্যিরা থাকে।'

শঙ্কর সমানে হাসছিল, 'বেহ্মদত্যি কিরে দিদিভাই?'

'তোর মতন ছেলে ভূত, ভারী দুষ্টু।' মণিময় ছেলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

শোভনা বলল, 'সন্ধ্যের সময় ওসব ভূত-টুতের গল্প ভাল লাগে না।'

'আপনি জানেন না বউদি, এখানে একবার একটা লোক ফাঁস লটকে মরেছিল।'

'মাগো, জেনে আর দরকার নেই আমার।

'আমার বাবা ভয় করছে।' কল্যাণী কয়েক পা এগিয়ে গেল। রুবিও একদৌড়ে মণিময়ের কাছে চলে এসেছে।

'ভয় কিরে, এই তো এসে পড়েছি আমরা।' মণিময় কি ভেবে হাসল একটু।

শোভনা যেন এইটুকু পথ হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলল, 'চল, কোথাও একটু বসি গিয়ে। আমার কোমর ধরে গেছে।'

মণিময় না হেসে পারল না, বলল, 'মোটাদের নিয়ে বড় বিপদ।'

'এই —, মোটা মোটা করবে না তো বলছি ; নিজে তো একজন তালপাতার সেপাই।'

'আমি তো আর একটুতেই তোমার মত গেলাম-গেলাম করি না।'

'যাও, আর বাজে বকো না।' পরে কল্যাণীর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'এসো তো, আমরা আগে একটু জিরিয়ে নিই।'

'কোন্‌দিকে বসবে ?' কল্যাণী শুধোয়।

'ওদিকটায় চল, একটু ফাঁকা আছে।'

'আমি চায়ের কথা বলে আসি।' প্রণব শোভনার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

রুবি মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিন্তু চা খাব না প্রণবকাকু।'

'আমিও না।' শঙ্কর বলল।

'তবে আর কি, তিনটে বলুন।'

রুবি আর শঙ্কর বাঁধানো বেদিটার ওপর এসে বসল। কল্যাণী শোভনা একটা বেঞ্চে। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতাগুলো একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে। একটা পাতা ছিঁড়ল কল্যাণী। প্রণব চায়ের কথা বলে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে। চোখদুটো অল্প অল্প তার জ্বালা করছে। মণিময় একপাশে দাঁড়ানো। স্টেশনে লোকজনের ভিড় রয়েছে। আরো অনেকেই এখানে বেড়াতে এসেছে।

'এত ভিড় যে, এখন আবার কোন্ ট্রেন ?

চা-অলা চা নিয়ে এসেছে। চায়ের কাপগুলো হাতে হাতে এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'এক্ষুনি পাটনা যাওয়ার টেরেন্ আছে বাবু।'

'এরপরই তাহলে হাওড়ার গাড়ি আসবে।'

ওদের সামনে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে একটা শিরীষ গাছ। তার তলায় অনেকেই ছড়িয়ে রয়েছে। একটি ষোল-সতের বছরের ছেলের হাতে ট্রানজিস্টার। একটা চটুল হিন্দী গান বাজছে ওটায়। আরো কটা ওই বয়েসেরই ছেলে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাতে তুড়ি মেরে মেরে তাল দিচ্ছে। অনেকেই যেন এতে মজা পেয়েছে, হাসছে; ওদের কেউ কেউ আবার টুইস্ট নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে মেয়েদের দেখে ছোটখাট রসিকতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। প্রণবের কাছে দৃশ্যটা কেমন বিসদৃশ, বেঢপ লাগছে।

শোভনা চা খেতে খেতে একসময় বলে উঠল, 'এই হয়েছে এখনকার এক ফ্যাসান।'

কল্যাণী বলল, 'আমার খুব বাজে লাগে।

মণিময় তুড়ি মেরে বলল, 'কেন, আমার তো বেশ লাগছে, ফুর্তি করার এই তো বয়েস।' শেষবারের মতন একমুখ ধোঁয়া নিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল।

'আমিও ওদের মতন নাচতে পারি, দেখবে, দেখবে?' বলেই শঙ্কর কারো বলার অপেক্ষা না রেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে দু-পাক নেচে নিল।

ওপাশ থেকে একমুঠো হুল্লোড় যেন তীরের মতন ছুটে এলো, ওরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'সাবাস ভাইয়া!'

এরাও সবাই হেসে উঠেছে।

রুবি ধমকের গলায় বলল, 'কি হচ্ছে ভাই, ভীষণ অসভ্য হয়েছ তুমি!'

'তোর বাপকে এবার থেকে রোজ নাচ দেখাবি।' শোভনা চা শেষ করে কাপটা মাটিতে রেখে দিল।

কল্যাণীও চা শেষ করে কাপটা রাখতে রাখতে মুখটা সামান্য বিকৃত করে বলল, 'কি বাজে চা!'

'মুখটাই আমার খারাপ হয়ে গেল।'

লোকের ভিড়, কোলাহল আরো বেড়েছে। ঘন্টি বাজল, লোকেরা দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। একটু পরে ট্রেন এলো। লোকের চিৎকারে জায়গাটা মুহূর্তের মধ্যে অন্যরকম হয়ে গেল। ট্রেন চলে গেলে আবার অনেকটা ফাঁকা হয়ে এলো।

প্রণব সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'পান চলবে বউদি?'

'হুঁ—, খুব।' শোভনা মাথা নাড়ল।

'ছ-সাতটা নিয়ে এসো না।' মণিময় হাসতে থাকে।

একটু পরে পান নিয়ে এলো প্রণব। শোভনার হাতে দিয়ে এবার সে বসে পড়ল।

সিগারেট টানতে টানতে প্রণব কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এক সময় কি মনে হতে অনাড়ষ্ট গলায় বলল, 'জানেন বউদি, আমার বাবা একদিন এখানেই কাটা পড়েছিল।'

শোভনা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে আনল। এই হাসি-ঠাট্টার মধ্যে আচমকা এমন একটা কথা বলে ফেলবে প্রণব, ভাবতেই পারে নি। সবাই কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। কল্যাণী নত ভঙ্গিতে আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াচ্ছিল।

প্রণবের হাতে সিগারেটের টুকরোটা এখনও জ্বলছে। সে অন্যমনস্ক। কেমন যেন অচেনা, অপরিচিতের মতন লাগছে। কী একটা সমানে তখনো ভেবে চলেছে সে। একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বলল, 'শুনেছি, একটা বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়েই বাবা কাটা পড়েছিল।'

'তোমার বাবার কথা এখনও আমাদের মনে আছে প্রণব।' মণিময়ের গলায় সহানুভূতি, মমতা ছিল।

প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তুলল, বলল, 'ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কত জায়গায় যে ঘুরেছি।'

মণিময় ওর চোখে চোখে চেয়ে আছে, বলল, 'যা গেছে, তা যেতেই দাও প্রণব, শুধু শুধু মন খারাপ করা!'

'হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ জায়গাটা যে আমাদের জীবনে এক মস্ত ঘটনা।'

'এরকম দুঃখ আমাদের সবারই কিছু না কিছু আছে প্রণব; ভাবলেই কষ্ট।'

শোভনা মণিময়ের দিকে তাকাল, বলল, 'চল, উঠি এবার।' একটু চুপ করে থেকে প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'উঠুন তো এবার, এসব ভেবে আর মন খারাপ করতে হবে না।'

'হ্যাঁ, উঠুন।' সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল প্রণব।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। ঢাকের আওয়াজ আসছে কানে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে গেছে। এমন সময় নগেন্দ্র কুটিরের' একটি ছেলে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে। হাসতে হাসতে বলল, 'মণিময়দা না, কবে এলেন?'

'আজই সকালে। কি চেহারা করে ফেলেছ, চিনতেই পারছিলাম না।' মণিময় কথা বলতে বলতে চোখ-মুখের এক মজার ভঙ্গি করে।

'সে কি, চিনতেই পারছেন না!'

'ওমা, তুমি যে মৃণাল, আমি বুঝতেই পারি নি।' শোভনা ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

'কি করে আর চিনবেন, এখানে আসা তো ছেড়েই দিয়েছেন প্রায়।'

'তা কেন ভাই, নিজেদের বাড়ি, লোকজন আছে, না এসে পারি?'

প্রণব পেছনে ছিল, কাছে এগিয়ে এলো। মৃণালের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, 'কিরে, চিনতে পারছিস?'

'প্রণব না? কী রোগা হয়েছিস রে?' মৃণালের গলা আন্তরিকতায় ভরে উঠেছে।

'আমি বরাবরই তো এরকম।'

'কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা!' মৃণালকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। শুধোল, 'আছিস তো কিছুদিন?'

'ইচ্ছে তো সেরকমই।'

'ফাইন, তবে তো এবার একটা জলসাই লাগিয়ে দেওয়া যায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব বিবাট করে কিছু একটা লাগাও তো ভাই।' মণিময় উৎসাহ দিল।

'আমাব ওপব কিন্তু ভবসা কবিস না, গান-টানেব একদম চর্চা নেই।'

'ঠিক আছে, তুই আগে আমাদেব বাড়ি আয় তো।' মৃণাল ওদেব দিকে চেয়ে পরে বলল, 'আপনাবাও আসবেন বউদি; কল্যাণী, ওঁদের নিয়ে এসো না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব ভাই, তোমাব আর অত কবে বলতে হবে না।' শোভনা হাসি হাসি মুখে বলল।

মৃণাল চলে গেল। ওবা আসতে আসতে আবাব মাঠেব মধ্যে পড়ল। পথের পাশে দুটো কাঁঠাল ও আমগাছ। ঘন পাতায় ছায়াটা এখানে আরো নিবিড়, ভবাট। শিউলির গন্ধ ভুবভুব কবছে। ওবা সামনে, প্রণব পেছনে। হঠাৎ কি মনে কবে কল্যাণী দাড়িয়ে পড়েছে। ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ওকে কি ইশারা কবল।

প্রণব যেন এমনটা আশাই করে নি। ও-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে, অস্ফুটে বলল, 'কি ব্যাপাব?'

কল্যাণী ফিসফিস করে বলল, 'হাত পাতুন।'

'কেন?'

'আহা, পাতুনই না!' খোঁপা থেকে কল্যাণী ফুলটা হাতে নিল। প্রণবেব দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যত্ন করে রেখে দেবেন কিন্তু!' কল্যাণী চোখের এক মনোরম ভঙ্গি করে হাসল। হাসতে হাসতে জোরে পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেলল আবার।

প্রণব হাসতে গিয়েও কোথায় যেন একটা খোঁচা অনুভব করল।

'শৈলকুটিরের' কাছাকাছি এসে কল্যাণী বলল, 'এই যে দাদাভাই, তোমার সেই ড্রিমল্যাণ্ড।'

মণিময় সহাস্যে বলল, 'হ্যাঁরে, ড্রিমল্যাণ্ডে এখন ভূতের নাচ হয়।'

শোভনা কৌতুক বোধ করছিল, বলল. 'একদিন তো পরীর নাচ হত, তাই না কল্যাণী?'

'পরী কি গো, বল উর্বশী মেনকাব নাচ।' মণিময় হাসতে হাসতে জবাব দিল।

শোভনা কটাক্ষে মণিময়কে একবার দেখল, তারপর টেনে টেনে বলল, 'উর্বশীটি কি বিজলী?'

'এই তো দোষ তোমাদের।' মণিময় হাসতে হাসতে শোভনার মুখের দিকে তাকাল. 'বেশ তো চলছিল, আবার রিয়ালিটিতে আসা কেন?'

'কিছুই যে বুঝতে পারছি না!' প্রণবের মুখেও হাসি।

'ওমা জানেন না, আপনাব দাদাটি তো একেবারে প্রেমিক সাজাহান! তার কীর্তির কথা হচ্ছে।' শোভনা জোরে জোরে হাসতে লাগল।

'কি ব্যাপার মণিময়দা?'

'ব্যাপাব আর কিবে ভাই, এ-বাড়ির বিজলী বলে একটা মেয়েকে একদিন ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়।' মণিময়ও কথা বলতে বলতে হাসছিল।

শোভনা তখনো হাসছে। বলল, 'কে বারণ করেছিল, করলেই পারতে, আমি বেঁচে যেতাম।'

'কে আবার, স্বয়ং পিতৃদেব। এমন মোক্ষম ওষুধ দিলেন যে, একদিনেই প্রেম-ফ্রেম উধাও।' মণিময় হো হো করে হাসতে লাগল। কল্যাণীও হাসছে। রুবি আর শঙ্কর অনেকটা তখন এগিয়ে গেছে।

ওরা একেবারে বাড়ির গেটের কাছে চলে এলো আবার। আবছা অন্ধকারে একটা মোটর গাড়ি দেখা গেল। ভেতরে অনেকের কথা শোনা যাচ্ছে। কল্যাণী তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকল। শোভনাও।

প্রণব মণিময়কে বলল, 'আপনি যান, আমি পুজো প্যাণ্ডেলটা একবার ঘুরে আসি।'

'তাড়াতাড়ি এসো, দেখি, কারা এলো আবার।'

প্রণব কি ভেবে মুচকি একটু হাসে। তারপর আস্তে আস্তে পুজো মণ্ডপে এসে দাঁড়াল। ফাঁকা জায়গায় এরই মধ্যে দু-তিনটে গাড়ি দাঁড়ানো। খুব মিহি আকারে এখন হিম পড়ছে। কয়েকটা পান-বিড়ির দোকান বসেছে। প্রতিমার দিকে অপলকে সে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। মুখখানা বড করুণ, মমতায় ভরে আছে। এ-মুখ যেন তার খুব চেনা। ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন যেন তার মায়ের অসহায়, ক্লিষ্ট মুখটা মনে পড়ে গেল। সংসারে তার মায়ের মতন দুঃখী যেন আর কেউ নেই। প্রণব জানে অনেক কষ্টে সংসারের হালটা মা ধরে রেখেছে। আর কতদিন যে এভাবে ধরে থাকতে হবে কে জানে! অথচ কারো ওপর তার মার কোন অভিযোগ নেই। মার করুণ বেদনার্ত মুখটা এই মুহূর্তে প্রণবকে কেমন ব্যথিত ও উদাসীন করছিল।

এত তাড়াতাড়ি বাডি ফিরতে তার ইচ্ছে হলো না। হয়তো মণিময়দার আরো অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে। সবাইকে সে চেনে না, হাজার হোক সে বাইরে লোক। অস্বস্তি বোধ করতে পারে। কি ভেবে সে মাটি থেকে তিন-চারটে শুকনো ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। পাতাগুলো কচলে নিয়ে আবার ফেলে দিল। কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে, কয়েকটায় তখনো অন্ধকার। মণিময়দা জোর করল বলেই এবার আসা হলো তার। তাছাড়া পুরনো জায়গার জন্যে সব সময়ই এক ধরনের দুর্বলতা অনুভব করেছে

প্রণব। এখানে একদিন সে কত কী ফেলে রেখে গেছে; সেগুলো আবার দেখতে ভারী ইচ্ছে হত। কখনো কখনো মনে হত, এখন কি আর কেউ চিনবে তাকে? ভীষণ, ভীষণ লোভ হয়েছে আসতে। শুধু তো আনন্দের উচ্ছল দিনগুলোই নয়, প্রিয়জন হারাবার সেই দুঃখের দিনগুলোর জন্যেও কত সময় সে ছটফট করেছে। শুধু বাবাকে সে হারায় নি এখানে। তার এক বোনও অনেকদিন স্যানিটোরিয়াম-এ ছিল। সেই বোনও বাঁচে নি। ওর নাম ছিল বাণী। স্টেশনে যখন বসে ছিল ওরা, বাবার মুখটা বার বার মনের ওপর ভেসে উঠেছে। এখন আবার বাণীর কথা মনে পড়ল। এর মধ্যে প্রণব একদিন স্যানিটোরিয়ামটা গিয়ে দেখে আসবে। বুকের ভেতরটা তার খচখচ করতে থাকে। কত কথা মনে পড়ে যায়। ওদের দেখে বাণী অসুখ ভুলেও হাসতে চেয়েছে। চোখের জল মুছতে মুছতে বাণী একদিন বলেছিল, 'আমি আর বাঁচবো না রে বড়দা।' মনে আছে, প্রণব ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, 'কে বলেছে তোকে বাঁচবি না, ঠিক ভাল হয়ে যাবি, দেখিস তুই।'

'আমি জানি, এখানে এলে কেউ আর বাড়ি ফিরে যায় না, আমার পাশের বেডের মেয়েটাও বাঁচে নি।' বাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

এতদিন পরেও প্রণবের বুকটা আজ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নিজের মনেই একসময় প্রশ্ন করল প্রণব, শুধু কি মণিময়দার কথাতেই এখানে তার আসা? মনের নিভৃতে, মুহূর্তে আরো একটি মুখ ভেসে উঠেছে, সে মুখ কল্যাণীর। কলকাতায় মণিময়দার বাড়িতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওদের সঙ্গে সে যাদুঘর, চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম দেখেছে, সিনেমা থিয়েটার সার্কাসে গেছে। কল্যাণীরও কলকাতার ওপর ইদানীং যেন একটা টান পড়ে গেছে। দু-তিনবার কলেজের ছুটিতে সে কলকাতায় এসেছে। ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে ওর কী আফসোস!

ওকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার সময় মণিময়দার সঙ্গে প্রণবও স্টেশনে এসেছে। কল্যাণী ছল ছল চোখে তখন বলেছে, 'আমাদের এখানে আসবেন।' পরে মণিময়ের দিকে চেয়ে সামান্য হেসে ও বলেছে, 'এরপর একবার প্রণবদাকেও নিয়ে এসো দাদাভাই।'

প্রণবও কি তাহলে অবচেতনে ওর জন্যে কোন দুর্বলতা বোধ করেছে? হয়তো তাই। ঢাকের আওয়াজটা এই মুহূর্তে যেন আরো বেড়ে গেল। পকেটে গোলাপের গন্ধ। ম্লান একটু হাসি ফুটল ওর মুখে। কল্যাণী যেন ধীরে ধীরে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। এখানে এসে কি তবে সে ভুল করেছে? ঠিক বুঝতে পারছে না প্রণব। কেমন এক অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করছিল শুধু। ওদের সঙ্গে যে তার তফাতটা অনেক, এটা যেন এখানে এসে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারল প্রণব। আর দাঁড়াল না। আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। এরই মধ্যে মাটি ভেজা ভেজা লাগছে। কোথায় সে যাবে এখন; বাড়ি? না। হঠাৎ মৃণালের কথা মনে পড়ল তার। মৃণাল ওর বন্ধু ছিল একদিন। স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছে। কলেজেও একই সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল ওরা। এবার যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে প্রণব।

পাঁচ

কল্যাণী সিঁড়ির ডানপাশে ছাই ছাই রঙের গাড়িটা দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে। খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে এ-পথটুকু সে বেরিয়ে এলো, 'ছোড়দা বউদিরা এসেছে, কি মজা!' দ্রুত সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে বাধা পেল কল্যাণী!

'উহুঁ, যেতে নাহি দেব।'

কল্যাণী থমকে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে পরক্ষণেই খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ওমা, মিহিরদা!'

'কি, খুব অবাক করে দিলাম তো!' মিহিরের মুখে হাসি।

'আমি ভাবলাম ছোড়দারা এসেছে।' কল্যাণী কি ভেবে চোখ ফিরিয়ে গাড়িটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি কিনলেন কবে?'

'এই মরেছে, আমি কোন্ দুঃখে গাড়ি কিনতে যাব!' মিহির সিগারেটটা হাতে নিয়ে কি ভেবে কল্যাণীর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, বলল, 'এখনও বুঝতে পারলে না? নাঃ; ম্যাডামের মেমারি দেখছি বড় সর্ট, ব্যাপারটা কি?'

কল্যাণী মুখ গম্ভীর করল একটু, বলল, 'বেশ, সর্ট তো সর্ট।' বলেই ও চলে যাচ্ছিল। মিহির আবার পথ আটকে দাঁড়াল। তারপর অভিনয় করার মতন হাত পা নেড়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে, আর হবে না, এই কান মললাম, নাক— ।'

'হয়েছে —!' কল্যাণীও চোখ-মুখের এক মধুর ভঙ্গি করে হেসে ফেলেছে। পেছনে রুবি। ও-ও হাসছিল খিল খিল করে। রুবি এসে প্রণাম করল।

'এমা, এত বড় হয়ে গেছিস!' বলেই মিহির ওকে আদর করল সামান্য। পরে কল্যাণীর-মুখের দিকে চেয়ে এবার আর কোন ভণিতা না করেই বলল, 'পাটনায় তোমার দাদার ওখানে এসে একদিন ছিলাম আমরা, ওর মোটরে করেই একসঙ্গে এলাম।'

'সেজদি ভাল আছে?'

'ভাল রাখতেই হবে, তা না হলে আমার চলবে কি করে?' মিহির হাসছিল।

'যান, আপনার সবটাতেই খালি ইয়ার্কি!'

'ইয়ার্কি?' মিহির যেন আকাশ থেকে পড়েছে। কপট গাম্ভীর্য নিয়ে পরে শুধলো, 'আমার কথা এখন থাক, তোমার কি খবর বল?'

'আমার আবার কি খবর?'

'উহুঁ, ম্যাডামকে এবার যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগছে!'

'লাগছে তো লাগছে, হিংসে হচ্ছে?'

'একটু তো হবেই।'

'ইস্, একবারও তো খোঁজ নেন না। যাকগে, শুভকে এবার এনেছেন তো?'

'হ্যাঁ গো ম্যাডাম, এবার আর সস্ত্রীক নয়, সপরিবার।'

'কি আমার পরিবার, তার আবার বড়াই!' কল্যাণী চোখে-মুখে একধরনের হালকা ইশারা ফুটিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

'ঠিক আছে, আশীর্বাদ করছি শতপুত্রের জননী হও।'

'যাঃ, মিহিরদাটা না কি অসভ্য! আয় তো রুবি আমরা চলে যাই, খালি অসভ্য কথা।' কল্যাণী যাওয়ার সময় একটা চিমটি কেটে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

শোভনা একটু দূর থেকেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে মশাই, মনে পড়ল এতদিনে?' হাঁপাচ্ছিল শোভনা। এসেই একটা

চেয়ারে বসে পড়েছে। রীতিমতন কষ্ট হচ্ছিল তার, চুলের গোড়ায় একটু একটু ঘাম হয়েছে।

মিহির হাসল, হেসে বলল, এখন আর কথা বলবেন না, আগে জিরিয়ে নিন, এত ফুলে গেছেন যে আর বলার নয়।'

মণিময়ও হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো, 'কখন এলে?'

'এই ঘণ্টা দেড়েক!'

'জয়ন্তীরা সব ভাল তো?'

'খুচখাচ অসুখ-বিসুখ তো লেগেই আছে।'

'কিছুই করার নেই ভাই, সংসার করতে এসে ভুগবে না, এ হয়?' মণিময় হাসে। পরে শোভনার দিকে চেয়ে বলল, 'কি গো, তুমি যে এসেই ধপাস করে বসে পড়লে।'

শোভনার হাঁপটা অনেকটা কমেছে এখন, বলল, 'বাবা, মরেই যাচ্ছিলাম।'

'এইটুকু হেঁটেই?'

'তোমার কাছে তো এইটুকই!' শোভনা মণিময়ের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে মিহিরের ওপর রাখল, জিজ্ঞেস করল, ঠাকুর-ঝির পেটে যেন কি অপারেশন হয়েছিল?'

'অ্যাপেনডিসাইটিস, আর বলবেন না, ক'দিন যা ঝামেলা গেল না!'

মণিময় একটা চেয়ার টেনে নিল।

শোভনা বলল, 'কি, এখন তুমি বসছ কেন, দাঁড়িয়ে থাক।'

'আমারও পায়ের পাতাটা একটু একটু কেমন ব্যথা করছে।'

'এই বেলা কিছু না, যত দোষ, নন্দ ঘোষ!' শোভনা হাসি হাসি চোখে একবার তাকাল।

'এই, এই, গ্রামার ভুল কর না। তুমি আবার কোন্ দুঃখে নন্দ ঘোষ!' মণিময় এবার হাসি হাসি মুখ করে মিহিরের দিকে চাইল, বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমিও বস।'

'দাঁড়িয়েই তো ভাল লাগছে, বসে বসে কোমর ধরে গেছে।' মিহির হাসল। সিগারেটটা দাঁতের ফাঁকে ধরে রেখে একটা কাঠি জ্বালল। বলল, 'সবে সিগারেটটা ধরিয়েছি, এমন সময় শ্বশুরমশাই এসে হাজির; শ্বশুরমশাই গেল তো আবার শাশুড়ী, অথচ গলা শুকিয়ে তখন আঠা আঠা।'

'আরে, সিগারেট খাবে তো অত লজ্জা কিসের, কাকার সামনে না পড়লেই হলো, হাজার হোক ওল্ড-ম্যান, কিছু ভাবতে পারে!' মণিময় ওর দিকে চেয়ে শব্দ করে হাসল।

শোভনা মিহিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাগজে একদিন আপনার ছবি দেখলাম!'

'বেশ তো চলছিল বউদি, আবার ওসব কেন?'

'কি আমার বিনয়!'

মণিময় সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'এটা বুঝলে না ভাই, তোমার কৃতিত্বে যে আমরাও গর্ববোধ করি।'

'শেষে আপনিও দাদাভাই!'

'আরে, এর জন্যে এত সঙ্কোচের কি আছে, এটা তো ঘটনা।'

'ওসব রাখুন তো এখন।' মিহির সিগারেটে টান দিয়ে একটু পরে বলল, 'বউদিদের নিয়ে আমাদের এখানে একবার চলে আসুন দাদাভাই।'

'তোমার বউদিকে নিয়ে?' মণিময়ের চোখে হাসি।

'হ্যাঁ, বউদিকে নিয়ে। কেন, কি হয়েছে?'

'দেখছ না, এটুকু হেঁটেই কী অবস্থা; তার ওপর তিন দিনের ট্রেন জার্নি, তবেই হয়েছে।'

'শুধু আমার ওপর দিয়ে কেন, নিজে যে কত বীর পুরুষ, সেটা বল একবার।'

'ঠিক আছে, গোঁসার দরকার নেই, তোমাকেও নিয়ে যাব। পরে মিহিরের চোখে চোখে চেয়ে মণিময় মজার গলায় বলল,

'জান ভাই, আমি আবার তোমার বউদিকে ছাড়া ছুনিয়া অন্ধকার দেখি।'

'হয়েছে, হয়েছে, এবার মতলবটা কি বলে ফেল।' শোভনা মণিময়ের কথা বলার ঢঙ দেখে হাসি চাপাতে পারে না।

'বলছিলাম কি, আমরা তো এখানেই বসছি, তুমি চা-টা পাঠিয়ে দাও গে।'

'এবার বুঝলেন তো!' শোভনা মিহিরের দিকে চেয়ে উঠে পড়ে।

'আমি যেন বাদ না পড়ি!'' মিহির ক-পা এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'এই খানিক আগেই খেয়েছি তো, ম্যানেজ করে পাঠাবেন।'

শোভনা হাসতে হাসতে বলল, 'আরে, আপনি হলেন গিয়ে এ-বাড়ির জামাই, যতবার বলবেন দেব।'

'এই, এই, চেঁচাবেন না, আপনার ঠাকুর-ঝি শুনলে হয়ে গেছে!'

'এত ভয়?' শোভনা চোখ টান টান করে দেখল মিহিরকে।

'ওরে বাপস্, ভয় না করে উপায় আছে, আপনারা হলেন গিয়ে সাক্ষাৎ মহাশক্তির অংশ।'

'ওই যে আর এক ভোলানাথ বসে আছে দেখছেন না!' শোভনা মণিময়কে দেখাল। চোখ সরিয়ে আনতে আনতে আবার বলল, 'আপনাদেরও এক একজনের বিক্রম কিছু কম নয়।' বলে হাসতে হাসতে শোভনা ভেতরে চলে গেল।

মিহির একটা চেয়ার টেনে নিল। সিগারেটে আরো কয়েকটা টান দিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল। তেতো স্বাদ। মণিময়ের চোখের দিকে চেয়ে শুধোয়, 'কি ব্যাপার বলুন তো দাদাভাই!'

'কিসের ব্যাপার?'

'শ্বশুর মশাইয়ের পরপর চিঠি, জরুরী তলব!'

'কিছুই নয়, বয়েস হয়েছে, সবাইকে একসঙ্গে দেখতে চায় আর কি!'

'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন বলুন!' মিহির হাসল।

'ঠিক তাই।'

'এবার তাহলে সবার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে। এটা কিন্তু মন্দ নয়।'

মণিময় হালকা গলায় হাসে। বলে, 'ইচ্ছে থাকলেও সবসময় হয়ে ওঠে না, কত রকমের ঝামেলা, সবারই তো সংসার বেড়েছে।'

'কাছাকাছি থাকলে তবু সম্ভব; এত দূর থেকে আসা যাওয়া কী কষ্ট!'

'কষ্ট মানে, দারুণ কষ্ট, কত অসুবিধে।' মণিময় সিগারেটের প্যাকেটটা মিহিরের দিকে এগিয়ে দিল, 'এই নাও।' মণিময় আরো কটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সবার সঙ্গে দেখা হলে ভালই লাগে, বয়েস তো ভাই বাড়ছে, কটা দিন বেশ হই হই করা যায়, ক্ষতি কি।'

'মোটেই ক্ষতি নয়, বরং লাভই হয়।' মিহির দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে লোফালুফি করে।

'যাই বল, এটা আমার কাছে একটা লোভনীয় ব্যাপার।'

'লোভনীয় বই কি, এতে যেন আরো এনার্জি বেড়ে যায়।' মিহির হাসতে হাসতে মণিময়কে এক পলক দেখল, বলল, 'এই জন্যেই দেখছি ফাদার-ইন-ল-কে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে!'

'হবে না, একা একা থাকে; আর এখন ছেলে মেয়ে জামাই, নাতি-নাতনীর ভিড় পড়ে গেছে।'

মণিময় কথা বলতে বলতে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। না ধরিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে বলল, 'প্রবীরটাও তো এখানে এসে এবার প্র্যাকটিস করতে পারে. শ্বশুরের ওখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয়!' সিগারেটটা এবার দু দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেছে মণিময়। পাঞ্জাবির বোতামগুলো লাগিয়ে নিল। মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। শীত শীত করছিল তার। কথা বলতে বলতে পা নাচাচ্ছিল মণিময়।

মিহির বলল, 'পারেই তো।'

'ওটা একটা হোপলেস, সরে সরে থাকাব মতলব কেবল। মানলাম, তোর শ্বশুরমশায় ওখানকার খুব নামকরা ডাক্তার, উনি তোকে হাতে ধরে শেখাচ্ছেন ; তাই বলে এখানকার কথাটা একবার ভাববি না, কাকার বয়েস হয়েছে, কখন কি হয় বলা যায়!' মণিময় কথা বলতে বলতে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। খানিকটা ধোঁয়া সে গিলে ফেলেছে। বাকিটা মুখ এবং নাক দিয়ে বের করে দিচ্ছিল।

মিহির ধীরে ধীরে বলল, 'ওরও বোধ হয় দোষ নেই দাদাভাই. টাকার নেশায় পড়ে গেছে ; দেখে মনে হলো, ভীষণ জমিয়ে ফেলেছে।'

'এখানেও তো জমাতে পাবত, এমন তো নয় এখানে আমাদের কেউ চেনে না, একেবারে পবিচয়হীন ; বরং এখানে থাকলেই ওর বেশী সুবিধে হত।' মণিময় ধীরে ধীরে সিগারেট টানল। একটু পরে বলল, 'এও এক ধরনেব মানসিকতা, কেউই আর আজকাল একসঙ্গে থাকতে চায় না, আলাদা আলাদা সংসার, টুকবোব দিকেই এখন নজবটা।' মণিময় যেন আরো কিছু ভাবছিল এই মুহূর্তে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিহির বলল, 'দোষও নেই, আসলে বাঙালীর সামাজিক জীবনটাই এখন ভেঙে পড়েছে ; কারণও আছে অবশ্য, ইকনমিক ফ্রাস্ট্রেশন চূড়ান্ত ; তার ওপব সমস্যা আব সমস্যা।'

মণিময় মিহিরের চোখে চোখে তাকাল একবাব, মৃদু হেসে বলল, 'তোমার কথা আমিও অস্বীকার করি না। তবু, বাঙালী বলতে আমার কাছে কতগুলো ধারণা আছে ; তার মধ্যে, আমাদের সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার যে একটা পারিবারিক গোটা জীবন, সেটাও একটা মস্ত বড় ঘটনা।'

মিহির বলল, 'আজকের পরিস্থিতিতে এটা কি আর সম্ভব, সম্ভব নয়।'

'হবে হয় তো।' মণিময় ম্লানভাবে হাসল একটু। পরে আবার বলল, 'আসলে আমাদের ছেলেবেলাটা এমনভাবে কেটেছে যে আজকের সঙ্গে অনেক সময় মেলাতে গিয়ে দেখেছি, ঠিক মিলছে না, আর মিলছে না বলেই হয়তো এ দুঃখ।' একটু নীরব থেকে কি ভেবে মণিময় ফের বলে, 'আমরা এতগুলো ভাইবোন একসঙ্গে বড় হয়েছি এই বাড়িতে, কোন তফাৎ বুঝি নি, এখনও বুঝি না, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরাই দেখবে কদিন পরে আর কাউকে চিনবে না, সম্পর্ক রাখা তো দূরের কথা।'

'খুব সত্যি কথা।' মিহির মণিময়কে দেখল অল্পক্ষণ, শেষে বলল, 'এটা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, এক একটা জেনা-রেশনের সঙ্গে গ্যাপটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে।'

'আমারও সেইরকম ধারণা।'

'তবে বাঙালীর মধ্যেই এটা সবচেয়ে বেশী।'

'দুঃখ হয় মিহির, যখন ভাবি, চোখের সামনে এই জাতটা একটু একটু করে কেমন তলিয়ে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, কাগজপত্রে আজকাল যেসব খবর পাই, তাতে তো ভয়েরই কথা।'

'সর্বত্র করাপ্‌সন, স্বার্থপরতা, নোংরামি।' একটু থেমে আবার বলল মণিময়, 'তোমরা বাইরে আছ, বেশ আছ।'

'কদিন আর ভাল থাকব, বুঝতে পারছি না দাদাভাই।'

'বাইরে বেরোলে বোঝা যায়, অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীদের কি চোখে দেখে! ঘেন্না করে, বুঝলে, স্রেফ ঘেন্না করে, আর করবেই বা না কেন, আমাদের এতকালের শিক্ষা দীক্ষা রুচি ভদ্রতা বিনয় এগুলো দিন দিনই এখন লোপ পাচ্ছে।' মণিময়কে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

'এজন্যে আমাদেরও তো কোন লজ্জা বা দুঃখ নেই।'

'নেই-ই তো।' একটু চুপ করে থেকে মণিময় ওর দিকে একদৃষ্টে

তাকাল, বলল, 'তুমি জান না মিহির, আমরা এখন কী রকম স্বার্থপর, নীচ হয়ে গেছি ; সামান্য কারণে, মুহূর্তে আমাদের বিবেক মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে এতটুকুও বাধে না, কী অমানুষ যে হয়ে গেছি না আমরা !'

'এটা তো আর একদিনে হয় নি! তাছাড়া এর দায়িত্বটা আমাদের সবারই ; সেখানে কোন গলদ ছিল।'

মণিময় কেমন আবেগ বোধ করছিল, বলল, 'কিন্তু এখন আর সময় নেই, ট্র-গেট, সব কিছুই নিজের কোর্সে চলছে, আজ আর কিছু করা হয়তো সম্ভব নয় ; শুধু মনে হচ্ছে, আমরা ক্রমশই এক অশান্ত খ্যাপা আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।'

মিহির দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'পড়ছি কি, অল্‌রেডি পড়ে গেছি।'

'আমাদের চোখের সামনে যেন এখন সব কিছু ভাঙছে আর ভাঙছে।' মণিময়ের গলা আবেগে কাঁপছিল।

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না। একটু পরে মিহির হেসে হেসে বলল ; 'এসব ভারী আলোচনা এখন থাক দাদাভাই, ভীষণ মাথা ধরে গেছে, ওরে বাপ্‌স্।'

'চুলোয় যাক গে, আমরা আর কদিন বল !'

'ওসব সিরিয়াস আলোচনা করে কোন লাভও নেই দাদা ভাই, মাঝখান থেকে মাথা গরম করা।'

সিগারেটের টুকরোটা শেষবারের মতন কটা টান মেরে ফেলে দিল মণিময়, হাসতে হাসতে বলল, 'ইয়েস্, নো মোর সিরিয়াস ডিস্‌কাশন।'

'এই যে, তোমরা এখানে বসে আছ, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজছি কোথাও পাচ্ছি না।' বলতে বলতে প্রবীর এসে দাঁড়াল।

'মাথাটা ভাই আমারও ধরে গেছে!' মণিময় মিহিরের ওপর চোখ রেখে পরমুহূর্তেই প্রবীরের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল, বলল, 'শুধু তোর জন্যেই এমন হলো।'

প্রবীরও হাসছিল, 'বারে, আমি আবার কি করলুম তোমার ?'

'এর মধ্যে আমাদের অনেক কিছু সিরিয়াস আলোচনা হয়ে গেল, বুঝলি ?' মণিময়ও হাসল।

'হোক গে, তোমরা লোকও তো সব সিরিয়াস টাইপের।' প্রবীর তখনো হাসছে। মণিময়ের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, 'আগে একটা সিগারেট ছাড় তো দাদাভাই।'

মণিময় ওর হাতে সিগারেট দিতে দিতে শুধোয়, 'এতক্ষণ ভেতরে কি করছিলি ?

'আর বল কেন, ফাদাবের পাল্লায় পড়েছিলাম ; কথা আর ফুরোতেই চায় না !'

মিহির হাসতে হাসতে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'অ্যাদ্দিন পর এত লোকজন দেখে দিস্ ওল্ড-ফাদার কেমন একটু দিশেহারা হয়ে গেছে।'

'যাও না, সামনে গিয়ে কথাটা বল একবার, বুড়ো বলা দেখিয়ে দেবে !' প্রবীরও হাসতে লাগল।

মণিময় ধীর গলায় শুধোল, 'কি বলছে কাকা ?'

'কী বলে নি বল !'

'বয়েস হলে এ হয়ই।' একটু চুপ করে মণিময় আবার বলে, 'বুঝতে পেরেছি, আসলে কাকার ইচ্ছেটা হলো, তুই এসে এখানে যাতে থাকিস।'

'আমিও বুঝি, কিন্তু এখন আসব কি করে ?'

'কেন ?'

'সবে একটা ফিল্ড তৈরী করেছি ওখানে, এ অবস্থায় আসা যায়, তুমিই বল না, যায় ?' প্রবীর মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কাকা কাকীমার কথাটাও তো তোকে একবার ভাবতে হবে !'

'কতবার লিখেছি আমার ওখানে এসে থাকতে, তা কিছুতেই

আসবে না বাবা! এর কোন মানে হয় না, যাই বল।' প্রবীর যেন সামান্য ক্ষুব্ধ হলো।

'আমরা আমাদের মতন দেখছি, কাকা তার নিজের মতন করে ভাবছে।'

'এ হলে তো হবে না।'

'সুতরাং, অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেণ্ট!'

'এখন তো কিছুতেই ওখান থেকে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সম্ভব না হলে, কাকাকে বোঝাতে হবে ভাল করে।'

'দোহাই, তুমি বুঝিও, আমার দ্বারা হবে না। ওটা ওল্ড এজ্‌-এর রোগ, একবার যা বুঝে রেখেছে, তার থেকে এক চুলও সরানো যাবে না।'

মণিময় হাসল। কিছু না বলে একবার ভেতরের দিকে তাকাল, 'কি ব্যাপার রে, এখনও চা-ফা আসছে না?'

'তোমরা যে এখানে বসে আছ, জানে তো?' প্রবীর মউজ করে সিগারেট টানছিল।

একটু পরেই হাসিমুখ করে জয়ন্তী এসে মণিময়কে প্রণাম করল।

'কিরে, একি চেহারা করেছিস তুই!' মণিময় জয়ন্তীকে দেখতে দেখতে সামান্য অবাক হলো যেন।

'আর চেহারা, কদিন যা ভুগে উঠলাম না!'

'এক কাজ কর তুই, এখানে মাস তিন-চার থেকে, খুব করে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে বেড়িয়ে চেহারাটা আবার আগের মতন করে নে; তারপর যাবি।'

জয়ন্তী মিহিরকে আড়চোখে এক পলক দেখল। পরে চোখ সরিয়ে এনে মণিময়ের কথার জবাব দিল, 'তিন-চারমাস, এক মাসই থাকতে দেবে কিনা জিজ্ঞেস কর না, সামনেই তো রয়েছে।' জয়ন্তী মৃদু মৃদু হাসছিল।

মিহিরও হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যদি থাকতে পার আমার আর আপত্তি কি!'

'হুঁ, আপত্তি নেই আবার, তোমাকে আর আমি চিনি না।'

মিহির আরো জোরে জোরে হাসল, 'এই, এই, কি সর্বনাশ: ফ্যামিলি সিক্রেট যে ফাঁস করে দিচ্ছ।' হাসি থামলে ও আবার বলল, 'থাকতে চাও থাক, কিন্তু ওয়ান কণ্ডিশন, চেহারা ফেরাতে হবে!'

'তাহলেই বুঝতে পারছ দাদাভাই!' জয়ন্তী হাসল কথা বলে।

'তুই হ্যাঁ বল না ছোড়দি; আমি তোর চেহারা ভাল করে দেব।' প্রবীর বলল।

জয়ন্তী বলল, 'আরে না, ও ইয়ার্কি মেরে বলছে।'

'তুই-ই থাকতে চাইছিস না, দোষটা ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছিস শুধু শুধু।' প্রবীর সিগারেটের ছাই ঝেড়ে হাসতে হাসতে বলে, 'ওসব আমরা বুঝিরে, বুঝি!'

'কি, জব্দ তো এবার!' মিহির চোখের ভঙ্গি করে হেসে উঠেছে।

মণিময় বলল, 'হাসি নয় ভাই, ওর শরীরটা বেশ ভেঙে গেছে, কদিন ও এখানে থেকেই যাক।' ওর জন্যে মনে মনে একটু মমতা বোধ করছিল মণিময়।

'বেশ তো, থাকবে এতে আর আমার বলার কী আছে।'

'ঠিক তো, পরে কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলবে না!' জয়ন্তী মিহিরের চোখে চোখে চেয়ে কি যেন দেখল, পরে নিজের মনেই হাসল।

মিহিরও হাসছে। বলল, 'এমনভাবে বলছ যে লোকে ভাববে, সবসময়ই তোমায় আমি এজন্যে অনেক কিছু বলেছি বা বলছি!'

জয়ন্তী এ নিয়ে আর কিছু বলল না। মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেকদিন পর তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হলো।'

'তুই তো আসিসই না, দেখাটা হবে কি করে?'

'কতদূরে আমরা থাকি বল তো!'

'এটা কোন একটা কথা হলো না।' মণিময় হেসে ফেলেছে।

মিহির বলল, 'চা-টা বোধ হয় আমাদের আর দেবে না দাদাভাই।' পরে ও জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল। মোলায়েম গলায় বলল, 'ভেতরে গিয়ে একবার দেখ তো, কি হলো?'

জয়ন্তী চোখ বড় বড় করে বলল, 'তোমাদের মানে, তুমি আর প্রবীর এইমাত্র না খেলে!'

'আরে, আমার কথা বলিনি; আমি তো এই কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছি, কি বল প্রবীর?' মিহির চোখ-মুখের এক উদাস ভঙ্গি করে হাসল।

'তাই তো, আমরা আর এখন চা খাব কি, জান তো মিহিরদা, বেশী চা খেলে লিভারটি খারাপ হয়ে যায়।' প্রবীর মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'বুঝেছি, আবার চালাকি দেখ না!' জয়ন্তীও হেসে ফেলল।

'এই যে তোমাদের চা।' কল্যাণী দুটো প্লেটে মিষ্টি, চানাচুর আর চা নিয়ে এলো।

মিহির কল্যাণীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যে দেখছি দশভূজা সেজে এলে।'

'আপনি তো তখন থেকে আমার অনেক কিছুই দেখছেন!' কল্যাণীর মুখেও চাপা হাসি।

'আমাকে আবার চা কেন?' মিহির তেরছা চোখে পলকে জয়ন্তীকে দেখে নিল।

'আরে খাও, জয়ন্তী কিছু বলবে না।' মণিময় চানাচুর মুখে দিয়ে প্রবীরের দিকে চেয়ে বলল, 'ওহে ডাক্তারবাবু, মিষ্টিটা খেয়ে ফেল।'

'আবার আমাকে কেন, খেয়েছি তো একবার।' বলতে বলতে প্রবীর প্লেট থেকে দুটো মিষ্টি তুলে নিল।

'ওহে শালামশাই, আমার থেকেও নিও।'

'আপনার লোক তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, আবার আমাকে

কেন?' বলেই প্রবীর কল্যাণীর দিকে তাকাল, 'এই, আমাকেও একটু চা দিস।'

'এখন আর হবে না, মা বকাবকি করছে; বার বার অত চা খেলে শেষে নাকি কিছু খেতে পারবে না!'

'এই নাও, আমার থেকে নাও।' মিহির প্লেটে খানিকটা চা ঢেলে নিল। কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

কাপটা হাতে নিয়ে প্রবীর উৎসাহভরে তাকাল, 'কি রান্না হচ্ছে রে কল্যাণী?'

জয়ন্তী ওর হয়ে জবাব দিল, 'খাওয়ার সময়ই দেখবি'

মণিময় হাসি হাসি মুখে বলল, 'প্রবীরটা এখনও আগের মতনই পেটুক গোঁসাই রয়ে গেল, তাই না রে জয়ন্তী?'

জয়ন্তী হাসল, কিছু বলল না।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রবীর বলল, 'না দাদাভাই, আমার খাওয়া আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।'

কল্যাণী হাসি হাসি মুখে বলল, 'ভাল জিনিসই হচ্ছে!'

মিহির বলল, 'ও ব্যাপারে আমারও একটা বদনাম আছে, বুঝলে প্রবীর!'

মণিময় বলল, 'তাহলে তুই বলেই ফেল কল্যাণী।'

'মুরগী হচ্ছে।'

'বাঃ, এসেই মুরগী!' প্রবীরকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল।

মণিময় হাসতে হাসতে বলল, 'পুজোর শুরুতেই মুরগী, যাঃ, এটা কিন্তু ঠিক হলো না।'

'তুমি চুপ করে যাও তো দাদাভাই।'

মণিময় হালকাভাবে বলে, 'নাঃ, এটা আর হিন্দু বাড়ি থাকল না দেখছি।'

'বাবা প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল, মা বলল, মিহিরদা নাকি খুব পছন্দ করে। সুতরাং হতেই হবে।' কল্যাণী মজা করে বলল।

'বাঃ, আমার ওপর দিয়ে বেশ তো চালিয়ে দিলে।'

'বিশ্বাস না হয় সেজদিকে একবার জিজ্ঞেস করুন না।' কল্যাণী চোখ আনত রেখে মুখ টিপে টিপে হাসল।

মণিময় বলল, 'তুমিই আমাদের জাতটা মেরে দিলে ভাই!'

'খেয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলেই হবে।' মিহির জোরে জোরে হাসে।

প্রবীরও হাসতে হাসতে বলল, 'বাড়িতে জামাই-টামাই এলেই দেখছি লাভ।' হাসি থামলে ও আবার বলল, 'এবার একটা পিকনিক-টিকনিক লাগালে হয় দাদাভাই।'

'সবাই আসুক আগে, নিশ্চয়ই হবে।' মণিময়ও উৎসাহ বোধ কবল।

বাতাসে এখন ফুলের গন্ধ। দূবে ঢাকের আওয়াজ, লোকজনের কথাবার্তা। শিউলি এবং গোলাপ ফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। বাগানের অনেকটা জায়গা অন্ধকারে মোড়া বয়েছে। অল্প অল্প হিম পড়ছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মিহির বলল, 'বেশ লাগছে।' ওকে কেমন মুগ্ধ ও সামান্য অন্যমনস্ক দেখাল।

'আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে।' চুলেব গিঁট খুলতে খুলতে জয়ন্তী বলল।

'এবার তো পার্টি বিরাট।' প্রবীর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা আটকে রেখে অদ্ভুত কায়দায় টানছিল।

'হিমানীশটাই মাটি করে দিল, লিখেছে ও নাকি আসতে পারবে না।'

কেউ কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। একটু পরে প্রবীর ছোট করে একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কালকেই দেখবে, বাড়ি আরো ভরে গেছে, জমজমাট।'

ভেতরে ছেলেমেয়েদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। মণিময় ঘাড় ফিরিয়ে জয়ন্তীকে দেখল একবার. বলল, 'শুভর গলা পাচ্ছি না তো?'

'দেখ গিয়ে চুপচাপ হয়তো বসে আছে বা কিছু পড়ছে-টড়ছে।'

'ভীষণ শান্ত ও, না?'

'অত শান্ত আবার ভাল লাগে না আমার!'

মণিময় বলল, 'আমার ছোটটি তো একটা বুলেট!'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে জয়ন্তী বলল, 'এখানে বসে বসে আর ঠাণ্ডা খেতে হবে না, ভেতরে চলে এসো।' জয়ন্তী আর দাঁড়ায় না কল্যাণীকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

'সেই ভাল, ভেতরেই গিয়ে বসি চল।' মণিময় উঠে পড়েছে। প্রবীরকে দেখল একবার। কি ভেবে হেসে উঠল, বলল, 'দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে রে মাংসের।' একসঙ্গেই হেসে উঠল সকলে।

'কাপ-প্লেটগুলো পড়ে থাকল যে!' মিহির বলল।

'ও লছমন এসে নেবেখন।'

মণিময় কি ভেবে আবার বসে পড়ল। ঘড়িটা দেখে নিজের মনেই বলল, 'প্রণবটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এত দেরি করার কোন মানে হয়!'

ওরাও বসেছে আবার। অবাক চোখে তাকাল। কেউ কিছু বলল না।

'আরে, আমাদের প্রণব; দেখলে, তুইও ওকে চিনবি।' মণিময় প্রবীরের মুখের ওপর চোখ রাখল একটু সময়, পরে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'ও-ও আমার সঙ্গে এসেছে।'

'ঠিক চিনতে পারছি না তো?' প্রবীর ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করল।

'সুধীর জেঠামশাইয়ের ছেলে রে!'

'তাই নাকি, কোথায় গেছে ও?'

'একসঙ্গেই আসছিলাম, বলল তো পুজো প্যাণ্ডেলে যাচ্ছে' মণিময় কি মনে করে ওকে আবার শুধোল, 'তোরা একসঙ্গে পড়তিস না?'

'না, ও আমার দু বছরের জুনিঅর, তবে একই স্কুলে পড়েছি।' প্রবীর একটু সময় নীরব থেকে আবার বলে, 'পড়াশুনায় ও খুব ভাল ছিল। ও আর আমি একসঙ্গে ইণ্টার-স্কুল ডিবেট-কম্পিটিশনে আমাদের স্কুলের গৌরব বাড়িয়েছি।' প্রবীর মুখ তুলে মণিময়কে একবার দেখল, বলল, 'অনেকদিন দেখা হয় নি ওর সঙ্গে, ও কি করছে এখন ?'

'কলেজে মাস্টারি করছে।' মণিময় হেসে ফেলেছে। মিহিরের দিকে চাইতে চাইতে বলল, 'তোমারই জাতভাই।'

'ভালই হলো, দলে একটু ভারী হলাম।'

'এই বকবকানির চাকরি তোমাদের ভাল লাগে ?' মণিময় চোখে চোখে তাকাল।

'এটা চয়েসের ব্যাপার দাদাভাই।'

'কী সুখ যে পাও, বুঝি না।'

মিহির হাসল, 'সুখটা তো রিলেটিভ।'

'মাস্টারি শুনলেই কেন যেন ভাই আমার অঙ্ক-স্যারের মুখটা শুধু ভেসে ওঠে। মুখ ভরতি দাড়ি, গায়ে ময়লা একটা হাফহাতা শার্ট, দিন-রাত বিড় বিড় করছে।' মণিময় হাসি চাপতে পারল না। ওর সঙ্গে প্রবীরও হেসে উঠল।

'আমার অভিজ্ঞতাটা আবার আপনার সঙ্গে মিলবে না!'

'এই যাঃ, রাগ করলে নাকি ?'

'মোটেই নয়।' মিহির জোরে জোরে হাসল, 'এ বয়েসে কি আর ওটা মানায় দাদাভাই ?' একটু থেমে ফের বলল, 'প্রশ্নটা যেখানে অ্যাটিচিউডের, সেখানে অমিল তো একটু হবেই।'

এমন সময় গেটে শব্দ হলো। সবাই চোখ ফিরিয়ে দেখল প্রণব ভেতরে ঢুকছে। ও কাছে এলে মণিময় হাসতে হাসতে বলল, 'এই যে প্রণববাবু, এতক্ষণে তোমার সময় হলো ফেরার ?'

'মৃণালদের ওখানে গিয়েছিলাম।' প্রণবের মুখে হাসি হাসি ভাব।

'সে কি আর ভাই বুঝি নি, বুঝেছি।' মণিময় মুখ টিপে টিপে হাসছে।

প্রবীর তাকাল ওর দিকে, বলল, 'কি, ভাল আছ?'

'আমি তো ভালই আছি, কিন্তু এ তুমি কি চেহাবা করেছ প্রবীরদা, এত মোটা হলে কি কবে?' প্রণবেব মুখে হাসি।

'তুমি আবাব বেশী বেশী বলছ।'

'আর ফুললে বিপদে পডবে।' প্রণব হাসছিল সমানে।

মণিময় পবে মিহিবেব সঙ্গে ওর পবিচয় কবিয়ে দিল। একটু পবে ওরা হাসতে হাসতে ভেতবে চলে এলো।

ছয়

মণিময়রা এইমাত্র বাজার থেকে ফিরল। মণিময়ের সঙ্গে প্রণব আর মিহিরও ছিল। প্রবীর যায়নি, কেননা তখনো ওর ঘুম ভাঙে নি। অথচ ওরা যখন বেরোয়, তখন বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে। ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সপ্তমীর পরিষ্কার ঝক-ঝকে সকাল। শিউলি আর গোলাপের গন্ধে বাগান ভরে রয়েছে। খুব ভাল লাগছিল। পুজো-টুজোর দিনগুলোই যেন কেমন আলাদা। সর্বত্রই একটা পবিত্রতার ছোঁয়া আছে। যাওয়ার সময় কাকীমা আলাদা করে তাকে পুজোর জন্যে প্যাঁড়া আনতে বলেছিল। ভুলেই গিয়েছিল সে। প্রণব আবার ফিরে গিয়ে নিয়ে এলো, প্যাকেটটা মিহিরের হাতে ছিল।

মণিময় একটু দেরি করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ভেবেছিল, আজ সকালে অনেকেরই আসার কথা, ওরা এলেই বেরোবে। রোদ পুরোপুরি উঠে যাওয়ার পরও যখন কেউ এলো না, তখন আর দেরি করা উচিত নয় এই ভেবে প্রণব আর মিহিরকে নিয়ে বাজারের থলে হাতে সে বেরিয়ে পড়েছে। কাকীমা লছমনকে সঙ্গে পাঠাতে চেয়েছে। ওরা রাজী হয় নি।

বারান্দায় এসে সবে প্রবীর দাঁড়িয়েছে, মণিময় ওকে দেখতে দেখতে সহাস্যে বলল, 'এই যে ডাক্তারবাবু, ঘুম ভাঙল এতক্ষণে?'

'আমাকে একবার ডাকলেই পারতে।' প্রবীর হাসিমুখে এগিয়ে এলো, 'দাও, আমার হাতে দাও।' বলে মণিময়ের হাত থেকে থলেটা নিজের হাতে নিল, তারপর প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'মাছটা দেখার মতন!'

'খাওয়ার মতন নয় বুঝি?'

'দেখতে ভাল হলেই খেতে ভাল হয়।' প্রবীর হেসে ফের শুধোয়, 'এখানে কতটা আছে?'

'তুমিই বল না কতটা?' প্রণবও হাসছে মৃদুমৃদু।

'ছ-সাত কেজি তো হবেই।'

'ছ-কেজির একটু বেশীই আছে।'

ওদের কথা শুনে স্নেহলতা বারান্দায় এলেন। কি একটা বলতে গিয়ে মাছটার ওপর চোখ পড়ায় হেসে বললেন, 'চমৎকার মাছটা তো রে!'

'দামও চমৎকার কাকীমা।'

'হবেই তো, এখন দিন দিন লোকজনের ভিড়ও বাড়ছে।' একটু থেমে বললেন, 'তা কত নিল?'

'বিয়াল্লিশ।'

স্নেহলতা জিভে কামড় দিলেন, 'বিয়াল্লিশ!' পরে বললেন, 'ঠকে গেছিস। তা এতবড় একটা মাছের কি দরকার ছিল?'

'কি যে বল না কাকীমা, আমরা এতগুলো লোক, এটুকু আর লাগবে না?'

'টাকার কথা শুনলেই যে বুকটা চড়চড় করে ওঠে। যাক গে, এনেছিস ভালই করেছিস।' স্নেহলতা সামান্য সময় নীরব থেকে আগের কথাটা মনে করে শুধোলেন, 'আমার প্যাঁড়া এনেছিস তো?'

'এই যে আপনার প্যাঁড়া।' মিহির প্যাঁড়ার ঠোঙাটা স্নেহলতার হাতে দিল।

স্নেহলতা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'এত দেরি করলে কেন তোমরা? সকালের জলখাবার আর কখন খাবে?'

'বাজারে যা ভিড় না কাকীমা!' মণিময় লছমনকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে লছমনবাবু, এগুলো এবার ভেতরে নাও।'

'আমি যাচ্ছি, তোরা হাত-মুখ ধুয়ে নে।' স্নেহলতা চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

'শোন কাকীমা।' স্নেহলতা এগিয়ে এলে মণিময় আবার বলল, 'বাসনারা এসেছে, না?'

'সবাই এসেছে, শুধু হিমনীশরাই এলো না।' স্নেহলতা মুহূর্তের জন্যে যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

'না এসে ও-ই বোকামো করল।'

'সবই আমার কপাল, বুঝলি না!' স্নেহলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরে ম্লান হেসে বললেন, 'অঞ্জলি কৃষ্ণাও এসেছে। ভেতরে আয় না তোরা।' স্নেহলতা ব্যস্ততা নিয়ে চলে গেলেন।

মিহির মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমরা এখানেই বসছি, আপনি যা'ন, গিয়ে দেখে আসুন একবার।'

'আরে, তোমরাও এসো, হাত-মুখটা ধুয়ে নাও এসে।'

'আপনি যান না, একটা সিগারেট টেনে আসছি।'

মণিময় ভেতরে গেল। প্রণব একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে মিহিরের পাশে বসল। সে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু শিউলি ফুল মাটিতে ছড়িয়ে আছে। লেবু ফুলে মৌমাছিরা গুনগুন করে উড়ছে। সকালের হিমেভেজা ভাবটা এখন শুকিয়ে গেছে। রোদে ভেসে যাচ্ছে সব। গাছের ছায়াগুলোও রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। শুকনো বাতাসে এখন রোদের একটু ঝাঁজ ছিল। গা থেকে চাদরটা খুলে রাখল প্রণব। মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়ায় সামান্য ধুলো উড়ছে। দূরের পাহাড় গাছগাছালি সবুজক্ষেত টিলাও চোখে পড়ছে। জামরুল গাছের ঘন পাতার আড়ালে থেকে একজোড়া দোয়েল শিস দিচ্ছিল। কয়েকটা ফড়িং ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে বাগানে ঘোরাঘুরি করছিল। একজোড়া শালিক পাখিও মাটিতে নেমে এসেছে।

'একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসুন।' মিহির তাকাল প্রণবের দিকে।

প্রণব হাসল একটু, 'ইচ্ছে তো হয় অনেক জায়গায় বেড়াই,

কিন্তু পকেটের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয় না কোথাও।' সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে মিহিরের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'সাধ আছে, সাধ্য নেই।' প্রণব এবার জোরে হাসল।

মিহিরও হেসে ফেলল, 'এর মধ্যেই তো কিছু কিছু সাধ মেটাতে হয় আমাদের।'

'সেজন্যেই তো সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়।'

মিহির সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছে। আরো কটা টান দিয়ে প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'সুযোগ করে নেওয়াটা আবার অনেকটা নিজের ওপর নির্ভর করে!'

'আসলে বাইরে যেতে ভালও লাগে না।'

'আমাদের এখানে একবার আসুন, ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে, যাব একবার।'

মিহির প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা ভাবল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাদের পে-স্কেল তো ফের রিভাইজড হয়েছে!'

প্রণব এবার সামান্য গম্ভীর হলো, বলল, 'অনেক চেঁচামেচি, কাঠ-খড় পুড়িয়ে যাও কিছুটা হলো, টাকা পেতে পেতে কালঘাম ছুটে যায়।' প্রণব ওর চোখের দিকে তাকাল। হেসে বলল, 'এটা বুঝে ফেলেছি, আমাদের কোন দাম নেই আজকের সমাজে।'

মিহিরের পছন্দ হলো কথাটা। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু পরে বলল, 'বুঝলেন, এই প্রফেসনে একদিন ভালবেসেই এসেছিলাম, এখন দেখছি এসে ভুল করেছি।'

'কোন রেসপেক্ট নেই।' প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'অবশ্য আমরাও বোধ করি এর জন্যে অনেকখানি দায়ী।'

মিহির খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আসলে, সব কিছুর

মূলে একটা জিনিসই কাজ করছে, তা হলো শিক্ষা-ব্যাপারে এক ঢিলেঢালা ব্যর্থ নীতি।'

'সবটাই কি তাই?'

'ভেবে দেখলে তাই। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি এই অধঃপতন!' মিহির চুপ করে থাকল অল্পক্ষণ। প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার বলে, 'কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচা করে দু-একটা কমিশন বসিয়েই আমাদের ওপরঅলাদের সব দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়। আর ওরা এটা ভাল করেই জানে, কিছু ভাল ভাল গালভরা সব কথা বললেই হাততালি পাওয়া যায়। কাজের চেয়ে কথাটাই এখন আমাদের কাছে বড়।' মিহির থামল।

প্রণব বলল, 'আমারও মনে হয়েছে, কুড়ি বছর আগে যদি এর খোল নলচে পাল্টে ঢেলে সাজানো হত, তবে আর আজকে এই চেহারা হয় না।'

'আমরা তো বুঝি, এডুকেশন ইনস্টিটিউসনগুলোও আজকাল কী পরিমাণ করাপ্‌সনে ভরে গেছে; ক্ষতিটা সামগ্রিকভাবে একটা দেশের, জাতির, একার কারো নয়।' মিহির আস্তে আস্তে একটা নিশ্বাস ফেলে।

'এখন আর কিছু শিখতে বা জানতে-টানতে চায় না, যেভাবেই হোক একটা সার্টিফিকেট কি ডিপ্লোমা চাই।'

'এ নিয়ে কাউকে একটা কথা বলতে শুনছেন। মাথা ব্যথাটা কি শুধু আমাদেরই! ওদের মুখে খালি জনগণ আর জনগণ; জনগণ যে এদিকে কোন অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে তা দেখেও দেখছে না।' মিহিরকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

প্রণবকেও কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন। একটু নীরব থেকে বলল, 'এডুকেশন মানে তো এখন ওয়েস্টেজ অফ এনার্জি; আমাদের দুর্ভাগ্য, ভাল ভাল মেধাবী ছেলেরা দেশ ছেড়ে চলে গেল; আর যারা এখনও আছে, তাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেসন্‌।'

মিহির একটা ঢোক গিলে বলল, 'এডুকেশনের ছিবড়েটা নিয়েই অ্যাদ্দিন আমরা টানাটানি করেছি, আজো করছি ; জীবনের এবং জীবিকার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই ; ফলে মস্তবড় এক অপচয়।'

প্রণব বলল, 'সিস্টেমটাই এমন যে. এখানে থাকলে কোন না কোনভাবে সবাইকেই একদিন করাপ্‌সানে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

'অথচ এর মূল কারণটা যে কি আমরা জানবার চেষ্টা করি না, সুরাহা তো দূরের কথা।'

'কয়েক বছরের মধ্যেই দেখছি পড়াশুনোর আবহাওয়াটা আরো দূষিত, ঘোলা হয়ে গেছে।'

মিহির প্রণবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আসলে গলদ দিয়েই হয়তো আমাদের শুরু হয়েছিল, এখন সেগুলো প্রকটভাবে বেরিয়ে পড়েছে।'

'ক-বছর আগেও কি আমরা ভাবতে পেরেছি, টাকা দিয়ে প্রশ্ন আউট করা যায়, নম্বর বাড়ান যায়, শিক্ষকরা ঘুষ নেয় ; আর টোকাটুকি তো আছেই। টাকা ঢাললে কী না হয় এখন, মার্কসীট, সার্টিফিকেট সবই পাওয়া যায়।'

'এই জিনিসটাই এখন দেখতে দেখতে দেশের সব জায়গায় সংক্রামক রোগের মতন ছড়িয়ে পড়েছে।' মিহির এবার কি ভেবে হাসল সামান্য, ফের বলল, 'এযাবৎ আমাদের দেশের ছেলেরা শুধু ফাঁপা আদর্শের কথাই শুনে এসেছে। আজ তারা চোখের সামনে দেখছে, পায়ের নীচে মাটি নেই, জীবনের কোথাও তারা সেই শুকনো বুলিগুলোকে মেলাতে পারছে না।' গলায় যেন একটু শ্লেষ ফুটে উঠল।

প্রণবও হাসল একটু, বলল, 'এমনও তো হতে পারে, আমরাও ওদের সামনে বিশ্বাসের কোন ছবি আঁকতে পারি নি।'

'পারি নি তো বটেই।' একটু ভেবে নিয়ে মিহির আবার বলল,

'এই কাঠামোয় সেই ছবি আঁকা হয়তো সম্ভবও ছিল না। আমিই তো এখন মাঝে মাঝে ভাবি, এত পড়াশুনো করে কী হলো আমার! যেখানে আমার ভেতরেই এই অসন্তোষ, সেখানে ছেলেদের কতখানি জাস্টিস্ করতে পারি!' মিহির যেন সামান্য ক্ষুব্ধ হলো। কি ভাবল একটু সময়। অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার চেয়েও যোগ্যতা কম নিয়ে চোখের সামনে যখন কাউকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি, তখন আমার মধ্যেও সংশয় জাগে। এটা আমার কোন জেলাসি নয়, প্রশ্ন হলো, আমিই বা বঞ্চিত হব কেন? এই প্রফেসনে আসাটাই কি আমার বড় অপরাধ?'

'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। তবে আমাদের এই প্রফেসনে অনেক ভেজাল জিনিসও চলে এসেছে।'

মিহির জোরে হেসে উঠল, 'বলুন, শনি-মঙ্গলের যোগ! একে এই সরকারী নীতি, তার ওপর আমাদের অযোগ্যতা। একে বাঁচানো কারো পক্ষেই আর সম্ভব নয়।'

প্রণব তাকাল মিহিরের চোখে চোখে, বলল, 'আমরা নিজেরাই অনেক খারাপ হয়ে গেছি, ক্যারেক্টার, মর‍্যালিটি বলতে আর থাকছে না কিছু।'

'অথচ এগুলোই হলো আমাদের মেরুদণ্ড।' মিহির দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এর ওপর আবার বেকার সমস্যা, জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই, হতাশা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা স্বার্থপরতা সব এসে ষোল-কলায় পূর্ণ করেছে। কোথায় যে এর শেষ কে জানে!' প্রণবের সিগারেটটা অনেকক্ষণ হলো নিবে গেছে। ফেলে দিল টুকরোটা।

মিহিরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। এসব আলোচনায় তার যন্ত্রণা বাড়ে। অক্ষম আক্রোশে সে শুধু ছটফট করে। মনের উত্তাপ খানিকটা কমলে হেসে বলল, 'এসব সিরিয়াস আলোচনা না করাই ভাল, মাঝখান থেকে মাথা-ফাতা গরম হয়ে যায়।'

'না করেও তো পারা যায় না। বুঝতে তো পারছি, কী হচ্ছে চোখের সামনে।'

'আমাদের ছেলেদের আর চাকরি-টাকরি জুটবে না।'

'দিন দিনই অবস্থা ঘোরাল হচ্ছে। সবারই ভাবা উচিত।'

'চলছে চলুক, আপনি আমি আর কি করব!'

প্রণব কিছু বলল না আর। সামনের দিকে সে চেয়ে আছে। বাগানে জামগাছের তলায় শঙ্কর বুবাই খেলা করছিল। বুবাইকে দেখিয়ে মিহির বলল, 'কৃষ্ণার ছেলে না?'

প্রণব মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।' বলে সে একদৃষ্টে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। ওর চোখদুটো ডাগর ডাগর, চেহারাটা একটু রোগা, ময়লা। কিন্তু মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মিষ্টি। দেখলেই কেমন যেন একটু অন্যরকম লাগে বুবাইকে। মাথা ভরতি চুল। বাতাসে উড়ছে। কিজন্যে যেন শঙ্কর এইমাত্র জোর এক ধমক লাগিয়েছে ওকে। ভয়ে একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়েছে ও। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। কাঁদ কাঁদ মুখ। ওর জন্যে কেমন মায়া হচ্ছিল প্রণবের। আহারে! ছেলেটার বাপ নেই। এই বয়সেই অনাথ। জগৎ সংসারে ওর মতন দুঃখী যেন কমই আছে। প্রণবের সঙ্গে ওর কোথায় যেন একটু মিল রয়েছে। তবু তার কাছে সান্ত্বনা এই, অনেক বড় বয়সে সে বাবাকে হারিয়েছে। কিন্তু বুবাইটা ওর বাবার কথা একদিন মনেই করতে পারবে না। মণিময়-দার ওখানে কিছুদিন ছিল ওরা। তখন আরো ছোট দেখেছিল ওকে। এখন চেহারাটা আরো খারাপ হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রণব। সংসারে কত তো সুখের উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু কেউ কেউ জন্ম থেকেই এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে যে, সেই উপাদানগুলো তার নাগালের বাইরেই থেকে যায়; নতুবা এইটুকু বয়সেই বুবাই তার বাবাকে হারাবে কেন? প্রণবের জীবনেও যে কত দুঃখ, অভিমান লুকোন আছে, তা ক-জন জানে? এই ত্রিভুবনে

বুবাইয়ের আশ্রয় বলতে তো একমাত্র ওর মা। ছেলেটা এখন একটা ফড়িং ধরার জন্যে ফড়িংটার পেছনে পেছনে অতি সাবধানে পা ফেলছে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না। বাগানময় নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও।

মিহির কি ভেবে চোখ তুলল, বলল, 'এই বয়সেই মেয়েটার সব সাধ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেল।' ও কৃষ্ণার জন্যে গভীর এক মমতা বোধ করছিল। কি ভেবে প্রণবকে আবার বলে, 'দেবতোষের কি হয়েছিল বলুন তো?'

'দেবতোষদাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি, আমার কাকার কাছে অনেকবার এসেছেন। আর কৃষ্ণাদি তো আমার আগেরই চেনা।' প্রণব চুপ করে একটু সময় কি ভাবল যেন। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'যতদূর শুনেছি, উনি খুন হয়েছেন, পলিটিক্যাল মার্ডার।' প্রণব মিহিরের দিকে তাকাল একবার। পরক্ষণেই অন্যদিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে বলল, 'এটাও জানি, দেবতোষদাকে ওই রাজনীতি করার জন্যে এ-বাড়িতে কেউই পছন্দ করত না।' প্রণব হাসল।

'অদ্ভুত তো!' মিহির অবাক হয়ে ফের বলল, 'আমি শুনেছি, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'আমিও প্রথমে তাই জানতাম।'

'এতে লুকোচুরির কি আছে?'

'এটা এদের ব্যাপার।' একটু নীরব থেকে প্রণব বলল, 'আসলে আমার যা মনে হয়, দেবতোষদা এ-বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে মস্ত বড় এক ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর এই রাজনৈতিক জীবনটা এখানকার কেউ মেনে নিতে পারে নি।'

'আমার এই কথাবার্তা শুনলেও তো আমার সম্পর্কে এদের ধারণা অন্যরকম হয়ে যাবে।' মিহির না হেসে পারল না। চুপ করে থেকে আরো কত কি ভাবছিল।

'আপনার কথা শুনে আমি তো প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম।' প্রণবও মৃদু মৃদু হাসে।

'তাহলে এখানে এসব চেপেই যান।' মিহির চুপ করে থাকল। বাতাসে সূর্যের তেজ এখন অনেক বেড়েছে।

মণিময়ের সঙ্গে হলঘরের পাশে বাসনার দেখা হলো। হাসি মুখে ওকে শুধোয়, 'কিরে, এত দেরি হলো যে তোদের ?'

বাসনা প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আর বল কেন, এ যাত্রায় হয়ে গেছল আমাদের !'

মণিময়ের চোখে-মুখে আবছা এক আতঙ্ক ফুটে উঠল, 'কি ব্যাপার ?'

'তিরুল্ডি এসে ছোটখাট একটা অ্যাক্সিডেণ্ট, আর একটু হলেই যেতাম।' একটু দম নিয়ে বাসনা ফের বলতে লাগল, 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি দাদাভাই।'

'কি হয়েছিল সেটাই তো বলছিস না !'

'ইঞ্জিনের প্রায় সব কটা চাকাই লাইন থেকে পড়ে গিয়েছিল একেবারে শেষের বড় চাকার একটা শুধু কোনরকমে লাইনের সঙ্গে আটকে ছিল, নেমে আমরা আবার দেখলাম সব।'

'খুব একটা ফাঁড়া গেছে তো তাহলে !'

'ভাগ্যিস, তিরুল্ডিতে স্টপেজ ছিল ! সবে স্টেশন ছেড়েছে, তখনো স্পীড নেয় নি, তাই রক্ষে।'

'সেজন্যেই বেঁচে গেলি।'

'এদিকে যে তিনঘণ্টা ট্রেন লেট।'

মণিময় অস্বস্তি কাটিয়ে বলল, 'আগেই দেখছি মাইরি ভাল ছিল ; ছোট লাইন, ছোট ট্রেন। এখন যেন অ্যাক্সিডেণ্ট লেগেই রয়েছে।' মণিময় একটু সময় চুপ করে থেকে এবার অন্য প্রসঙ্গে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছিস তোরা ?'

'কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।' বাসনা খোঁপা ঠিক করে নিল।

'সুব্রত গেল কোথায়?'

'দেখলাম তো বাবার সঙ্গে কথা বলছে।'

'তোর ছেলেমেয়েকে দেখছি না যে!'

'এখানেই তো ছিল, হয়তো বাগানে ঘুরছে-টুরছে।'

মৈত্রেয়ী অন্য ঘরে যাচ্ছিল। মণিময়কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো ও। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মুখে মিষ্টি হাসি রেখে নম্রগলায় বলল, 'ভাল আছ বড়মামা?'

'ভাল মানে, খুব ভাল আছি।' মণিময় হেসে উঠল জোরে। বাসনার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোর মেয়ে যে তোকেও মাথায় ছাড়িয়ে গেল রে!'

বাসনা হাসতে লাগল, 'গেলে আর কি করব বল!'

মণিময় তখনো হাসছিল, 'শেষকালে ওর বরই খুঁজে পাওয়া যাবে না; বাঙালী ছেলেদের যা হাইট, দিন দিনই আরো বেঁটে বাটকুল হচ্ছে।'

'তাতে কি হয়েছে, ঢ্যাঙা বউ বেঁটে বর, এ তো আকছার চোখে পড়ে।' বাসনা বলল।

'যাও, বড়মামার খালি ইয়াকি!' মৈত্রেয়ী চলে যাচ্ছিল।

মণিময় বাধা দিল, 'এই যাচ্ছিস কোথায়, আর বলব না।' মণিময় ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসল। হেসে বলল, 'তোর এবার কোন্ ইয়ার হলো?'

'এবার পার্ট ওয়ান দেব।'

'অনার্স আছে না তোর?'

'হুঁ।' মৈত্রেয়ী মাথা নোয়াল, বলল, 'বাংলা অনার্স।'

'ছ্যা ছ্যা, শেষে কিনা বাংলা অনার্স!'

'অত ছি-ছি করার কিছু নেই; পড়তে গেলে বুঝতে যে তত সোজা নয়!'

'যাঃ, আরশোলাও একটা পাখি, বাংলাও একটা সাবজেক্ট!' মণিময় হাসছে তখনো।

'নয়তো নয়ই, আমার ভাল লাগে আমি তাই নিয়েছি।'

'খুঁজে পেতে আর সাবজেক্ট পেলি না তুই?'

'না, পেলাম না।' মৈত্রেয়ী হেসে চলে গেল।

বাসনা হাসতে হাসতে বলল, 'আমি যাই দাদাভাই, চানটা আগে সেরে নিই গে।' বাসনা চলে গেল।

মণিময় আস্তে আস্তে এ-পাশের উঠোনে এসে দাঁড়াল। লছমন মসলা বাটতে বসেছে। শোভনা সবে ডাল নামিয়েছে উনুন থেকে। সঙ্গে মৃন্ময়ী আছে। রান্নাঘরের বারান্দার এক কোণায় জয়ন্তী তখনো চা, জল-খাবার তৈরির ব্যাপারে ব্যস্ত।

মণিময় এক পলক শোভনার দিকে চেয়ে বলল, 'এ একেবারে উৎসব-বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এইটুকুতেই যে তুমি ঘেমে নেয়ে অস্থির!'

'শুধু তো কথার পণ্ডিত, এখানে এসে একবার এই কাজগুলো করে দিয়ে যাও না!' শোভনা পরমুহূর্তেই সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, 'সকালের খাওয়া মানুষ কখন খায় শুনি?'

'আরে, আমরাও কাজের মানুষ! এই তো এলাম বাজার সেরে।'

'কাজের মানে, ভীষণ কাজের! তা, আর একটু আগে এলেই পারতে, কে অত দেরি করতে বলেছিল!'

'খুব বললে, কে অত দেরি করতে বলেছিল!' মণিময় অঙ্গভঙ্গি করে মুখ ভেংচিয়ে কথাগুলো বলল।

'কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একবার দেখ।'

'ও, ওহো, নিজে যেন কত নূরজাহান!' গলায় এক বিচিত্র ধ্বনি তুলে মণিময় হাসতে থাকে।

'তোমার কপালে এই যে জুটেছে ঢের ভাগ্যি।'

'শুনলি তো প্রবীর, তোর বউদি এসে আমার কপাল ফিরিয়েছে; কি আমার ভাগ্যমতী গো!'

'শুধু শুধু তখন থেকে তুমি বউদিকে খ্যাপাচ্ছ দাদাভাই।'

'তুমিও এখান থেকে ওঠ তো ঠাকুরপো, আমি তোমার বউকে চোখে চোখে রাখছি।'

'শেষে আমাকেও বউদি।' প্রবীর কেমন বোকা বোকা চোখ করে তাকাল।

'ঠিক বলেছ দিদি!' মৃন্ময়া মুখ টিপে টিপে হাসল।

'তুমিই বা কোন্ সাধু এলে!' শোভনা এবার প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে।

'ওরে তোরা সব শাঁখ বাজা। হাসি ফুটেছে, আমার বউয়ের মুখে হাসি ফুটেছে!' মণিময় প্রত্যেকটা শব্দে জোর দিয়ে, রগড় করে বলল।

'আবার ইয়ার্কি?' শোভনা কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে চোখ পাকিয়ে যেন ধমক দিল।

'ঠিক আছে, আর কোন ইয়ার্কি নয়।' মণিময় গম্ভীর হলো।

এমন সময় স্নেহলতা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

'এই যে কাকীমা এসে গেছে।' শোভনা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো, বলল, 'মাছটা এবার কুটে ফেলি?'

'হ্যাঁ বউমা, কুটে ফেল।' স্নেহলতা মুখ ফিরিয়ে মণিময়কে দেখলেন একবার, পরক্ষণই ওকে শুধোলেন, 'মণি তো সামনেই রয়েছিস, মাছের কি খাবি বল?'

'বারে, আমাকে কেন, আগে তোমার জামাইদের জিজ্ঞেস কর।' মণিময় হাসল।

'জামাই আর ছেলেয় কোন তফাৎ নেই, একজনকে জিজ্ঞেস করলেই হলো।' স্নেহলতার মুখ-চোখ হাসিখুশিতে ভরে আছে যেন। একটু পরে আবার বললেন, 'যা পছন্দ করিস বলে ফেল।'

'ভোজন-রসিক তো তোমার সামনেই রয়েছে কাকীমা, ওকে জিজ্ঞেস কর না।'

'পেটুকই বটে!' স্নেহলতা প্রবীরের চোখে চোখে চেয়ে বলেন, 'হ্যাঁরে, বলে ফেল কি খাবি?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রবার গড়গড় করে বলে যায়, 'কি আর, মাছের কালিয়া কর, মুড়োটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট আর মাছভাজা!' বলেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

'দেখলে কাকীমা, বলার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম ফল!' মণিময় হাসছিল বলতে বলতে।

'শুনলে তো বউমা?' স্নেহলতা শোভনার চোখে চোখে চাইলেন।

'কি রে ছোট, ভাল করে শুনেছিস তো!' শোভনা মৃন্ময়ীকে একটা চিমটি কাটে।

'ও তুমি শোন গিয়ে।' মৃন্ময়ী ছোট করে জবাব দিয়ে হেসে ফেলল। প্রবীরের দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'ঠিকই বলে তোমায়, পেটুক বাবাজী!'

'এই ছোট, আমি মাছটা কুটছি, তুই এদিকটা সামলা।' শোভনা বঁটি আর ছাই নিয়ে মাছের ওখানে গিয়ে বসেছে।

'ওর ওপর কিন্তু ভরসা করো না বউদি।' প্রবীর হাসল, হেসে বলল, 'শেষে কোনটাতে দেখবে নুনই দেয়নি।'

'তুই চলে আয় রে ছোট।' শোভনা পরে প্রবীরের মুখের দিকে চেয়ে হুকুমের গলায় বলল, 'যাও, তুমি গিয়ে হেঁসেলে ঢোক।'

'অত আনাড়ী ভাবছ কেন আমাকে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী-পাঠ সবই আমি পারি!'

'প্রমাণ না দিলে কি করে বুঝব যে পার?' শোভনা হাসছিল।

'দেখবে তাহলে?'

'আঃ, আবার দেখানো-ফেকানোর মধ্যে যাওয়া কেন?' মণিময় হাতটা বাড়িয়ে প্রবীরকে বাধা দিল, 'এটা ওদের ডিপার্টমেণ্ট, প্রবেশ

না করাই ভাল। তাহলে কিন্তু তোকে হেভি জরিমানা দিতে হবে, এই বলে রাখছি।'

'তবে আর দরকার নেই বাবা।'

স্নেহলতা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় এলেন, বললেন, 'আমি যাই বউমা, চান-টান করে তোমার শাশুড়ীকে নিয়ে পুজোমণ্ডপ থেকে ঘুরে আসি।'

'যান আপনি, এদিকের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।'

'নিরামিষ ঘরেও ধোঁকা রান্না হচ্ছে।' স্নেহলতা মণিময়ের দিকে তাকালেন এক পলক।

'তবে আর কি! কিন্তু তুমি তো যাচ্ছো কাকীমা, মণিময় ওঁর চোখে চোখে চাইল এবার, মিহি গলায় বলল, 'তুমি জান, এখনও আমাদের সকালের খাওয়া হয়নি?'

'ওমা, তাই তো!' স্নেহলতা গালে হাত দিলেন। জয়ন্তীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোরা কিরে, ছি-ছি, মিহির প্রণব ওরা কি ভাববে!'

শোভনার বুকের ওপর থেকে আঁচলটা একটু সরে গেছে। ঠিক করে নিতে নিতে বলল, 'আপনি জানেন না কাকীমা, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে ওরা!'

'তাহলেও ঘরের খাওয়াটা তো ঠিক সময়ে দিতে হবে!'

'এত বেলা করতে কে বলেছিল!' শোভনা আঁশ ছাড়িয়ে মাছ কুটে টুকরোগুলো গুনছিল।

'আমার হয়ে গেছে দাদাভাই, ওদের ডাক এখানে।' জয়ন্তী চায়ের জল চাপিয়েছে উনুনে। প্লেটে আলুভাজা, লুচি আর কুমড়োর ছক্কা সাজিয়ে রাখল ও।

'হাজার হোক প্রণব বাইরের ছেলে, কি ভাবছে কে জানে, ওকে তোমরা একটু ডেকেডুকে দিও।' স্নেহলতা যেন খুব কুণ্ঠা বোধ করছেন এজন্যে।

'ওর জন্যে খুব ভাববেন না আপনি, ও কিছুই মনে করবে না,

খিদে পেলে নিজেই এসে চেয়ে নেবে।' শোভনার গনায় ভুল হয়ে গেছে। আবার প্রথম থেকে ও গুনতে শুরু করেছে।

'সেই তো ভাল।'

হেমলতা এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কিরে স্নেহ, তাড়াতাড়ি কর, কখন পুজো দিবি আর!'

'তোমার হয়েছে দিদি?' স্নেহলতা চলে যাচ্ছিলেন। কি ভেবে আবার ফিরলেন।

'আমার তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।' হেমলতা স্নান করে নিয়েছেন। একটু রোদে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পুজো দিয়ে এসে আবার রান্নায় বসব।'

কৃষ্ণা এসে মণিময়কে প্রণাম করল। মণিময় হাসবার একটু চেষ্টা করে বলল, 'ভাল আছিস?'

ও কিছু বলল না। মাথাটা ঈষৎ হেলাল শুধু। মুখখানা শুকনো। দুর্ভাগ্য যেন ইতিমধ্যে ওর চেহারার সব লাবণ্য শুষে নিয়েছে। কেমন যেন নিঃসঙ্গ, দুঃখী দেখাচ্ছিল ওকে। কৃষ্ণা দৃষ্টি আনত করে একপাশে সরে দাঁড়াল। বোঝা যায়, তার ভেতরে গভীর এক দুঃখ যেন চাপা রয়েছে। পরিবেশটা মুহূর্তে কেমন বিষণ্ণ ও ভারী হয়ে উঠেছে। সবাই তাকে করুণা করবে, সহানুভূতি দেখাবে, এটা যেন আরো বেদনার ও অস্বস্তির। কোন উৎসবেই যাওয়ার আর তার অধিকার নেই। সে যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তার মতন দুঃখী কি আর কেউ আছে এ জগতে! এখানকার কত স্মৃতিই না মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। এ-বাড়িতেই তার বিয়ে হয়েছিল। মনে হয়, এই তো সেদিন! এখনও তার কাছে সেই স্মৃতি অম্লান রয়েছে। আর আজ? তার মতন ভাগ্যহীনা এ-বাড়িতে বুঝি আর কেউ নেই; কেউ যেন হয়ও না তার মতন। ওর বুকের ভেতরে যে এখন পাথর চাপা এক দুঃখের বোঝা! সময় সময় বইতে বড় কষ্ট হয়। কেন যেন তার মনে হয়েছে, এখানে এসে কি সে ভাল করেছে?

'এই যে কৃষ্ণা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' শোভনা হেসে হেসে নরম চোখে তাকাল। স্নেহের গলায় বলল, 'আমার হাতে একটু জল ঢেলে দাও তো ভাই!' শোভনার হাসির তলায় যেন সামান্য বেদনা, মমতা ছিল।

স্নেহলতা যেতে যেতে বললেন, 'তুইও চান করে নে কৃষ্ণা; আর সব সঙ্গে যাবি।' স্নেহলতার গলা কেমন একটু নরম ও ভেজা মনে হলো।

'এখন দরকার নেই গিয়ে, বরং চান করে ও রান্নার জোগাড় করুক।' হেমলতা বললেন।

'না, এখন ও যাবে কোথায়, বিকেলে আমাদের সঙ্গে বেরোবে।' শোভনা হাসল।

কৃষ্ণা ওর বউদির মুখের দিকে চেয়ে আচমকা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে। সবাই স্তম্ভিত। কেউ কোন কথা বলল না আর।

মণিময় প্রবীর ধীরে ধীরে ওখান থেকে চলে এলো। জয়ন্তী কল্যাণীকে ডাকল একবার। সকালটা হঠাৎ কেমন এক দীর্ঘশ্বাসে, অলক্ষ্য বিষাদে ভরে গেল যেন।

মণিময় ক্ষীরোদবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'এখানে আবার দাঁড়ালে কেন?' প্রবীর অবাক চোখে একবার দেখল ওকে।

'সুব্রতর সঙ্গে তো এখনও দেখাই হলো না, কাকার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী এত কথা বলছে!'

'তুমি যাও, আমি আর যাচ্ছি না!' প্রবীর একটু হেসে আবার বলেছে, 'ফাদারের পাল্লায় পড়লে সহজে ছাড়া পাবে না, যাও একবার!'

'এক রাউণ্ড তো হয়ে গেছে, এখন আর বলবে না কিছু।'

'না বাবা, আমার দরকার নেই গিয়ে!' প্রবীর চলে যেতে যেতে বলে, 'বরং, বাগানটাকে গিয়ে একটু দেখি, জঙ্গল হয়েছে যা!'

মণিময় ঘরে ঢুকল। একটা চেয়ারে বসতে বসতে হাসি-হাসি চোখে সুব্রতকে দেখল একবার। শুধোল, 'তোমাদের তো আরো ক-দিন আগে আসার কথা ছিল, দেরি করলে যে!'

'টাটানগর এসে দুদিন ছিলাম।'

'ওখানে কে যেন থাকে তোমার?' মণিময় চোখে চোখে তাকাল।

'আমার মামারা থাকে। অনেকদিন থেকেই যেতে বলছে, যাই যাই করে যাওয়াই হয়নি।'

'তাই একঢিলে দু পাখি মারলে!' মণিময় হেসে উঠল।

'তুমিও তো গতকালই এসেছ শুনলাম।'

ক্ষীরোদবাবু ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন। পাশে বীণা, সুব্রতর ছোট মেয়ে।

'আপনার শরীর কেমন আছে আজ?' মণিময় ক্ষীরোদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

'খুব ভাল আছি আমি।' ক্ষীরোদবাবুকে এখন হৃষ্ট ও প্রসন্ন দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে পুজো সেরে এসে বসেছেন। শরীর থেকে এখনও চন্দনের মিষ্টি গন্ধ একটু একটু করে বেরোচ্ছে। চোখে-মুখে কিসের এক কান্তি, দীপ্ত ভাব। মণিময়ের মনে হলো, এটা আগে ছিল না। ক্ষীরোদবাবু হাসি মুখে বললেন, 'সুব্রতর কাছে কলকাতার হালচাল শুনছিলাম।'

'আর হালচাল, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে আপনি যে কলকাতা দেখেছিলেন এখন আর তা নেই; গেলে চিনতেই পারবেন না, এত বদলে গেছে।' মণিময় হাসল সামান্য।

'সেজন্যেই তো যেতে আর সাহস হয় না।'

'না না. ওসব চলবে না. এবার দিদাকে নিয়ে আমাদের ওখানে

তোমাকে যেতেই হবে।' রীণা গা ঘেঁষে এসে বসেছে। মুখের ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে সে আবদার করা গলায় বলল।

'আমার আর যাওয়ার কি দরকাব, তোকেই বেখে দেব এবার।'

'ইস—, আমি থাকবই না।'

সুব্রত মেয়েব দিকে তাকাল একবার, বলল, 'ওকি, দুষ্টুমি করছ কেন, দাছুর গায়ে পা লাগছে দেখছ না!'

'কই পা লাগছে!' রীণা বড় বড চোখে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'ওসব কথা শুনিস না তো তুই।' ক্ষীরোদবাবু নাতনীকে আরো কাছে টেনে নিলেন সস্নেহে।

মণিময় একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে শুধোল, 'আপনাকে তো এখনও খেতে দেয়নি কিছু!'

'দেবে'খন, ওর জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

একটু পরে বাসনা এসে শ্বেত-পাথবের গ্লাসে করে একগ্লাস মিছরির সববত এনে টেবিলের ওপর রেখে গেল।

ক্ষীরোদবাবু বললেন, 'আব একটা গ্লাস বা কাপ নিয়ে আয়।'

'ওকে আর দিও না বাবা, এসে অব্দি খাচ্ছে।'

'তোরা বড় বাড়িয়ে বলিস, ও তো আমার এখানেই অনেকক্ষণ থেকে রয়েছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'সরবত খেলে কিছু হবে না।'

'আমি খাব না, খেয়েছি তো!' রীণা কেমন মাথা নাড়ল মায়ের ভয়ে।

'আমার কি, যখন পেট ব্যথা করবে তখন বুঝবি!' বাসনা মেয়ের মুখের দিকে গোল গোল চোখে এক পলক চেয়ে চলে গেল। একটু পরে লছমন এসে একটা কাচের গ্লাস রেখে গেল।

ক্ষীরোদবাবু অল্প একটু ঢেলে ওর হাতে গ্লাসটা দিলেন। পরে নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে খানিকটা খেয়ে গ্লাসটা রেখে দিতে দিতে

বললেন, 'মাঝে মাঝে যা শুনি, তাতে তো রীতিমত ভয় হয়, দাঙ্গা খুন এসব নাকি লেগেই আছে?'

'আসলে লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে, চাকরি-বাকরি নেই, সহরের ওপর চাপটা বেশী।'

মণিময় কি ভাবছিল যেন। চোখ তুলে বলল, 'দেশ ভাগটাই আরো সর্বনাশ করেছে। কাতারে কাতারে লোক এসেছে। তাদের সামনে না আছে ভবিষ্যৎ, না আছে কোন আদর্শ। চোখের সামনে তারা লোকজনকে মরতে, ঘরবাড়ি পুড়তে দেখেছে। এখানে এসেও অবহেলা, উপেক্ষা। জন্তু-জানোয়ারের মতন বেঁচে থাকা; ফলে সব কিছুই দ্রুত বদলে গেল।'

'একটা অসুস্থ আবহাওয়ায় কেমন দূষিত হয়ে উঠল সব।' সুব্রত কি ভাবতে ভাবতে আবার বলে, 'আমাদের চরিত্রই খারাপ হয়ে গেছে এখন। কোনদিকে আর পালাবার উপায় নেই।'

'বাঙালীর জীবনে এত বড় একটা চাপ, অথচ কেউ এটাকে সুস্থভাবে ভাবল না, সমাধান তো দূরে থাক।' মণিময় ভেতরে ভেতরে যেন সামান্য ক্ষুব্ধ হয়েছে। বলল, 'বাইশ বছরের জমে-থাকা গ্লানি, আমাদের পাপ, এখন ফেটে পড়েছে।'

'রাস্তাঘাট, চলাফেরা সব কিছুতেই অব্যবস্থা।' সুব্রত মণিময়ের দিকে চেয়ে বলল, 'তবু তোমাদের নর্থ-এর চেয়ে আমাদের সাউথ কিছুটা ভাল।'

'ওটা যে পুরনো কলকাতা, আরো জঘন্য হয়ে উঠেছে।'

'ফুটপাথ জুড়ে দোকান বাজার বসে যায়, কেউ কারো পরোয়া করে না।'

মণিময়ের কণ্ঠে তখনও খানিকটা উত্তাপ লেগে আছে। বলল, 'তার ওপর মিছিল গলাবাজি বোম ফাটাফাটি রক্তারক্তি তো লেগেই আছে।'

'না গিয়ে ভালই করেছি।' ক্ষীরোদবাবু বাকী সরবতটুকু শেষ

করলেন। গ্লাসটা একপাশে রেখে দিয়ে ফের তিনি বললেন, 'সহর দিয়েই আজ গোটা জাতটাকে চেনা যায় তাহলে!'

'তা যায়।'

আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে মণিময় বলল, 'সমস্যাগুলো যদি বাইরের হয়, তবে একসময় না একসময় তার সমাধান সম্ভব। কিন্তু মানুষগুলোর ভেতরে যখন ঘুণ ধরে যায়, তখন সেটা মারাত্মক। আমাদের ভেতরটাও ইতিমধ্যে ঘুণপোকায় অনেকটা খেয়ে ফেলেছে।'

'এখন এটা আরো বেশী করে বোঝা যায়।'

'যাবেই।' মণিময় আস্তে আস্তে বলল, 'এমন একটা জেনা-রেশান এসেছে, যার দিকে তাকালে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। তাদের সামনে কোন অতীত নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ভরা, শুধু বর্তমানের অস্থিরতা অবিশ্বাস অধঃপতন আছে।'

সুব্রতর গলাও গম্ভীর শোনায়, 'অথচ কেন এমন হলো, এটা কেউ আমরা এখনো তলিয়ে দেখছি না।'

'দেখে আর কোন লাভ নেই। বোধ হয়, এটাই সমাজ ইতি-হাসের নিয়ম। আমি এটাকে কখনো আলাদা করে দেখি না।'

'মাঝে মাঝে কাগজে দেখে বড় ভয় হয়।' ক্ষীরোদবাবু একটু চিন্তিত, উদ্বিগ্ন হলেন যেন।

'ভয়েরই তো কথা!' মণিময় এই মুহূর্তে কেমন বিব্রত বোধ করছে।

'এদিকটায় এখনো কিন্তু, তোরা যেরকম বলছিস, সেরকম কিছু হয় নি।'

'আমার কি মনে হয় জান দাদাভাই?'

মণিময় সুব্রতর চোখের দিকে তাকাল, 'কি?'

'আমরা নিজেরা সব সময় বড় বড় কথা বলেছি, এমন কি নিজের ছেলেমেয়ের কাছেও মিথ্যে ছবি তুলে ধরেছি; কথা বলেছি এক-

রকম, কাজ করেছি অন্যরকম। কথার সঙ্গে জীবনের কোন মিল নেই, এই চালাকিটা ওরাও এতদিনে বুঝতে শিখেছে।'

'কথাটা মিথ্যে নয়।'

'তোরা বরং এখানেই চলে আয়।' ক্ষীরোদবাবু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

'শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে।' মণিময় ম্লানভাবে হাসল।

'সবাইকে তো আর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' সুব্রত মুখ তুলল।

'আমিও বুঝি, এভাবে পালিয়ে এসে বাঁচা যায় না।'

'আমাদের সময়ে কিন্তু অত ঝামেলা ছিল না।' ক্ষীরোদবাবু তাকালেন একবার।

'এখন দিন দিনই সব কিছু কেমন জটিল হয়ে পড়ছে।' সুব্রতকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটা হাই তুলল সে।

'ওসব ভেবে আর কোন লাভ নেই, যা হবার হবে।' মণিময় হেসে উঠল।

'আমি এবার উঠব, চানটা সেরে নিই গিয়ে।' সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

মণিময়ও উঠে পড়েছে, বলল, 'চান সেরে অ'চ্ছা করে একটা ঘুম লাগাও।'

'ট্রেন-জার্নিতে শরীর ভীষণ খারাপ করে।' ক্ষীরোদবাবু এবার বিছানায় এসে বসলেন।

সুব্রত নিজের ঘরে গেল। মণিময় বারান্দায় আসছিল, পথে অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হলো। অঞ্জলি ছাতে ভেজা শাড়ি সায়া ব্লাউজ জামা ফ্রক শুকোতে দিয়ে নামছে। ওর স্ন'ন চুল আঁচড়ানো সিঁদুর পরা হয়ে গেছে। মণিময়কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে ও প্রণাম করল, বলল, 'এতক্ষণ দেখি নি তো!'

'দেখবি কি করে, তুই তো সেই থেকে বাথরুমে ঢুকে বসে আছিস।' মণিময় সিগারেট ধরাল।

'চানটা করে খুব আরাম লাগছে এখন।'

'তোর বর তোকে একা একা আসতে দিল?' মণিময়ের চোখে-মুখে চাপা কৌতুক।

'দিল তো দেখছি।' অঞ্জলি হাসতে হাসতে চোখ নত করল।

'ছেলেমেয়েরা এসেছে তো?'

'বড়গুলো আসে নি, বিউটি আর টিটো এসেছে।'

'মার্শাল টিটো এসে গেছে?' মণিময় খুব খুশি হলো যেন।

'ওকে রেখে আমার যাওয়ার উপায় আছে কোথাও; যা পাজি হয়েছে না!'

'তোর ছেলেমেয়েগুলো বড় ঘরকুনো হয়েছে।' মণিময় সিগারেট টানতে টানতে বলল।

'তা নয়, ওর বাবা আসে নি তো, তাই এলো না।'

'খুব যে সব বাপের ভক্ত দেখছি!' মণিময় হাসল একটু। সিগারেটে টান দিয়ে পরে ফের বলল, 'প্রণবের সঙ্গে দেখা হয় নি তোর, ও-ও তো এসেছে আমার সঙ্গে।'

'না, এখনও হয় নি, বউদির মুখে শুনেছি ও এসেছে।' অঞ্জলি হাসিমুখে আবার বলল, 'ওরা গেছে কোথায়, মিহিরকেও তো এখন পর্যন্ত দেখলাম না!'

মণিময় ছোট করে বার দুই কাশল, 'বোধ হয় দুই মাস্টার এখনও বারান্দায় বসে রাজ্যের সমস্যা নিয়ে মেতে আছে!'

কথা বলতে বলতে মণিময় অঞ্জলি বারান্দায় এলো।

'তোমরা সেই থেকে এখানে?' মণিময়ের মুখে হাসি।

'কিরে প্রণব, ভাল আছিস?' অঞ্জলি একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল।

'আছি কোনরকম।'

'তোর চেহারা আগের চেয়ে অনেক পাল্টে গেছে রে।'

'বয়েস হচ্ছে, পাল্টাবে না!' প্রণব হাসি-হাসি চোখে তাকাল।

'মারব এক চড়, খুব বুড়োটে কথা বলতে শিখেছিস তো!'

'কি ব্যাপার, দিদিভাই যে আমায় দেখছই না একদম!' মিহির ওর দিকে চেয়ে হাসল।

'দেখেছি, সবাইকেই দেখেছি। তা তোমরা এখানে একলা বসে আছ কেন?'

'এখানটা খারাপ কি!' মিহির হেসে হেসে বলল, 'এখানে বসে বসেই প্রকৃতির কি সুন্দর শোভা দেখা যায় বল তো!'

'নাও, আর শোভা দেখতে হবে না!' মণিময় রগুড়ে গলায় বলল। সিগারেটে টান দিতে দিতে মিহিরের চোখে চোখে তাকায়, বলে, 'হাত-মুখ ধুয়েছ?' মণিময় এবার অঞ্জলির মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের এখনও চা-টা দিচ্ছে না, ব্যাপারটা কি!'

'আবার টা কি, আমরা তো খেয়ে এলাম!' প্রণব সামান্য অবাক হলো যেন।

'না খেলে কাকামা ভীষণ রাগ করবে, আর এতক্ষণে তো ওসব হজমও হয়ে গেছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, হজম হয়ে গেছে।' মিহির হেসে উঠল।

'সে কি দাদাভাই!' প্রবীর হাসি হাসি চোখে একবার তাকাল। সে বাগানের আগাছা সাফ করছিল, বলল, 'কাল থেকে আমিও রোজ তোমাদের সঙ্গে বাজারে যাব।'

'ঘুম ভাঙবে তো?'

'না ভাঙলে তো দেখছি আমারই লোকসান!

অঞ্জলি প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জেঠিমা কেমন আছে রে, দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে!'

'ভাল না, রোগে শোকে মার চেহারা একদম ভেঙে গেছে।'

'ভাঙার আর দোষ কি!' অঞ্জলি মমতাভরা গলায় একটু পরে আবার বলে, 'বোনেদের বিয়ে হয়েছে?'

'একজনের কোন রকমে হয়েছে, এখনও তিনজন বাকী।'

'ওরা পড়াশুনো করছে তো?'

'কই আর করছে!'

'তাহলে এখনও তোর মাথায় বিরাট বোঝা, বল!'

মণিময় অঞ্জলিকে বলল, 'একবার ভেতরে গিয়ে দেখ তো, কি হলো, জয়ন্তী তো প্লেটে সব সাজিয়ে রাখছিল দেখলাম।'

অঞ্জলি চলে গেল। মণিময় সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিতে গিয়ে দেখল, বাগানের এককোণে কৃষ্ণার ছেলেটা জঙ্গলের মধ্যে একমনে কি যেন একটা খুঁজছে। সাপ-টাপ থাকতে পারে ওখানটায়। ভয় হলো তার। জোরে ডাকল, 'বুবাই, ওখানে কি করছিস রে?'

বুবাই থমকে দাঁড়িয়েছে। ডাগর চোখে কি এক গভীর মায়া। ধীরে ধীরে ছেলেটা ঝোপের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। মাথা নীচু করে অন্যদিকে চলে গেল। মণিময়ের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক ঠেলে।

কল্যাণী মৈত্রেয়ী রুবি বিউটি ওরা একটা কাঠচাঁপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। পাশেই হরিতকী গাছ, তার পাশে পেয়ারা ও লেবু গাছ। এদিকটা একটু নিরিবিলি। এখনও রোদ আসে নি এখানে। এলেও বোঝা যাচ্ছিল না, ঘন ছায়া ছিল। মাটি থেকে একটা কাঠচাঁপা ফুল কুড়িয়ে নিল রুবি।

বিউটি একটা আতা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কি বড় বড় আতা মাসিমণি!'

'তোদের জন্যে সব রেখে দিয়েছে মা।' কল্যাণী হাসি হাসি মুখে বলল।

'এবার খুব মজা হবে মাসি, না?' মৈত্রেয়ী মুখ তুলে কল্যাণীকে

দেখল। কল্যাণী আর মৈত্রেয়ী প্রায় সমবয়েসী। দু-এক বছরের ছোট-বড় হবে। পড়েও একই ক্লাসে।

'খুব, খুব মজা হবে রে।' কল্যাণীর খুশি যেন আর ধরে না।

'খুব বেড়ানো হবে এবার।' রুবির মুখেও হাসি দুলছে।

'হ্যাঁরে বিউটি, মণিকা গৌতমরা এলো না কেন?' কল্যাণী তাকাল একবার।

'ঠাকুরমার অসুখ তো, তাই!' একটু চুপ করে থেকে মুখ টিপে টিপে ও হাসল। 'ওরাই ঠকেছে না এসে।'

'মাসি?' মৈত্রেয়ী ডাকল।

'কিরে?' কল্যাণীব চোখে-মুখেও হাসির ঝিলিক।

মৈত্রেয়ী কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মেসোর সঙ্গে বারান্দায় কে একজন বসে আছে, চিনলুম না তো!'

'রুবিকে জিজ্ঞেস কর।' কল্যাণী অন্যদিকে তাকাল। একটা লেবু গাছের পাতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে মাথা নীচু করে ও হাসল।

'খুব যে রাঙাপিসী, তুমি যেন আর চেন না!' রুবিও হেসে ফেলেছে।

'কেন চিনব না! ও হলো, দাদাভাইয়ের বন্ধু।' কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে হাসল। চোখ তুলে মৈত্রেয়ীকে দেখল এক মুহূর্ত।

রুবি যেন এরকম উত্তরে ঠিক খুশি হলো না। বলল, 'না গো দিদিভাই, প্রণবকাকু বাবার কত ছোট, বন্ধু হবে কেন! প্রণবকাকুরা এখানে নাকি থাকত আগে, সবাই তো চেনে দেখলাম!'

'যাক গে, তোর প্রণবকাকুর কথা এখন থাক।' কল্যাণী থামিয়ে দিতে চাইল এ আলোচনা।

'থাকবে কেন, আমি তো তোমাকে বলছি না, দিদিভাইকে বলছি।' রুবি হেসে মৈত্রেয়ীর চোখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে আবার বলল, 'তুমি জান না দিদিভাই, প্রণবকাকু না কী ভাল! কী সুন্দর গান করে না!'

'তাই নাকি রে ?' মৈত্রেয়ী কি ভেবে একটু জোরে হেসে উঠেছে।

'এমন কিছু নয় একটা।' পিঠময় ছড়ানো চুলের একটা খোঁপা করে নিতে নিতে কল্যাণী ওর চোখে চোখে তাকাল।

'না গো দিদিভাই, তুমি মোটেই রাঙাপিসীর কথা বিশ্বাস করো না।'

'ঠিক আছে, তোর প্রণবকাকুকে বলিস তো গান করতে।' পরে কি যেন মনে পড়ল মৈত্রেয়ীর। কল্যাণীর মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'এই, ছোটমামার তো গাড়ি আছে, একদিন হুড্রো জোনা ফল্‌স্‌ দেখে আসি চল। আমি এখনও ফল্‌স্‌ দেখি নি রে!'

'আমিও দেখি নি।' বিউটি বলল।

'বেশ তো, ছোটমামাকে বল না একবাব!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কুট্টিকাকুকে বললেই হবে।' রুবি খুব উৎসাহ বোধ করল।

কল্যাণী বলল, 'এখনই তো আর যাওয়া হচ্ছে না, সবে তো এলি।'

'আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে না, তোমাকে কি বলব মাসি!' মৈত্রেয়ী হাতদুটো ওপরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চোখ-মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল। পরে হাসতে হাসতে আবার বলল, 'শাড়ি গয়নার ওপর আমার কোন লোভ নেই বুঝলে মাসি, বেড়াতে নিয়ে গেলে আমার আর কিছু চাই না।'

'আমার আবার অত ঘুরতে-টুরতে ভাল লাগে না।' রুবি সরল-ভাবে হাসল।

'আমার কিন্তু সবটাতেই অল্পস্বল্প লোভ আছে।' কল্যাণী মৃদু মৃদু হাসছিল।

'এবার খুব বেড়াব।' মৈত্রেয়ী চোখে চোখে সোজাভাবে তাকাল।

'হ্যাঁরে, তোর যে দেখছি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের দশা।'

'হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।' মৈত্রেয়ী হাত নাচিয়ে নাচিয়ে সুর করে আবৃত্তি করল। শব্দ করে করে হাসল।

'হয়েছে, আর তালি বাজিয়ে দরকার নেই।'

'দেখ দেখ বিউটি, দিদিভাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' রুবি যেন হাসি চাপতে পারছে না ওর কাণ্ড দেখে।

'রাঁচীতেই তুমি থেকে যাও দিদিভাই।' বিউটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল।

ওদের সামনে একটা প্রজাপতি উড়ছিল তখন। মৈত্রেয়ীর গায়ে বসতে যাচ্ছিল প্রজাপতিটা, সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেই মুহূর্তে, 'দিদিভাইয়ের গায়ে বসেছে!'

'না, মোটেই না।' মৈত্রেয়ী সরে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দেখেছি, তোমার গায়েই বসেছে।'

প্রজাপতিটা এবার কল্যাণীর দিকে এলো। কল্যাণী সরে যেতে যেতে বলল, 'এই আমি না, ওদিকে যা!'

'এবার আসল লোক চিনেছে।' মৈত্রেয়ী জোরে জোরে হেসে উঠেছে।

'কি মজা, রাঙাপিসীর গায়ে বসেছে!' রুবি আবার হাততালি দিল।

'ঠিক হয়েছে, মাসিমণি বাদ পড়ে যাচ্ছিল।'

'কি মাসি, এবার?' মৈত্রেয়ীর চোখে অন্য ইশারা।

'মোটেই না, ওটা আসলে কার গায়ে বসবে ঠিক করতে পারছে না।'

'তোমার, তোমার গায়েই বসবে।' মৈত্রেয়ী জিভ বের করে ভেংচাল।

'ছাই—, তোর!' কল্যাণী জোরে জোরে হাসল।

ওদের হাসিতে শঙ্কর এসে দাঁড়াল সেখানে। চোখের অবাক

ভঙ্গি করে চটপটে গলায় বলল, ‘কিরে বড়দি, তোরা এত হাসছিস কেন রে ?’

‘তোর কি দরকার শুনি। না ভাই, তুমি এখান থেকে যাও, মেয়েদের এখানে তোমার থাকতে হবে না।’ রুবি চোখ-মুখ পাকিয়ে গম্ভীর করে তাকায়।

‘বলবি না তো ; বলবি না তো ?’ শঙ্কর গোল গোল চোখে তাকাল।

‘না, বলব না।’

‘না বললে এই খাও।’ শঙ্কর কোমর বেঁকিয়ে মুখ দিয়ে বিচিত্র এক শব্দ করে পালিয়ে গেল।

‘দাঁড়া, বাবাকে বলছি আমি ; ভাইটা না ভীষণ অসভ্য হয়েছে।’

কল্যাণী হেসে ফেলে বলল, ‘ওর আর দোষ কি, এ-বাড়ির ধারাই তো এই।’

‘দেখ না, ভাইয়ের মুখে খালি অসভ্য অসভ্য কথা।’

মৈত্রেয়ী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রুবির মুখের দিকে তাকাল, ‘আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।’ ওকে বেশ সপ্রতিভ, ঝলমলে দেখাচ্ছে।

‘শুনি কি আইডিয়া ?’ রুবি চোখে চোখে চেয়ে হাসছে।

‘দারুণ ব্যাপার হবে দেখিস !’

কল্যাণী বলল, ‘ব্যাপারটা শুনিই না আগে !’

‘বাড়িতে এতগুলো ছেলেমেয়ে আমরা, একটা জলসা করলে তো হয় !’

‘দারুণ মজা হবে তাহলে, লাগাও দিদিভাই।’ রুবি হাততালি দিয়ে উঠল।

‘কি কি হবে ?’ কল্যাণী ওর চোখের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'পরে ভাবব।' মৈত্রেয়ী চোখ টান-টান করে হাসল। একটু পরে আবার বলল, 'তবে রবি ঠাকুরের 'বিদায় অভিশাপ'-ও আমরা করব; রুবি করবে দেবযানী, কচ শুভ। মাথায় আরো সব আইডিয়া আসছে।'

'শুভটা যা লাজুক আর ঘরকুনো!' কল্যাণী হাসছিল। খানিক পরে বলল, 'করলে কিন্তু দারুণ হবে।'

রুবি বলল, 'ছেলেদের অত লাজুক হওয়ার কোন মানে হয় না। ভাল ছেলেদের ব্যাপার-স্যাপারই সব আলাদা।'

'ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে।' মৈত্রেয়ী বলল।

বাসনা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল, কল্যাণীকে ডাকল, 'কিরে, তোকে না জয়ন্তী কখন থেকে ডাকছে, ওদের খেতে দিস নি এখনও?'

'আমি তো শুনতেই পাই নি।' কল্যাণী দ্রুতপায়ে চলে গেল।

কল্যাণী টেবিলে এনে ওদের খাবার রাখল। মিহির ওকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, এতক্ষণে তাহলে মনে পড়ল!'

'ওরেব্ বাবা, না পড়লে উপায় আছে!' কল্যাণী চোখ টান-টান করে তাকাল।

প্রণব চোখ তুলে ওকে এক পলক দেখল। মৃদু হেসে আবার চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

'এই—, হাসছেন যে আপনি?'

'ভাবছি, আর একটু পরেই তো দুপুরের খাওয়াটা করে নিতে পারতাম!' প্রণব চোখে চোখে তাকাল। গলায় কৌতুক ছিল।

কল্যাণী হেসে হেসে বলল, 'আগে বলবেন তো, তাহলে কে অত কষ্ট করে!'

মণিময় হাসছিল, বলল, 'দুপুরের খাওয়া হতে এখনও ঢের দেরি আছে।'

'শুনলেন তো, সুতরাং খেয়ে নিন, না হলে ঠকবেন।'

বাগান থেকে প্রবীর চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকেও একটু চা দিস বে।'

সুব্রত স্নান শেষ করে পাজামা আর গেঞ্জি পরে বারান্দায় এলো। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বেচারা খেটে খেটে কেমন রোগা হয়ে গেছে দেখেছ।'

'এই যে সুব্রতদা, এসে অব্দি যে আর পাত্তাই নেই।'

'অভিযোগটা তো আমার।' হাসল সুব্রত। পবে বলল, 'অবশ্য এত ভিড়ে নজর না পড়ারই কথা।'

'আজ্ঞে না, আমার ঠিকই নজর আছে।'

সুব্রত মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, 'তাবপব, তোমার কি খবর?'

'মোটামুটি।'

মণিময় সুব্রতর সঙ্গে প্রণবের পরিচয় করিয়ে দিল।

আরো খানিকক্ষণ সুব্রত ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শেষে উঠে পড়ল, 'চোখটা বড় টানছে, একটু শুয়ে নিই গে।' সুব্রত চলে গেল।

'আমরাও উঠব এবার।'

রোদটা ততক্ষণে আরো ধাবালো হয়ে উঠেছে। গা থেকে জামা খুলে ফেলল সবাই।

সাত

সন্ধ্যের মুখে মুখেই দলটি বেরিয়েছিল। সাজপোশাক করতেই দেরি হয়েছে ওদের। অথচ বেরোবার তোড়জোড় চলছে সেই দুপুর থেকেই। পাউডার সেন্টের গন্ধ ভুর-ভুর করছে। লেভেল-ক্রসিংয়ের সামনে এসে পান খাওয়ার ধুম পড়ে গেল।

শোভনা পান চিবোতে চিবোতে প্রবীরের দিকে চেয়ে হাসল, শুধোল, 'আমাদের এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

'বেরোতে না বেরোতেই ভয়!' একটু হেসে প্রবীর ফের বলে, 'উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছে।'

মণিময় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'ভণিতা না করে বলেই ফেল না কোথায়!'

বাসনা বলল, 'বাচ্চাগুলোকে তোরা হাত ধরে থাকিস রে।'

'দলটা তো নেহাত কম বড় নয়!' অঞ্জলি জয়ন্তীর গা ঘেঁষে এলো।

'বড় নয় মানে, রীতিমতন একটা ব্যাটেলিয়ান!' মণিময় হেসে উঠল। পরে জোরে জোরে বলল, 'তোরা কিন্তু কেউ রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাবি না, হাত ধরে চল।'

'বড়মামার শুধু ভয়।' মৈত্রেয়ী পানের রসে ঠোঁট রাঙা করেছে। সে খিলখিল করে হাসছিল। তার খুব আনন্দ হচ্ছে।

'মার্শাল টিটো?' মণিময় হাঁক দিল।

'কি মামা?'

'রাস্তার অত মাঝখান দিয়ে যেতে বারণ করছি না, কারো হাত ধরে থাক।'

'আমি ছোট পিসীর হাত ধরব।' বলেই দৌড়ে ও কল্যাণীর কাছে চলে গেল।

কল্যাণী জিভটা ঠোঁটে একবার বুলিয়ে নিল। তারপর রুবিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'দেখ তো, আমার ঠোঁটটা লাল হয়েছে কিনা!'

'লাল মানে, টুকটুকে লাল।' পেছন থেকে মিহির হেসে উঠল।

প্রবীর মণিময়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল।

মণিময় বলল, 'এভাবেই হাঁটব নাকি রে?'

প্রবীর বলল, 'আমাদের কিছু করার নেই এখানে।'

'আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?'

'কোথায় আর, একসঙ্গে বেড়ানো।' অলস, হালকা মেজাজ।

সুব্রত মণিময়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। ফিস ফিস করে বলল, 'অত হাঁটাহাঁটি আমার ভাল লাগে না দাদাভাই; বরং এক জায়গায় বসে গল্প-টল্প কর, আলাদা সুখ আছে।'

প্রবীর ধোঁয়া গিলতে গিলতে বলল, 'সুব্রতদা দেখছি এরই মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছ।'

মিহিরও শুনে ফেলেছে কথাটা। তার খারাপ লাগছিল না। সুব্রতর চোখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তার চেয়ে ঘুমোলে আরো সুখ, তাই না দাদা?'

'এই যা বললে না ভাই, মোক্ষম কথা! ঘুমের বিকল্প বলে কিছু নেই।' সুব্রত হাসতে লাগল।

কৃষ্ণা একটু পেছনে। প্রণব বুবাইয়ের হাত ধরে রেখেছে। ও বড় একটা কথা বলছে না।

মণিময় এবার যেন অধৈর্য হয়ে পড়ল, 'আমি আর একটু গিয়েই ফিরব, এই বলে রাখছি।'

প্রবীর এবার হেঁয়ালি না করেই বলল, 'আমরা বর্ধমান কম্পাউণ্ডে যাচ্ছি, হলো?'

মণিময় মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'তুই কি খেপেছিস ?'

'কেন ?'

'আবার কেন বলছিস, এটা কি কাছের পথ হলো ?'

মিহিরও অবাক হলো, 'সে তো অনেক দূর !'

'যতটা যাওয়া যায়, না পারলে রিক্সায় উঠব, অত ভয়ের কি আছে !'

'ভয়ের নেই মানে, রীতি মতন ভয়ের ব্যাপার। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে অতখানি পথ হাঁটা কি চাট্টিখানি কথা !' মণিময় হাসতে হাসতে বলল, 'না ভাই, আমার গিয়ে কাজ নেই, তোমরা যাও।'

'আমিও তোমার দলে দাদাভাই।' সুব্রত তাকাল একবার।

মণিময় প্রবীরের মুখের দিকে চেয়ে মজা করে বলল, 'যাও না, বস বেরিয়ে যাবে !'

'কি অসভ্য রে দাদাভাইটা !' জয়ন্তী হেসে হেসে শোভনার গায়ে পড়ে গেল।

'এ আর এমন কি দূর, দেখতে দেখতে যাব, খুব ভাল লাগবে।' মৈত্রেয়ী তাকাল একবার। পরে আবদার করা গলায় বলল, 'আহা, কি হয়েছে, চলই না !'

মিহির ওর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে শুধোয়, 'ফিরবে কি করে ?'

'যাওয়াই হলো না, ফেরার চিন্তা। আপনি একটু বলুন না মেসো !'

মণিময় বলল, 'বুঝছিস না কেন, কুচোকাচা নিয়ে এতটা পথ যাওয়া যায় না।'

'না, যাওয়া যায় না !'

মিহির বলল, 'আজ ছেড়েই দাও, পরে একদিন আমরা আলাদা করে বেরোব।'

'তাছাড়া আকাশটাও ভাল নয়, ঝড়-বৃষ্টি আসতে পারে।' মণিময় আকাশ দেখল একটু সময়।

বাতাসে গাছের শুকনো ঝরা পাতা, ধুলো উড়ছিল। আকাশে থরে থরে মেঘ জমেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সব।

শোভনা প্রবীরের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি জানতাম ভাই, তোমার দাদাভাইটিকে তো আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

মণিময় হাসতে হাসতে বলল, 'হাড়ে হাড়ে তোমারই তো চেনার একমাত্র অধিকার।'

শোভনা ধমক দিল, 'চুপ কর তুমি। এরপর সবার সঙ্গে আর বেরোবে না, এই বলে দিচ্ছি!' শোভনা ভীষণ চটে গেছে মনে হলো।

বাসনা মুচকি হেসে বলল, 'দাদাভাইয়ের মুখে আর কিছু আটকায় না।'

মণিময় কৌতুক বোধ করছিল। হাসি চাপতে চাপতে বলল, 'তোর বউদি ফায়ার রে প্রবীর!'

'তোমারই তো দোষ।'

'তুমি আর কোন কথা বলবে না, একদম চুপ।'

'ঠিক আছে, চুপ।' মণিময় ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে পিটপিট করে তাকাল।

'কি হচ্ছে বউদি!' বাসনা শোভনাকে সরিয়ে আনল।

'দেখ না ভাই, রাগ ধরে যায়।' শোভনা হেসে ফেলল।

'তোমার নন্দাইও তো ওই দলেরই।'

মিহির বলল, 'আজ আর কাজ নেই গিয়ে, এবার ফিরে চল।'

ওরা আরো কিছুটা গিয়ে ফেরায়ালাল চকের কাছে এসে থামল। দোকানে ঢুকে কিছু কেনাকাটা করল। রাস্তায়, দোকানে লোকজনের ভিড়। চা মিষ্টি খেয়ে আরো খানিকটা সময় খরচ করে ঘরের পথ ধরেছে ওরা।

বিউটি সামান্য বেজার হলো যেন, 'না বেরোলেই হত।'

প্রণব কল্যাণীর মুখের ওপর চোখ স্থির রেখে হাসল একটু, 'সাজগোজটাই দেখছি মাঠে মারা গেল!'

'আপনাদের জন্যেই তো!'

মৈত্রেয়ী কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। তার মুখ অপ্রসন্ন। বলল, 'আগে বললেই হত, বেরোতাম না।'

'এরপর আমরা আমরাই বেরোব, কারো সঙ্গে আমাদের বেরোবার দরকার নেই।' রুবি রাগে এপাশে চলে এলো।

'যাই বল, আমি বাবা অত হাঁটতে পারি না।' বীণা হেসে হেসে রুবির একটা হাত ধরেছে।

শুভ চুপচাপ হাঁটছিল। রুবি ওর পাশে এলো। এবার হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'তুমি তো একটাও কথা বলছ না শুভদা!'

শুভ তাকাল একবার। লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'সবাই তো বলছে।'

রুবি তখনো ঠোঁট কামড়ে হাসছে। বলল, 'তুমি ভীষণ কম কথা বল।'

শুভ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারি না ; মা এজন্যে আমায় কম বকাবকি করে নাকি!'

রুবি হাসি থামিয়ে একসময় বলল, 'শুনেছ তো, আমরা জলসা করছি!'

'না, শুনি নি!'

'তুমিও বাদ নেই কিন্তু!'

'আমি কি করব, আমি কিছু পারি না।' শুভ যেন আরো ম্রিয়মাণ, আড়ষ্ট হলো।

'বারে, আমাদের ঠিক হয়ে গেছে সব ; রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' হবে। তুমি কচ।' রুবি ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল মিষ্টি করে। শুভও চেয়ে আছে। ও খুশি গলায় বলল; 'আর

আমি হলাম দেবযানী।' চোখে ইশারা ফুটিয়ে খিলখিল করে হাসল রুবি।

শুভ কেমন একটু সঙ্কুচিত হলো।

মৈত্রেয়ী প্রবীরের কাছে এসে বলল, 'কি ছোটমামা, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা ছিল না!'

'আমার কোন দোষ নেই।' প্রবীর পরে আবার বলল, 'ঠিক আছে, কাল তোদের ছুড্রো জোনা ঘুরিয়ে আনব।'

মণিময় বলল, 'সেই ভাল।'

রুবি বলল, 'ঠিক তো কুট্টিকাকু?'

'হ্যাঁ রে।'

মিহির বলল, 'কাল লোকও কম থাকবে।'

বাসনা আড়চোখে প্রবীরের দিকে চেয়ে বলল, 'সে কিরে, আমরা যাব না?'

প্রবীর কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, 'না, তোমাদের নিয়ে আর নয়।'

মণিময় বাসনার দিকে চেয়ে হাসল, 'তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন, আমরা আলাদা যাব।'

শোভনা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল, 'আমি আর কোথাও যাচ্ছি না তোমার সঙ্গে।'

'তোমাকে রেখে আমি যাবই না।' মণিময় হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বলল।

মণিময়ের কথা বলার ধরন দেখে সবাই হেসে ফেলেছে। শোভনাও না হেসে পারল না।

মৈত্রেয়ী এবার প্রবীরের আরো কাছে এলো। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, 'কাল ভোর-ভোর আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

'নাঃ, অত ভোরে আমি পারব না। ঘুম থেকে উঠব, আগে চা-ফা খাব, তবে তো মেজাজ আসবে!'

'তা হলে দেরি হয়ে যাবে না।'

'একটু দেরি হলে হবে।' প্রবীর সামান্য সময় চুপ করে থাকল। পরে হাসতে হাসতে বলল, 'যারা নামতে বা উঠতে পারবে না, তাদের যাওয়া চলবে না।'

'আমি পারব।' শঙ্কর হাত তুলল।

'আমিও পারব ছোটমামা।' টিটোও হাত তুলেছে।

'এভাবে তো হবে না, আগে একটা লিস্ট কর, সেই লিস্ট দেখে ঠিক করা হবে কে যাবে, আর কে যাবে না।'

মৈত্রেয়ী বলল, 'বাড়ি গিয়েই আমি একটা লিস্ট করে ফেলছি।'

'আমি, আমি যাব না ছোটমামা?' বুবাই এসে ওর একটা হাত ধরল। ডাগর চোখে এখন পাতলা এক চিলতে হাসি।

'নিশ্চয়ই যাবে, কেন যাবে না।' প্রবীর ওর গালটা আলতো করে টিপে দিল।

'আমাকে নেবে না, আমাকে?' টিটো ছুটে এলো।

মণিময় বলল, 'তোকে নেবে না মানে, তুই ব্যাটা মার্শাল টিটো, তোকে না নিলে হয়!'

সবাই হেসে উঠল।

মণিময় মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এতগুলোতে গাড়ি চাপলে আর দেখতে হবে না, নির্ঘাৎ টায়ার বার্স্ট করবে।'

'করুক বার্স্ট।' মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে পরমুহূর্তেই বলল, 'তুমি বাদ।'

দেখতে দেখতে আকাশটা আরো কালো হয়ে উঠেছে। ওদিকে চেয়ে মণিময় বলল, 'আর হাঁটা নয়, এবার রিক্সা।'

প্রবীর বলল, 'মেঘটা উড়ে যাচ্ছে, দেখছ না; এখন আর বৃষ্টি হবে না।'

'না হলেই ভাল।'

কৃষ্ণা যে ওদের মধ্যে আছে বোঝা যাচ্ছে না। সে কেমন আড়ষ্ট,

ম্রিয়মাণ। হাঁটতে হাঁটতে বার বার কেমন হোঁচট খাচ্ছিল ও। নিজেকে কিছুতেই ওদের সঙ্গে মেশাতে পারছে না। কোথায় যেন একটা চিড় ধরেছে। ফলে, পার্থক্যটা আরো বেশী করে প্রকট হয়ে উঠছে। না এলেই বোধহয় ভাল করত ও। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে কেমন ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে কেবল। বাসনা ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। কৃষ্ণা একটু চমকে গিয়ে ওর মুখের দিকে একটু সময় কেমন অসহায়ের মতন চেয়ে থাকল। পরে আস্তে আস্তে দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

বাসনা মমতাভরা গলায় বলল, 'তুই একটাও কথা বলছিস না যে ?'

'কেন বলব না, বলছি তো !' কৃষ্ণা তখনো সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

বাসনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ওখানে তো মাঝে মাঝে এসে ক'দিন থাকতে পারিস।'

'কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না, বিশ্বাস কর দিদিভাই, আমার কিছু আর ভাল লাগে না।'

'সবই বুঝি, করার তো কিছু নেই।' একটু চুপ করে থেকে বাসনা বলল, 'এখানে তাহলে কিছুদিন থেকেই যা !'

'তাও বোধহয় হবে না।' কৃষ্ণার গলা ধরে এলো। চোখদুটো কেমন ঝাপসা, ছলছল।

ওরা রিক্সায় উঠল।

বাড়িতে স্নেহলতা ক্ষীরোদবাবু আর হেমলতা ছিলেন। ওরা চলে যাওয়ার পরপরই সন্ধ্যে নেমে এসেছে। ক্ষীরোদবাবু পুজোর ঘরে গেছেন। স্নেহলতা ঘরে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধূপধুনো বাতি দেখিয়ে গেলেন। আলো জ্বাললেন। অনেককাল পর বাড়িটা আবার যেন

আনন্দে কোলাহলে ভরে উঠেছে। এই সুখের সংসার রেখে যেন এবার চোখ বুজতে পারেন এটুকুই দয়াল ঠাকুরের কাছে তাঁব প্রার্থনা। এতকাল তো একটানা সংসার করে গেলেন, আর কত করবেন! শাশুড়ীর বড় ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ান স্নেহলতা। বাতি দেখান। তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করেন। মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি যেন দুহাত ভরে এদের আশীর্বাদ করছেন দূর থেকে। তাঁরই দয়ায় যেন এদের এই সুখ, শান্তি। প্রথম যখন বউ হয়ে স্নেহলতা এ-বাড়িতে আসেন, তখনো কত বড় সংসার ;- ননদ নন্দাই, ভাসুর খুড়শ্বশুর জেঠশ্বশুর, শাশুড়ী ; একে একে অনেকেই তাঁরা চলে গেলেন। নিজেদের সংসারও দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল, ছেলে মেয়ে বউ জামাই নাতি নাতনী। এবার তাঁদেরও যাওয়ার সময় হয়ে এলো। শুধু সময়ের অপেক্ষায়, ডাক এলেই চলে যাওয়া। নির্জনে কতসময় তিনি ভেবেছেন, মানুষ কোথায় যায়! উত্তর নেই। কী গভীর এক রহস্য যেন। হায়রে, এ সবই ফেলে রেখে চলে যেতে হবে! এর যেন শেষ নেই। অনন্ত কাল ধরে বুঝি এর চলা। আজকাল এসব চিন্তা যেন তাঁকে কেমন বিবশ করে রাখে। শাশুড়ীর মতন তাঁরাও দূরে গিয়ে এদের আশীর্বাদ করবেন। এবার শুধু কল্যাণীটার বিয়ে হলেই হয়। স্নেহলতার মুখে সামান্য বেদনা ও অন্যমনস্কতা ফুটে উঠেছে যেন। একটু পরে আস্তে আস্তে হেমলতাকে বললেন, 'চল দিদি, আমরা বড় ঘরটায় গিয়ে বসি।'

'তাই চল!' হেমলতা এ-ঘরে এলেন। একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ মালা জপলেন কিছুক্ষণ। পরে একফাঁকে বললেন, 'হিমানীশটার জন্যে মনটা বড় খচখচ করছে রে স্নেহ।'

'আর মনে করিও না, আমারও বুকের ভেতরটা জ্বলছে। ছেলে মেয়ে বউ-র কথা, আমারও খুব মনে পড়ছে দিদি! কে জানে, কেমন আছে ওরা!' গলার স্বর কেটে যায়। একটু থেমে আবার

বললেন, 'এই পুজো-আচ্ছার দিনেও ছেলেটা বাইরে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্নেহলতা। চোখদুটো কেন যেন তাঁর হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো। আঁচল দিয়ে চোখের পাতা মুছতে মুছতে বললেন, 'ছেলেমেয়ে বড় হলে মায়ের কথাটা ওরা ভুলে যায়।'

স্নেহলতা কি ভেবে এগিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলেন। ঢাকনাটার গায়ে ধুলো জমেছে। অনেকদিন পরে যেন এটাকে চোখে পড়েছে আবার। কি ভেবে ঢাকনাটা তুলে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে গেলেন।

'কর না একটা গান।' হেমলতা অল্প একটু হেসে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন, 'কতকাল তোর গান শুনি নি রে!'

'গান-টান তো ভুলেই গেছি দিদি, সুর-টুরও আর নেই।'

'তোর গানের সেই খাতাটা আছে না?'

'তুমি কী যে বল দিদি, সে কি আজকের কথা! সংসারের জঞ্জালের সঙ্গে কবে হারিয়ে গেছে!'

'সবটাতেই তোর খামখেয়ালি।' হেমলতা একটু নীরব থেকে বললেন, 'গাইতে শুরু করলেই দেখবি মনে পড়ে গেছে।'

'ওরা যদি এসে পড়ে!'

'এই তো বেরিয়েছে, এখুনি আসবে কি!' একটু ভেবে নিয়ে হেমলতা আবার বললেন, 'এ সময়টায় বেরোনো ওদের ঠিক হয় নি, ভীষণ মেঘ করেছে, বৃষ্টি এলো বলে।'

স্নেহলতার তখন কথা শোনার মন ছিল না। আবার যেন পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ওরা এসেই বুঝি নতুন করে সেই ফেলে-আসা দিনগুলো তাঁর হাতে তুলে দিল। মুহূর্তে সব মেঘ সরে গেছে যেন।. তিনি তখন গুন গুন করে একটা সুর মনে করার চেষ্টা করছেন। পরে সোৎসাহে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখি, কি বল দিদি?'

'হ্যাঁরে, বলছি তো।'

একটু পরে ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি গাইতে শুরু করেন, 'এসো হে গৃহদেবতা, এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র / বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি—, দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র।' স্নেহলতার সুর কেটে গেল হঠাৎ, বলল, 'এই যাঃ, আর তো মনে নেই!'

এমন সময়ই আচমকা দলটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। স্নেহলতা ওঠবার আগেই মৈত্রেয়ী রুবি দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। স্নেহলতা সামলে ওঠার আগেই ধরা পড়ে গেলেন। ওরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এইবার, লুকিয়ে লুকিয়ে কি হচ্ছিল শুনি!' রুবি স্নেহলতাকে উঠতে দিল না। দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। বলল, 'না ঠাম্মি, তোমাকে আজ গাইতেই হবে।'

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে বাকীদের ডাকছে, 'সবাই এখানে চলে আসুন, দিদা গান করছে।'

'এই, এই কি হচ্ছে, ছাড় আমাকে।' স্নেহলতা কেমন বিব্রত ও সঙ্কোচ বোধ করছিলেন।

'না না, ওসব হচ্ছে না, তোমাকে আজ গাইতেই হবে।' রুবি জোর করল।

'আমি আবার গান জানি নাকি রে!'

বিউটি রীণা এসেও ততক্ষণে পাশে দাঁড়িয়েছে। রীণা খুশিতে হাততালি দিতে দিতে বলল, 'কি মজা, দিদা গান গাইছে!'

'হ্যাঁরে, তোর দিদা একসময় নামকরা গাইয়ে ছিল।' বাসনা শোভনার দিকে এবার তাকিয়ে বলল, 'বসো বউদি।'

'আজ আর ছাড়া পাবে না কাকীমা।' অঞ্জলি হাসতে হাসতে ওদের পাশে এসে ধপ্ করে বসে পড়েছে।

মৃন্ময়ী মুখ টিপে টিপে হাসছে। শোভনা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কিরে ছোট, হাসছিস যে, এদিকে এসে বস।'

'এ মা, হাসছি কোথায়!' বলতে বলতে এবার একটু জোরেই হেসে ফেলল ও। শোভনার গা ঘেঁষে এসে বসল।

'বসে যা রে জয়ন্তী, মা এবার গাইবে।' বাসনা জয়ন্তীকে টান দিয়ে বসিয়ে দিল।

কৃষ্ণা অঞ্জলির পাশে এসে বসেছে। ওর ম্লান মুখেও এখন সামান্য হাসি। কাকীমা আজ আর এদের কাছে ছাড়া পাবে না।

'ও কি, দিদাকে এবার তোমরা ছেড়ে দাও। ভয় নেই রে, গাইবেন।' শোভনা রুবিকে বলল।

রুবি বিউটি রীণা কল্যাণী মৈত্রেয়ী অন্যদিকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে।

'আঃ দিদা, দেরি করছ কেন আর, তোমার পরে আরো অনেকে যে গাইবেন!'

'তোরা না এক-একটা বিচ্ছু হয়েছিস।' স্নেহলতা এবার হেসে ফেলেছেন।

'আমার মা অত বাজে গান করে না রে।' বাসনা হাসল।

'সেজন্যেই তো শুনতে চাইছি।' বিউটি ওরাও হেসে উঠল।

'এখন তো গান মানে, তোমাকে কবিতায় মনে পড়ে রুবি রায়।' জয়ন্তীর কথা শুনে হেসে উঠেছে সবাই।

হাসতে হাসতেই বাসনা ফের বলেছে, 'এটা তো তবু সওয়া যায় রে, আরো যা সব আছে না!'

শুভ এসে একপাশে বসল। প্রবীরের পাঁচ বছরের মেয়ে তুলতুল কেমন অবাক হয়ে গেছে এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে। ও-ও হেসে হেসে হাতে তালি দিল।

'তুই আমার কাছে আয় তুলতুল।' কল্যাণী আদর করে ওকে টেনে নিল।

'এটুকু মেয়ের কি হাততালি দেখ!' শোভনা মৃন্ময়ীকে আস্তে করে ঠেলা মারল।

'পাকা বুড়ী!'

এমন সময় হইচই করতে করতে শঙ্কর টিটো বুবাই এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে এসে এমন একটা পরিবেশ দেখে সামান্য অবাক হলো যেন। পরমুহূর্তেই শঙ্কর জোরে হেসে উঠল, 'এমা, ঠাম্মি গান করছে রে!'

'আগে এদিকে এসো তুমি, কথা বলো না।' শোভনা ডাকল ওকে।

'ঠিক আছে, আমি একটা গান করছি তোমরা শোন!' বলে কারো বলার অপেক্ষা না রেখেই ভুরু নাচিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে ও গেয়ে উঠল, 'তুমি গিন্নী কবে হবে!' শঙ্কর টেবিলের ওপর তাল ঠুকে জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল।

টিটোও আর সময় নিল না। হাতদুটো তুলে নাচার ভঙ্গি করে ও-ও ততক্ষণে গাইতে শুরু করে দিয়েছে, 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না··· ।'

'কি হচ্ছে ভাই, তুই ভারী অসভ্য হয়েছিস।' রুবি হাসতে হাসতে উঠে এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল।

সবাই তখন হেসে গড়াগড়ি।

'আমার দাদাভাই তো দেখছি খুব ভাল গান করতে শিখেছে!' স্নেহলতাও হাসি আটকে রাখতে পারছেন না।

'বংশের ধারা যাবে কোথায়!' হেমলতাও হেসে ফেলেছেন।

মণিময় এসে ঘরে ঢুকেছে, 'কি হলো, অত হাসি কেন?'

'ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা।' রুবি তখনও হাসছে।

'একজন গিন্নী, আর একজন ভজহরি মান্না। দুটোতে বেশ শুরু করেছিল, তোমরা সব মাটি করে দিলে তো!' বাসনা হাসি হাসিমুখে বলল।

মণিময় হাসতে হাসতে এবার ওদের ডাকল, 'এই, তোমরা

যারা যারা বাইরে আছ, সব চলে এসো এদিকে। গানের আসর শুরু হবে এখন।'

'আমরা এখানেই আছি দাদাভাই, এখান থেকেই শুনতে পাব।'

এমন সময় ক্ষীরোদবাবু চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন। সবার মুখের ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর স্নেহলতার দিকে চেয়ে বললেন, 'কে গাইছে, তুমি?' পরক্ষণেই হেসে ফেলে কৌতুকের গলায় বললেন, 'ভাল করে গেয়ো গো। অনেক শ্রোতা পেয়ে গেছ আজ।'

'আপনি বসুন কাকাবাবু।' শোভনা উঠে একটা চেয়ার দিতে গেল।

'আরে তুমি বসো, আমি বসব না। আমি পাশের ঘরে আছি, একটু জোরে গেয়ো, তাহলেই শুনতে পাব।' ক্ষীরোদবাবু হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

'আর দেরি করছ কেন দিদা?'

'তোরা যা করছিস না!' স্নেহলতা এবার যেন কিছুটা সহজ হয়ে এলেন। তিনি একবার সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে আনলেন।

শোভনা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাকে যখন এরা ছাড়বেই না, তখন গেয়েই ফেলুন।'

'তোমরা তো জান না, আমার কাকীমা একসময় দারুণ গাইয়ে ছিল।' মণিময় সিগারেট ধরাল।

শঙ্কর বারান্দায় চলে গেছে।

'তবে হারমোনিয়ামটা এনে দে।' স্নেহলতা সরে এসে বসলেন।

হারমোনিয়াম আনার পরও কিছু সময় কাটল। মণিময় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে।

স্নেহলতা মনে করে নিচ্ছিলেন কি গাইবেন।

মণিময় বলল, 'গাইবেই যখন কাকীমা, তখন তোমাদের সময়কার প্রাচীন বাংলা গান গেয়ো।' ও সিগারেটে টান দিয়ে কি ভেবে স্নেহলতার মুখের দিকে তাকাল। ছোট করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ওসব গান তো আর শুনতেই পাই না এখন।'

'আমার কি আর সব পদ-টদ মনে আছে!' স্নেহলতা দু-একবার ছোট করে কেশে নিলেন। একটু পরে শুরু করেন, 'মনোহরা নয়ন তোমার বিধুমুখী প্রাণ / গগনশশী লজ্জা পাইল হেরে তো বিধুবয়ান।'

'আহা!' মণিময় তারিফ করে রুবিদের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখ দেখ, গানের কী কাজ একবার দেখ!'

কেউ আর কোন কথা বলল না। ওরা অবাক হয়ে গেছে। একসময় যে স্নেহলতা সত্য সত্যই ভাল গাইতেন এটা বুঝতে পেরেছে সবাই।

স্নেহলতা আবার শুরু করলেন, 'দেখে তোর (ওই) চঞ্চলতা খঞ্জন না তোলে মাথা / নলিনী লুকালো কোথা সে সলিলে না পেয়ে স্থান।' গান শেষ করে স্নেহলতা মৃদু হেসে বললেন, 'আগের মতন আর সুর-টুর নেই। চর্চা না করলে যা হয় আর কি!' তারপর মৈত্রেয়ী, রুবির দিকে চেয়ে স্নেহলতা বলেন, 'কিরে, শুনলি তো!'

'এখনও কী সুন্দর তুমি গাও দিদা!' মৈত্রেয়ী অবাক হলো।

'ওই গানটা একবার কর না মা!' জয়ন্তী তাকাল।

'কোনটা রে?' স্নেহলতাও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'ওই তো, তুমি যা কর, তা কর হরি…।'

'মনে আছে কিনা কে জানে!' বলে স্নেহলতা হারমোনিয়াম বাজালেন কিছুক্ষণ। পরে গাইতে শুরু করেন, 'তুমি যা কর, তা কর হরি / আমি তো চলিলাম জলে / বড় লজ্জা পাবে হে শ্যাম /

দাসী তব লজ্জা পেলে।' এর পরের কথাগুলো তো মনে পড়ছে না।
স্নেহলতা জয়ন্তীর দিকে চেয়ে শুধোল, 'তারপর যেন কি?'

'লয়ে বারি…।' জয়ন্তী কথার মুখটা ধরিয়ে দিল। স্নেহলতা আবার গেয়ে চলেন, 'লয়ে বারি ছিদ্র ঘটে / যদি কোন ছিদ্র ঘটে / গলাতে ঘট বেঁধে ঘাটে / (আমি) ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।' স্নেহলতা গান শেষ করে উঠে এপাশে এসে বসলেন। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। আজকাল আর দম থাকে না।

'এই হলো গিয়ে বাংলা গান, যেমন এর কথা, তেমনি সুর।' মণিময়ের বুকটা যেন খুশিতে ভরে উঠেছে।

'দারুণ গেয়েছেন কাকীমা!' শোভনা মুগ্ধ চোখে একবার দেখল। বলল, 'এখনও কী মিষ্টি গলা!'

মণিময় হাত নেড়ে নেড়ে শেষের কটা শব্দ নিয়ে সুর ভাঁজল।

'এই সেরেছে। বড়মামার আবার কি হলো!' মৈত্রেয়ী ফিক করে হাসল।

'একদম হচ্ছে না দাদাভাই।' বাসনা মাথা নাড়ে।

'একেবারে বন্যার গানের মতন শোনাচ্ছে।' মৈত্রেয়ী হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল।

ওর কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে ফেলেছে। মণিময়ও হাসতে থাকে।

বারান্দায় কে যেন হাততালি দিল।

'এবার তোরা গা, আমি শুনি।' স্নেহলতা বলেন।

'কিরে জয়ন্তী, হবে নাকি?' মণিময় সহাস্যে শুধোয়।

'না বাবা, আমি না।'

মৈত্রেয়ী হঠাৎ রুবির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এই, তোর প্রণবকাকু না ভাল গায় বললি!'

'গায়ই তো, তুমি বল গিয়ে।' রুবি হাসল।

'কি বলছিস রে?' মণিময় মেয়ের মুখের দিকে তাকায়।

রীণা হেসে বলল, 'দিদিভাই না, প্রণবমামার গান শুনবে বলছে।'

'প্রণব গান জানে নাকি?' অঞ্জলি তাকায় একবার।

'হ্যাঁ, ও ভালই গায়।' মণিময় হাসিমুখে বলে, 'যা, ওকে ডেকে আন এখানে।'

'নাঃ, কেমন জুড়িয়ে গেল আসবটা।' শোভনা বলে।

মৈত্রেয়ী গিয়ে প্রণবকে ডেকে নিয়ে এলো। বাইবে তখন ঝড়ো বাতাস ছুটছে। মণিময় এবাব বাবান্দায় উঠে গিয়ে ওদেব ডাকল, 'তোমরা ভেতবে এসে বসো না।'

'বেশ ছিলাম তো এখানে।'

'প্রণব এবার আমাদেব আর্টিস্ট, ভেতবে বসে না শুনলে হয়!' মণিময় হাসল।

'তবে তো যেতেই হয়, চল হে প্রবীব।' মিহিব উঠে পড়ল, তারপর সুব্রতর চোখে চোখে চেয়ে বলে, 'আপনি আর কি করতে থাকবেন, আপনিও ভেতরে চলুন সুব্রতদা।'

'ঠিকই তো, তোমবা সবাই চলে গেলে আমি আর একা একা কি করতে থাকব।'

ওরা এসে ঘরে বসল। এলোমেলো হাওয়া ঢুকছিল। দবজা বন্ধ করে দিল।

'বেশ তো চলছিল; আবার আমাকে কেন?' বলতে বলতে প্রণব হারমোনিয়ামের কাছে এসে বসল।

'আপনি গান তো আগে, শুনছি যে এই ঢের।' শোভনার মুখে সপ্রশংস হাসি।

'ভাল না লাগলেও কেউ কিন্তু উঠবেন না।' প্রণব হাসছিল অল্প অল্প।

'এ আবার কি কথা রে।' কল্যাণী মৈত্রেয়ীর গায়ে চিমটি কাটল। মৈত্রেয়ীও পাল্টা চিমটি দিল।

'কি গাইব বলুন!' প্রণব হাসি হাসি চোখে তাকাল।

'তোমার যা খুশি গাও না।' কৃষ্ণা অনেকক্ষণ পর কথা বলল। বুবাই আর টিটো এসে প্রণবের কাছে বসল।

'নজরুলগীতি চলবে ?'

'নিশ্চয়ই চলবে।' মিহির যেন এতে একটু বেশী উৎসাহ বোধ করছিল।

প্রণব আর কোন ভূমিকা না করে শুরু করে দিল, 'মুসাফির! মোছ্‌রে আঁখিজল / ফিরে চল আপ্‌নারে নিয়া / আপনি ফুটেছিল ফুল গিয়াছে আপ্‌নি ঝরিয়া / রে পাগল!'... প্রণব গান শেষ করল।

কারো মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। প্রণবের সুরেলা ভরাট গলা। কোথাও কোন খুঁত নেই। গানের রেশ যেন তখনো ঘরময় ছড়ানো।

'থামবেন না, পর পর গেয়ে যান।' মিহির বলল।

ক্ষীরোদবাবু এ-ঘরে এলেন। একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'বেশ গলাটি তো, অনেকদিন পরে শুনলুম এ গান।'

প্রণব একটু পরে রুবিকে বলল, 'আমার ব্যাগে ছোট্ট একটা নোটবুক আছে, ওটা নিয়ে এসো তো, ওটাতে অনেকগুলো গান লেখা আছে।'

'আমাদের দেশের এসব গানের ট্র্যাডিশনও বহুকালের।' ক্ষীরোদবাবু বললেন।

প্রণব হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে মুচকি হেসে শোভনার দিকে তাকাল, বলল, 'কি বউদি, চলবে ?'

শোভনা আস্তে করে হেসে হেসে জবাব দিল, 'হয়েছে, আর ওস্তাদি করতে হবে না।'

রুবি নোটবুক নিয়ে এসেছে। প্রণবের হাতে দিয়ে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসল ও। হঠাৎ প্রণবের চোখ কল্যাণীর ওপর পড়ল।

দেখল ওর চোখে-মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। একদৃষ্টে তার দিকে ও চেয়ে রয়েছে। কি ভেবে একটু হাসল প্রণব। তারপর পাতা খুলে শুরু করে, 'এ আঁখিজল মোছ পিয়া, ভোলো ভোলো আমাবে / মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে।'...

এটা শেষ করে কিছুক্ষণ সময় নিল প্রণব। পবে আবার একটা ধরল, 'সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি তরুণ বিবাগী।·

বাইরে তখন ঝড উঠেছে। গান শেষ হলে দবজা খুলে মিহিব মণিময় বাইরে এলো। 'এই বে, জানলা খোলা রয়েছে, সব ভিজে গেল আজ।' শোভনা ব্যস্ততা নিয়ে উঠে পডল। বাসনা অঞ্জলিও উঠে পডেছে। মৃন্ময়ী অন্য ঘরে চলে গেল।

'এবার চা খাওয়াও কল্যাণী।' প্রণব হাসি হাসি চোখে একবাব তাকাল ওর দিকে।

'ওদের এবার খেতে-টেতে দে।' স্নেহলতা চলে যাওয়াব আগে প্রণবকে বললেন, 'চমৎকাব গেয়েছ, গলাটা খুব ভাল তোমার।' স্নেহলতা ভেতরে গেলেন। হেমলতাও আব বসে থাকলেন না।

কৃষ্ণা হাসিমুখে বলল, 'আগের চেয়ে আজ যেন আবো ভাল গেয়েছ, শেষের গানটা তোমার দাদার খুব প্রিয় ছিল।' বলতে বলতে ওর মুখের হাসিটা মুহূর্তে যেন কেমন ম্লান হয়ে এলো।

'গান-টানেরও চর্চা আছে দেখছি!' প্রবীর হাসল।

সুব্রত অন্য ঘবে গেল। ছেলেমেয়েরাও যে-যার মতন আবাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

'জানেন প্রণবকাকু, রাঙাপিসী বলছিল, আপনি নাকি এমন কিছু একটা গান না।' কবি হাসতে লাগল।

'ঠিকই বলেছে।'

কল্যাণী যেন লজ্জা পেল হঠাৎ, 'না না, ওর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না তো, আমি মোটেই তা বলি নি।'

'ওমা, আবার কী মিথ্যে কথা শিখেছে রাঙাপিসী, দিদিভাই তো সামনেই ছিল, বলে নি ?'

মৈত্রেয়ী হাসছিল।

প্রণব কল্যাণীর দিকে চেয়ে হাসল।

মৈত্রেয়ী আরো কাছে এসে দাঁড়াল। প্রণবের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, 'ভালই গেয়েছেন।' পরে ওদেব দিকে চোখ ফিবিয়ে বলল, 'জলসাটা এবার তাহলে পাকা তো ?'

'পাকা, পাকা।' রুবি বিউটি হাত তুলে সমস্বরে বলল। কল্যাণীও হাত তুলতে তুলতে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'তোমরা জলসা করছ নাকি ?' প্রণব তাকাল।

'আপনিও আছেন।' কল্যাণী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের জন্যে এক-আধটা হবে না আব ?'

'একবাবেই স্টক ফুবোতে নেই।'

'আবো হবে নাকি ?' কল্যাণী চোখে চোখে চেয়ে আছে।

'উহুঁ।' তারপর গুনগুন করে গাইল, 'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায় / আমি যে গান গেয়েছিলেম, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।' প্রণব গান থামিয়ে হাসতে লাগল।

কল্যাণী আস্তে করে বলে, 'ভয় নেই, কেউ ভুলবে না, ভুলবে না।'

প্রণব নোটবুকটা কল্যাণীর হাতে দিয়ে বলল, 'রেখে দিও।'

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে মধুর ভঙ্গি করে তাকায়, কাল আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন, খুব মজা হবে।'

'লিস্টে তাহলে আছি ?'

'নিশ্চয়ই, এবং টপে আছেন।' মৈত্রেয়ী যেন একটু অন্যরকম চোখে তাকাল।

প্রণব মুচকি হেসে বাইরে এলো। আকাশ কুচকুচে কালো

হয়েছে। বড় বড় গাছগুলোর মাথায় মাথায় হুড়োহুড়ি শব্দ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টিও শুরু হলো এবার। একটা সিগারেট ধরিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রণব একসময় গেয়ে উঠল, 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে ।'

মণিময় চোখে চোখে তাকায়, 'খুব যে ঝরো ঝরো, কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার ওই দেখুন।' প্রণব আঙুল দিয়ে আকাশটা দেখায়।

একটা কালো মেঘ শন শন করে তখন ছুটে আসছে।

'দাঁড়াও, কাকীমাকে এই বেলা বলে আসি আজ স্রেফ খিচুড়ি।'

সকলেই হেসে উঠল।

আট

বুদ্ধিটা শোভনাই দিয়েছিল, তাই ভোর-ভোর বেরোনো গিয়েছে। ভাল করে আলো ফুটতে না ফুটতেই মৈত্রেয়ী কল্যাণীকে ঠেলে তুলল। রুবি, বিউটিও ঝটপট উঠে পড়েছে। চোখ-মুখে জল দিয়ে শাড়ি-টাড়ি পরে নিল ওরা। মৃন্ময়ীকেও প্রবীর আগেই বলে রেখেছিল। ওর তাড়াতে প্রবীরও উঠে পড়ল। না হলে অত তাড়াতাড়ি ঘুমই ভাঙত না ওর। তুলতুলটা রাতভোর চিৎকার করেছে। সেজন্যে ওদের অনেকবার উঠতে হয়েছে। ভোরের দিকে মেয়েটা ঘুমিয়েছে। সেই অবসরে প্রবীরেরও ভীষণ ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মৃন্ময়ী আর ওকে ঘুমোতে দিল না। মিহির প্রণবও সময় মতন বিছানা ছেড়েছে। শোভনা আরো আগে উঠেছে। স্টোভ ধরিয়ে সবাইকে চা করে দিল। ক্ষীরোদবাবু উপাসনা-ঘরে ঢুকেছেন। ভোরে ওঠা স্নেহলতার রোজকার অভ্যেস। আজ যেন তারও আগে উঠেছেন। মহাষ্টমী পুজো, চান করে মণ্ডপে যেতে হবে। হেমলতা উঠে এসে চেয়ারে বসলেন। স্নেহলতা পাশে। শোভনা চা ঢালতে ঢালতে প্রবীরের দিকে চেয়ে বলেছে, 'এই বেলা বেরিয়ে পড় ঠাকুরপো, ওরা জেগে গেলে কিন্তু যাওয়া হবে না আর, এতগুলোকে পরে সামলাতে পারবে না।'

মণিময় গায়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আর দেরি করছিস কেন?'

প্রবীর হাসল একটু, 'তুমিও চল না দাদাভাই!'

'পাগল হয়েছিস, এই ঠাণ্ডায়?'

মিহির চোখে চোখে তাকাল, 'কোথায় ঠাণ্ডা!'

'নারে ভাই, এমনিতেই আমার ঠাণ্ডা লাগার ধাত, তার ওপর

সাইনাসে ভুগছি।' মণিময় সিগারেট হাতে নিয়ে আবার বলল, 'তোমরা ঘুরে এসো।'

শোভনা হেসে হেসে বলল মিহিরকে 'একবারে শিক্ষা হলো না, আবার আপনার দাদাকে নিতে চাইছেন।'

মণিময় হাসছিল, 'দেখলে তো, তোমাকে ছাড়া আমি সুযোগ পেয়েও গেলাম না।'

'থাক।' শোভনা মিহির এবং প্রণবের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'আর দেরি করছেন কেন, বেরিয়ে পড়ুন।'

প্রণব মিটিমিটি হাসল, 'বউদি দেখছি, চা-টা-ও খেতে দেবেন না।'

'ওরা উঠে পড়লে টের পাবেন, আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি।'

রুবি প্রবীরের হাত ধরে টানল, 'আর চা খেতে হবে না, এসো তো কুট্টিকাকু।' পরে হাতটা ছেড়ে দিয়ে মৈত্রেয়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে বলল, 'শুভদা যাবে বলেছিল যে।'

'এখনও যখন ওঠেনি, ছেড়ে দে।'

'উঠে আমাদের না দেখলে ভীষণ মন খারাপ করবে ; আমি ডেকে তুলি গিয়ে।'

'সাবধানে ডাকিস, কেউ টের না পায় যেন।'

রুবি মাথা হেলিয়ে চলে গেল।

কল্যাণী সাজগোজ সেরে সেখানে এসে দাঁড়াল।

মিহির ওর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এতক্ষণে ম্যাডামের মেক-আপ শেষ হলো ?'

মণিময় ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এই সকালেই যা একখানা ড্রেস মেরেছিস না।'

শোভনা হাসছিল, বলল, 'দেখতে তো ভালই লাগছে।'

মণিময় সিগারেট খেতে খেতে কল্যাণীর দিকে আবার তাকাল, বলল, 'এই, তুই যাচ্ছিস যে।'

'মাসি না হলে তো অর্ধেক আনন্দই মাটি!' মৈত্রেয়ী বলল।

কল্যাণী চোখ টান-টান করে হাসল, 'দেখছ তো দাদাভাই, আমার ডিমাণ্ডটা কি রকম?'

'ডিমাণ্ড তো তোর বরাবরই, এখন দেখছি আরো বেড়েছে!' মণিময়ের কথার তলায় অন্য এক মজা ছিল যেন।

'দাদাভাইটা ভীষণ—।' কল্যাণী ক-পা এগিয়ে এসে আস্তে করে একটা ঠেলা দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসল একটু।

'এবার চল ম্যাডাম!'

প্রবীর মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে সহাস্যে বলল, 'লিস্টের বাইরে কেউ নেই?'

'না।'

ওরা গিয়ে গাড়িতে বসল।

মণিময়রা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সাবধান করে দিয়ে মণিময় বলল, 'হুড়োহুড়ি করবি না, রোদ চড়লে নামবি। সকালে পাথর ভেজা থাকে কিন্তু, একবার হড়কালে আর দেখতে হবে না।'

'বড়মামার কী ভয়!' মৈত্রেয়ী হাসছিল কথা শুনে।

'ভয় কি আর এমনিতে!' পরে প্রণবের মুখের দিকে চাইতে চাইতে মণিময় বলল, 'সাবধানে নিয়ে যেও।'

প্রণব হাসল, 'আমরা আছি, কিছু হবে না।'

মিহির প্রণব সামনে বসেছে। প্রবীর গাড়ি চালাবে।

পেছনের সীটে ওরা ঠাসাঠাসি করে বসেছে। রুবি হাসতে হাসতে বলল, 'দিদিভাইটাই দুজনের জায়গা নিয়ে নিয়েছে।'

বিউটি বলল, 'সেজন্যেই তো বসতে এত কষ্ট হচ্ছে।'

শুভ একপাশে, জড়সড় ভাঙ্গি। তারপর রুবি বিউটি মৈত্রেয়ী কল্যাণী।

'দরজাটা লক করা তো?' প্রবীর পেছনের দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ, লক করা।' কল্যাণী হাত বাড়িয়ে আর একবার দেখে নিল।

শুভ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে। রুবির বুকের অনেকখানি জায়গা ওর শরীর ছুঁয়ে রয়েছে। রুবির যেন কোনরকম খেয়াল নেই সেদিকে। ও হাসছে। পিঠময় ছড়ানো চুলের কিছু কিছু চুল শুভর মুখে এসে উড়ে পড়ছে। রুবির শরীরের এক অদ্ভুত গন্ধ ওর নাকে লাগছে। বুকের মধ্যে দুরদুর শব্দ। অস্বস্তি বোধ করছিল শুভ।

বিউটি উসখুস করে বলল, 'ওদিকে একটু চেপে বস না।'

সামান্য সরে এসে রুবি বলল, 'কোথায় চাপব, এদিকে আর জায়গা নেই।'

রুবি শুভর গায়ের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ, আঁটো হয়ে এসেছে।

শুভ যেন একটু নড়ে উঠল। শুকনো, সামান্য জড়ানো গলায় বলল, 'আমি বরং উঠেই যাই, সামনে গিয়ে বসি।'

রুবি শাড়ির আড়াল দিয়ে ওর হাতটা ধরে ফেলল, 'এই, উঠছ কেন, আমরা তো বসেই গেছি।'

মণিময় হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'আমি ছোট মতন আর একটা ঘুম দিয়ে নিই গিয়ে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল। সকালের কুয়াশা তখন একটু একটু করে সরতে শুরু করেছে।

মিহির বলল, 'খাবার-টাবার কিনে নিতে হবে, না খেয়ে নিচে নামা যাবে না।'

'বাজারের ওখান থেকে কিনে নিলেই হবে, অনেকগুলো ভাল দোকান আছে ওখানে।' প্রবীর হেসে বলল।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে মিহির আর প্রণব নেমে এলো। মিহির সামনের একটা খাবারের দোকানে এসে সিঙ্গাড়া জিলিপি কালাকাঁদ প্যাড়া কিনল। প্রণব এপাশে এসে বাজার থেকে কলা আর

পাউরুটি কিনেছে। দু-প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই কিনে নিল।

আবার গাড়ি ছেড়েছে। মেন রোড ছেড়ে দিয়ে এবার ওরা পুরুলিয়া রোড ধরল। প্রণব দুপাশের ছবিগুলো গভীর মমতা দিয়ে দেখছিল। কতকাল এসব ছেড়ে সে চলে গেছে! ডানপাশে ওর স্কুল, কলেজ। এখানেই তার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। অথচ আজ এ জায়গা ওকে আর চিনবে না। অনাত্মীয়ের মতন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যাঁদের কাছে সে পড়েছে, তাঁরাও কি এখনো সবাই আছেন? সামনে গিয়ে দাঁড়ালে চিনতে পারবে তো! বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন গুরগুর করে উঠল।

কলেজের পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রবীর বলল, 'আমাদের কলেজ প্রণব।'

'দেখেছি।' একটু চুপ করে থেকে প্রণব ধীরে ধীরে ওর দিকে তাকাল, 'বেশ ছিলাম কিন্তু তখন!' কি ভেবে পরক্ষণেই আবার শুধোয়, 'আচ্ছা—, প্রফেসর গোমেস, ডিরোজিও এখনও আছেন?'

প্রবীর মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ঠিক বলতে পারব না, এদিকে আমারও তো আর আসাই হয় না।'

রোদ এসে মুখে পড়ছিল। বেশ লাগছে। এখন একটু ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে ওরা। রাস্তার দুপাশে কখনো কখনো ছোটখাটো জঙ্গল পড়ছিল। ছোটবড় নানান জাতের সব গাছ, ঝোপঝাড়। পাখিরা কিচির মিচির করছে। রাস্তার ওপর মুরগীর ছানাপোনা ছুটোছুটি করছে। মাটির বাড়িঘরও চোখে পড়েছে। উঁচু-নিচু পথ। মাঝে মাঝে দুপাশের ধানের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। কখনো কখনো গম সরষের জমিও নজরে পড়ছে।

প্রণব সিগারেট ধরাল, মিহিরও। প্রবীরকেও একটা দিল।

মৈত্রেয়ী বলল, 'আমাদের খিদে পেয়ে গেছে!'

প্রবীর হাসল, 'আমারও একটু একটু পেয়েছে মনে হচ্ছে।'

'তবে আর কি, ছুটো ছুটো করে হয়েই যাক।' মিহির সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা খুলতে খুলতে আবার বলল, 'এখনও বেশ গরম আছে, পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বলে মিহির ওদের জন্যে ছ-টা রেখে দিয়ে, ঠোঙাটা কল্যাণীর হাতে দিল, বলল, 'তুমি এবার ভাগ কর ম্যাডাম।'

'ছুটোর বেশী কেউ নিবি না, আবার খিদে পাবে দেখবি। প্রবীর বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে সিঙ্গাড়া মুখে পুরল।

রুবির খেতে ইচ্ছে করছিল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতে নিয়েছে। একটা শুভর দিকে বাড়িয়ে দিল, বলল, 'নেবে? সিঙ্গাড়া ভাল লাগে না আমার।'

শুভ সলাজ চোখে রুবিকে একপলক দেখে নিয়ে বলল, 'আমি খাব না, খেয়ে নাও না।'

রুবি ওর হাঁটুর ওপর হাতটা রাখল।

'না খেলে আমাকে দে।' মৈত্রেয়ী হাত বাড়াল।

রুবি হাসতে হাসতে বলল, 'অত খেয়ো না দিদিভাই।'

কল্যাণী বলল, 'তুই অন্য কিছু খাবি?'

রুবি মাথা নাড়াল, 'না, আমার খেতে এখন ইচ্ছেই করছে না।'

নামকুমের কাছাকাছি এসে প্রণবের বুকটা হঠাৎ কেমন ধড়াস করে উঠল। ডানপাশেই মহাদেবী স্যানেটোরিয়াম, এখানেই তার বোন ছিল। বাঁচবার জন্যে কতই না ছটফট করেছে ও, তবু বাঁচানো গেল না ওকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল প্রণবের। কত বদলে গেছে সব! জায়গাটা পেছনে পড়ে গেল একসময়। বাণীর করুণ, পাণ্ডুর মুখটা চোখের সামনে খানিকক্ষণ ভেসে থাকল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো এবার। কত কথা মুহূর্তে না মনে পড়েছে! মুখের ওপর গভীর বিষাদের একটা ছায়া পড়েছে। সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। তাপ লাগায় খেয়াল হলো। টুকরোটা ফেলে দিল।

মিহির মৃদু একটা ঠেলা দিল, 'কি ভাবছেন অমন গম্ভীর হয়ে?'

'না, কিছু না।' প্রণব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে ম্লানভাবে হাসল।

'ভাবছিলেনই তো!' পেছন থেকে কথাটা বলে হাসছিল কল্যাণী।

'আর ভাবলেই বা তোমাকে সব বলবে কেন মাসি?' মৈত্রেয়ী ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসে।

প্রণব কী যেন ভাবল একটু সময়। তার চোখে-মুখে কী এক আবেগ ছড়িয়ে রয়েছে তখনো। সহজ হওয়ার চেষ্টা করেও আড়ষ্ট, আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি এখনও কাটাতে পারেনি প্রণব। একটু পরে আস্তে আস্তে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। কেমন যেন একটু অসহায় করুণ দেখাচ্ছে ওকে। যতটা সম্ভব সংযত গলায় বলল, 'ওই যে স্যানেটোরিয়ামটা দেখলে, ওখানে—' প্রণব চোখ আনত করেছে, 'ওখানে আমার এক বোন মারা গেছে, অথচ শেষ মুহূর্তেও ও বিশ্বাস করেছে ও বাঁচবে; আমরা ওকে বরাবরই এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছি। ওর চোখের সেই আকুল চাউনি এখনও আমি ভুলতে পারি না।' প্রণব কণ্ঠটাকে সংগোপনে আবার সামলাচ্ছে যেন।

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না। সমস্ত পরিবেশটাই হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে উঠেছে।

একটু পরে সহানুভূতির গলায় প্রবীর বলল, 'ভেবে আর কি করবে বলো।'

মিহির প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বলল, 'এর আগে তো এদিকে এত ফ্যাক্ট্‌রী ছিল না।'

প্রবীর তাকাল, 'দিন দিনই কলকারখানায় ভরে যাচ্ছে।'

কল্যাণী মধুর ভঙ্গি করে মিহিরের দিকে তাকাল, 'রাঁচীর ইম্পর্টেন্স এখন অনেক বেড়ে গেছে, বুঝলেন!'

মিহির হাসি হাসি চোখে ফিরে তাকাল, 'তোমার ডিমাণ্ডের মতন নাকি?'

প্রণবও হালকাভাবে হাসল এবার। সে এতক্ষণে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। একটু পরে আবার বলল, 'এগুলো এখানকার বিউটিই নষ্ট করে দিয়েছে। এখনও চেনা যায়, পরে তাও যাবে না।'

'কত কলকারখানা হয়েছে, হাইটেনসান ইনসুলেটর ফ্যাক্ট্রী, মিলিটারি ডেয়ারি ফার্ম, উষা মার্টিন ব্ল্যাক, ছোটনাগপুর ফ্লাওয়ার মিল, সিবামিক ইনস্টিটিউট, অ্যালুমিনিয়ম ফ্যাক্ট্রী, না, আর গোণা যাবে না।' মিহির একের পর এক গুণে গুণে এখন ক্লান্ত।

'গুণে শেষ হবে না, এখনও তো কত বাকী : পাঁচ বছর পবে এসে দেখবে, এসব জায়গার চরিত্রই পুরোটা বদলে গেছে।' প্রবীর হাসতে হাসতে মিহিরেব দিকে তাকাল একবার।

মিহিব আফসোসের গলায় বলল, 'এমন সুন্দর একটা হিল-স্টেশন, শেষে কি না, ব্যবসায়ীদের খপ্পবে পড়ে গেল!'

'এটা কি বলছ মিহিরদা, এখানে এখনো যে কত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, লোকে তার হদিশ রাখে না, এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে না!' একটু নীরব থেকে প্রবীর ফের বলতে লাগল, 'দেশের ইণ্ডাস্ট্রি এখন বাড়ানো দরকার। অন্য দেশেব তুলনায় এখনও যে আমরা কত পিছিয়ে আছি না!'

মিহির বলল, 'ইণ্ডাস্ট্রি বাড়লেই কিরে ভাই আর জাত এগোয়, তাব জন্যে অন্য জিনিস দবকাব!'

প্রণব হাসল একটু, 'দেশের ইকনমিক স্ট্রাকচারটা তো দিন দিনই ভাঙছে।'

'আমরা যদি সবাই খারাপ হই, তবে কাকে আর দোষ দেব।'

মিহির অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রবীরকে দেখল একপলক, বলল, 'দেশের কথা, কে যে কত ভাবছে জানা আছে!'

রোদে রোদে সব ভেসে যাচ্ছে এখন। ঝকঝকে সকাল।

প্রবীর গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। পেছন ফিরে একবার দেখল, 'কিরে, তোরা যে কোন কথা বলছিস না!'

মৈত্রেয়ী হেসে জবাব দিল, 'দেখেই শেষ করতে পারছি না, তা আবার কথা!'

'কি দেখছিস অত?' প্রবীর হেসে পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'আগে কোনটায় যাবি, হুড্রো, না জোনা?'

কল্যাণী বলল, 'হুড্রো।'

একটু পরে ওরা ডানপাশের রাস্তা ধরল। এটাই হুড্রো রোড। মাঝে মাঝে আদিবাসীদেব পাড়া, তারপর ফাঁকা রাস্তা। দুপাশে গভীর শালবন। হুট করে আবার একটা গ্রাম। আবার আঁকাবাঁকা অসমান পথ। এদিকের জঙ্গল খুব ঘন।

প্রবীর গলায় কৃত্রিম ভয়ের ভাব এনে বলল, 'জানিস তো, এসব জঙ্গলে কিন্তু বাঘ আছে। যখন-তখন এসে লাফিয়ে পড়তে পারে।'

'ও মা, আমার কী ভয় করছে!' বিউটি নড়ে বসল।

'তোর না একটু বেশী বেশী, মনে হচ্ছে বাঘটা বুঝি তোর ঘাড়েই এসে লাফিয়ে পড়বে!' রুবি সামান্য বিরক্ত হলো। শুভর গায়ের সঙ্গে যেন ও একটু একটু করে জড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক মাদকতা। চোখে ঘোর। বিউটি যেন তা নষ্ট করে দিল।

প্রণব পেছন ফিরে তাকায়, 'সবাই নিচে নামতে পারবে তো, অনেকটা কিন্তু নামতে হবে!'

কল্যাণী চোখে চোখে চেয়ে হাসে, 'আপনারা নামবেন না?'

মিহিরও তাকাল এবার, 'নিশ্চয়ই, ম্যাডামের ইচ্ছেটা কি আমরা গাড়িতে বসে থাকি?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে আপনি একা একা গাড়িতে বসে থাকুন।' মিষ্টি করে ঠোঁট উল্টে হাসল কল্যাণী।

মিহির ওর মাথাটা টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'তাহলে বুঝি খুব সুবিধে হয়?'

'যাঃ, আপনি ভীষণ—!' কল্যাণী একটা চিমটি কেটে সরে এলো।

মিহির কি ভেবে মুখ টিপে হাসে, 'অসুবিধে হবে না, আমরা আছি।'

'আপনাবা না থাকলেই বা কি।'

'খুব যে সাহস দেখছি ম্যাডামের!'

প্রণব হাসল। কথাগুলোর ভেতরে অন্য এক অর্থ ছিল। একটু পরে ও বলল, 'ঝোপ থেকে যখন বেরিয়ে আসবে, তখন সাহস বোঝা যাবে!'

কল্যাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা আছেন কেন তাহলে ?

'আমি বাবা প্রণবমামাকে ছাড়ছি না!' মৈত্রেয়ী বলল।

'আমিও তোমাব সঙ্গে দিদিভাই।' রুবি আস্তে করে বলল। ওর গলায় যেন তেমন কোন উত্তাপ নেই। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। গায়ে তাপ।

'আমি ছোটমামাব সঙ্গে।' শুভ বলল।

'আমিও।' বিউটি তাকাল ওব দিকে।

'আমি বাদ?' কল্যাণীর চোখে চাপা হাসি।

'তুমি আমাব সঙ্গে।' মিহিব বলল।

খানিক আগেও পথেব দুপাশে লোকালয় পড়েছে। কিছু উলঙ্গ ছোটছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে দেখা গেছে। এখন শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। অনেক দূরে ঘরবাড়ি। বড়বড় শাল দেবদারু, আরও কত রকমের গাছগাছালি, লতাপাতাব ঝোপ। মোটরেব শব্দে পাখিরা উড়ে উড়ে গেল। জঙ্গল যেন ক্রমশই ঘন হচ্ছে। গাছের ডালপালা, পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন জাফরি রচনা করেছে। কোথাও কোথাও সবে অন্ধকার এবং হিম নড়েচড়ে উঠেছে।

'আমরা এসে গেছি।' প্রবীর কি খেয়ালে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল এসময়।

উঁচু-নিচু পথ কেটে ওদের গাড়ি এসে একটা জায়গায় থামল। অনেকগুলো বড় বড় গাছ এখানে আবছা এক ছায়া করে রেখেছে। সামনে পাহাড়। ঢেউখেলানো সবুজ গাছের সারি। সূর্যের আলো গাছের মাথায় পড়েছে, কেমন চকচক করছে। হিমকণা যেন এখনো এখানে পুরোপুরি ঝরে যায়নি। একটা গমগম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত।

প্রণবরা গাড়ি থেকে নামল। হাত-পাগুলো টান টান করে নিয়ে প্রণব মৈত্রেয়ীকে বলল, 'কিসের আওয়াজ বল তো?'

মৈত্রেয়ী কেমন অবাক হলো যেন। মুগ্ধ চোখে চারপাশটা দেখতে দেখতে বলল, 'কোথায় সমানে জল আছড়ে পড়ছে মনে হয়।'

'এই জল পড়াটাই আমরা নিচে দাঁড়িয়ে দেখব, এই সেই হুড্রো।'

'অনেকটা নামতে হবে, না?' মৈত্রেয়ী খুশি খুশি চোখে তাকাল।

'নামতে তো খুব একটা অসুবিধে নেই, ওঠার সময়ই কষ্ট, দম শেষ হয়ে যায়।'

কল্যাণী শাড়িটা ঠিকঠাক করে নিল।

রুবি নামতে গিয়ে কি ভেবে আড়চোখে শুভকে এক পলক দেখল। ওর মনে হলো, খুব তাড়াতাড়ি যেন ওরা এসে পড়েছে। শুভও মুচকি হেসে অন্যদিকে চোখ ফেরায়।

প্রণবরা তিনজনে তিনটে সিগারেট ধরাল।

মৈত্রেয়ী প্রণবের খুব কাছাকাছি। ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জায়গাটা কী সুন্দর, তাই না প্রণবমামা?'

'আমার তো খুব ভাল লাগে।'

কল্যাণী হাসি হাসি চোখ করল, 'নিচে গিয়ে দেখলে তো আর উঠতেই চাইবি না।'

'নামতে পারবে তো?' রুবি তাকাল।

কল্যাণী হেসে ফেলল, 'কেন পারবে না, কষ্ট হলে জিরিয়ে নেবে।'

রুবি কি মনে করে হাসল সামান্য। পরে মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, 'দিদিভাইয়েরই কষ্ট হবে বেশী।' রুবি খিল খিল করে হাসল।

'তুমিও কম না বাপু!' মৈত্রেয়ী ইশারা করে ছোটমামাকে কি যেন দেখায়। সবাই হেসে ওঠে।

দেখতে দেখতে রোদ বাড়ছিল। আরো দু-একটা গাড়ি এলো। এখানে কয়েকটা ছোটখাটো দোকানও আছে। চা দুধ, অল্পস্বল্প মিঠাইও পাওয়া যায়।

প্রবীর সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'আর দেরি কেন, এবার খেয়ে-টেয়ে নিই, নামতে হবে তো!'

'এই করতে করতেই ফিরতে দেখবে কটা বাজে।' প্রণব সিগারেট টানতে টানতে ফেব বলল, 'আমি চা খেয়ে আসি আগে।'

'আরে, আমরাও তো খাব, এগুলো আগে খেয়ে-টেয়ে পবে চা।' প্রবীর বলল।

'বলে আসি আমি।' প্রণব ফিরে তাকাল। কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে শুধোয়, 'কটা বলব?'

প্রবীর হাসল। বলল, 'চারটে বলে দাও, ওদের জন্যে দুধ বলে দিও।'

'চারটে কি হবে, আমি দুধ খাব না।' মৈত্রেয়ী মাথা ঝাঁকাল।

'আমিও চা খাব।' রুবি তাকাল ওদের দিকে।

খেতে খেতে আরো বেলা বাড়ল।

'কিরে, কি রকম লাগছে?' প্রবীর হাসি হাসি চোখে শুভর দিকে তাকায়।

'খুব ভাল।' শুভ হেসে জবাব দিল।

খাওয়া শেষ হয়েছে। প্রবীর দরজার কাচ তুলে লক-আপ করে দিল। পরে সামনের দরজায় চাবি দিল।

'সবাই জুতো খুলেছিস তো ?

'হ্যাঁ, খুলেছি।'

প্রবীর চাবির রিংটা পকেটে রেখে দিতে দিতে বলল, 'তাহলে স্টার্ট করা যাক।'

'হুঁ, স্টার্ট।' মৈত্রেয়ী আগে আগে চলতে লাগল। বিউটি ওর সঙ্গে আছে। শুভ আর রুবি একটু পিছিয়ে।

'অত হুড়োহুড়ি করিস না, সাবধানে নামিস।' প্রবীর আর একবার মনে করিয়ে দিল।

প্রবীর সকলের আগে। শুভ অনেকটা এগিয়ে গেল। রুবি খুব আস্তে আস্তে নামছে। ওর কেবল পড়ে যাওয়ার ভয়। শুভকে এগিয়ে যেতে দেখে রুবি বলল, 'শুভদা ভাল হচ্ছে না, আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছ তোমরা।'

বিউটি প্রবীরের সঙ্গে এগিয়ে গেল। শুভ দাঁড়িয়ে পড়েছে। রুবি কাছে এলে আবার হাঁটতে লাগল, বলল, 'তোমার ভয়টা একটু বেশী।'

'অত তাড়াতাড়ির কি আছে, ওরা এগোক না; আমরা আস্তে আস্তে হাঁটি চলো।'

'তুমি এসো না, আমি যাচ্ছি।' শুভ চলে যেতে চাইল।

রুবি খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলেছে। বলল, 'উহুঁ, তুমি আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।'

'আরে, এখানে ভয় নেই কিছু।'

'তা হোক, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

মৈত্রেয়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে। রুবি শুভ ওরা এগিয়ে গেল আবার।

প্রণব মিহির কল্যাণী পেছনে। ওর কাছাকাছি এসে প্রণব বলল, 'কি মৈত্রেয়ী, তুমি না আমার সঙ্গে থাকবে ?'

'এই তো আপনার সঙ্গে।' মৈত্রেয়ী চোখে চোখে চেয়ে হাসল।

'চলো, দাঁড়ালে কেন ?'

'আপনার জন্যে।' মৈত্রেয়ী এখন পাশাপাশি হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আর একটু পা চালান।' ওরা সামান্য এগিয়ে গেল।

মিহির কল্যাণী এখন সকলের পেছনে।

মৈত্রেয়ী চোখ তুলে প্রণবকে এক পলক দেখল। আস্তে আস্তে বলল, 'বুঝলেন, আজকের দিনটা আমার অনেককাল মনে থাকবে।' ওর ঠোঁটে চাপা হাসি।

'মনে রাখারই দিন।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালই হলো।'

'কলকাতায় গিয়ে তো সব ভুলে যাবে আবার।' প্রণব মৃদু মৃদু হাসছিল।

মৈত্রেয়ী ওর চোখে চোখে তাকাল এক মুহূর্ত। রাস্তার ধারের একটা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ল অকারণে। দৃষ্টি নত রেখে মুচকি মুচকি হাসছিল ও। পরে বলল, 'মনে রাখার ব্যাপারটা তো শুধু আমার ওপরই সবটা নির্ভর করে না।'

'শুনেছি, কলকাতায় বালীগঞ্জে তোমাদের বিরাট বাড়ি, ওখানে চিনবেই না আমাকে।'

'তবে তো সবই জেনে বসে আছেন।' একটু পরে হাসতে হাসতে আবার বলে, 'এলেই বুঝতে পারবেন আপনার ধারণা কত মিথ্যে। ঠিক আসবেন তো ?'

'তোমাদের ঠিকানা যে জানি না।'

'আমার ঠিকানা আপনাকে দিয়ে দেব।' মৈত্রেয়ী কেমন একটু নরম চোখে তাকাল। পরে ওর মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে থেকে আচমকা শুধলো, 'আপনি আমাকে পড়াবেন ?'

প্রণব যেন একটু অবাক হলো। এতক্ষণ ওর সঙ্গে সে মজা করছিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ এমন একটা প্রস্তাব ?'

'তবে বেশ মজা হবে।' আঁচল দিয়ে ও মুখটা মুছে নিল।

প্রণব চুপ করে থাকল একটু সময়। পরে হেসে হেসে বলল, 'ওসব পরে ভাবা যাবে।'

রুবি আর শুভ জিরোচ্ছিল। মৈত্রেয়ী ওকে বলল, 'এ টুকুতেই এই অবস্থা!'

'চলো।'

এখানে গুমগুম শব্দটা আরো গম্ভীর, স্পষ্ট। দুপাশে পাহাড়। পাথরের বড় বড় টিলা। সমস্ত জায়গাটা যেন কেমন ফাঁকা। এখন যদি কোন জন্তু-জানোয়ার এসে সামনে পড়ে! মৈত্রেয়ীর গাটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রবীরদের এখন আর দেখা যাচ্ছিল না। অনেক নিচে নেমে গেছে। মাথার ওপর দিয়ে কটা পাখি উড়ে গেল।

মৈত্রেয়ী এবার প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'নাঃ, আপনি বড্ড আস্তে হাঁটছেন। রুবি, আমার সঙ্গে আসবি তো আয়।' বলেই একটা একটা করে পাথর টপকে ও এগিয়ে গেল।

রুবিরাও হাঁটতে শুরু করেছে আবার।

প্রণব দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিহির কল্যাণী সামান্য পরে ওকে এসে ধরল।

কল্যাণী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'যান, দাঁড়ালেন কেন?'

'তোমাদের জন্যে।'

'বুঝেছি!'

'কিচ্ছু বোঝনি!' প্রণব হাসল।

মিহির বলল, 'আমি এগোই।' পরে কল্যাণীর চোখে চোখে চেয়ে মুচকি হাসল, 'তোমাদের অত তাড়াহুড়ো করতে হবে না ম্যাডাম, আস্তে আস্তে এলেই হবে।'

'ভাল হবে না মিহিরদা, যাবেন না কিন্তু!' কল্যাণী চোখে নরম, মধুর এক ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল।

'মুখে তো খুব মিহিরদা, এদিকে মনে মনে তো গালাগালি দিচ্ছ।' মিহির হাসতে হাসতে পরে প্রণবের দিকে তাকাল একবার, 'আপনারা ধীরেসুস্থে আসুন, আমি ওদের গিয়ে ধরি।'

'দেখতে দেখতে যাওয়াই তো ভাল।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল।' মিহির হেসে ঘাড় কাত করল। আবার বলল, 'বিশেষ করে ম্যাডাম যখন সঙ্গে রয়েছে।' মিহির হো হো করে হেসে উঠে দ্রুতপায়ে নেমে গেল।

'মিহিরদা যে কী মজার লোক না!'

'সত্যিই বড় প্রাণখোলা হাসিখুশি মানুষ।'

'আপনার মতন অত মুখ গোমড়া করে থাকে না।' কল্যাণী চোরা চোখে একবার দেখল ওকে।

'আমি মুখ গোমড়া করে থাকি নাকি?' প্রণব চোখে চোখে তাকাল।

'থাকেনই তো!'

প্রণব হো হো করে হেসে উঠল এবার, 'এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা বললে।'

'মোটেই না।' কল্যাণী আড়চোখে তাকাল। ঠোঁট টিপে হাসল। পরে কি ভেবে জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। কল্যাণীর কপালের পাশের কয়েকটা উড়ন্ত চুল প্রণবের মুখে এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে ওর শরীরের ছোঁয়াও লাগছে। কল্যাণীকে এই মুহূর্তে কেমন উচ্ছল ও সজীব দেখাচ্ছিল। প্রণব একটা গাছের ডাল ধরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কল্যাণীও। চোখে-মুখে কৌতুক, জড়িমা।

'দাঁড়ালেন যে?' কল্যাণীর কণ্ঠস্বরে কি যেন এক আবেশ জড়ো হয়েছে। মুখে মিষ্টি এক হাসি। গালে টোল। আঁচলটা সরে সরে যাচ্ছে।

'মিহিরদা যেন কেমন সন্দেহ করছে আমাদের?'

'করুক, এতে কোন ক্ষতি হবে না।' কল্যাণী চোখ নত করে।

'তুমি কিছু বলেছ নাকি?'

'কি বলব, বলার আর কি আছে এতে!' কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে কামড়ে হাসছিল। একটু পরে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'মিহিরদা আমাকে খুব ভালবাসে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।' একটু হেসে পরে আবার বলে, 'এই জন্যেই কি আমায়ও এত পছন্দ করছে?' প্রণব অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ—।' কল্যাণী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অল্পক্ষণ।

মনে হলো কারা যেন নামছে। প্রণবরা আবার হাঁটতে শুরু করল। পাঁচ-ছটি যুবক হই হই করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

'এসব জায়গায় বাঘ-টাঘ থাকা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়।' কল্যাণী হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাচ্ছিল। এর আগেও সে এখানে এসেছে। কিন্তু আজকের মতন এমন সুন্দর, মনোরম যেন আর মনে হয়নি কখনো। এই সকালটি তার কাছে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এত আনন্দ এত খুশি এর আগে তো এমন করে সে অনুভব করেনি। এখন আর কোন ভয়-টয় ছিল না।

প্রণব বলল, 'জল খেতে এখানে জন্তু-জানোয়ার তো আসেই।'

একঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কল্যাণীরা বড় একটা পাথর পেরিয়ে এলো। আবার আড়াল। আশপাশে কেউ নেই। কল্যাণী দাঁড়িয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি যে এবার আসবেন আমি জানতাম!' ওর মুখে অল্প অল্প হাসি। আড়চোখে-সে একবার দেখে নিয়েছে প্রণবকে।

প্রণব ওর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে নরম চোখে তাকাল। আবেগের গলায় বলল, 'আমিও ভেবেছি, আমার আসার দরকার।'

'ভালই করেছেন এসে, না এলে খুব দুঃখ পেতাম।'

'তা জানি না। এসেও ভুল করেছি কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে প্রয়োজনটা তোমার চেয়ে আমারই বেশী।'

'তাই নাকি?' কল্যাণী বিনম্র ভঙ্গিতে হাসল।

'কেন, তোমার তা মনে হচ্ছে না?'

'হুঁ, তবে বেশীটা যে কার সেটাই বুঝতে পাবছি না।' কল্যাণী অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করল। হাসল। আবার হাঁটতে শুরু করল। কেমন চপল, উচ্ছল গতি। পরে আরো কয়েকটা ছোটখাটো পাথর ডিঙিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'আপনার রুমালটা দেখি একটু!'

'কেন, কি করবে?'

কল্যাণী আদুরে আদুরে গলায় বলল, 'ঘাম মুছব।' ওর কপালে, চুলেব গোড়ায় রেণু রেণু ঘাম জমেছে। ও হাসছিল।

'বা বা, বেশ মজা তো!' প্রণব পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর হাতে দিল।

মুখটা মুছে নিয়ে রুমালটা ফিরিয়ে দিয়ে কল্যাণী বলল, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'একটা কথা যে এখনও তোমায় বলা হলো না!'

'কি শুনি!' কল্যাণী এগিয়ে এলো।

প্রণব একটু ইতস্তত করে। পরে হাসি হাসি চোখে তাকাল। বলল, 'তোমার মুখে এই 'আপনি'টা শুনতে বড্ড কানে লাগে।'

'আমিও ভাবছিলাম তাই।' একটু নীরব থেকে কল্যাণী কি ভাবল যেন। পরে চোখের তারায় সামান্য দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলে, 'তবে সবার সামনে কিন্তু তা বলতে পারব না।' কল্যাণী চোখ ঘুরিয়ে নিল। এবার সে হাঁটতে শুরু করেছে, 'এই, আসুন!' বলেই লজ্জা পেয়েছে কল্যাণী। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলেছে। বলল, 'এসো!'

ওরা আরো কয়েকটা পাথর ডিঙালো। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, সশব্দে অনেক উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড গতি, শুধু সাদা সাদা জলের গুঁড়ো। ধুলোর মতন হাওয়ায় উড়ছে।

'চমৎকার!' কল্যাণী মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল।

'ওয়াণ্ডারফুল!' প্রণব ওর পাশে এসে দাঁড়াল, 'এর যেন আর শেষ নেই।'

কল্যাণী আরো একটু সরে এল। এখন ওর শরীর ছুঁয়ে রয়েছে সে। তারও বুকের মধ্যে দুরন্ত এক ঢেউ। আবেগে উত্তাপে অন্তরঙ্গ গলায় বলল, 'কি আশ্চর্য বলো, বছরের পর বছর, দিন নেই রাত নেই, সমানে এভাবে জল পড়ছে।'

'প্রকৃতির সবটাই যেন এমন আশ্চর্যে ভরা।'

'দেখ দেখ, জলের কণাগুলো বাতাসে কেমন উড়ছে দেখ!'

'উড়বে না, কত উঁচু থেকে পড়ছে!'

'পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে আসছে। ভীষণ ভাল লাগছে কিন্তু।' একটু পরে আবার ও বলল, 'চলো, ওদের কাছে যাই এবার।' বলে আবার হাঁটতে লাগল কল্যাণী।

'সাবধানে যেও।'

কি একটা কথা বলার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছে কল্যাণী। হঠাৎ যেন পা-টা কেমন হড়কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল তার। শরীর টাল খেল। পড়ে যাচ্ছিল ও।

'এই-এই!' বলতে বলতে মুহূর্তে প্রণব একটা লাফ দিয়ে কল্যাণীকে ধরে ফেলল। ভয়ে এমন জোরে প্রণব ওকে টান মেরেছে যে, কল্যাণী ওর বুকের কাছে চলে এসেছে। এখনও হাঁপাচ্ছে সে। বুকটা কেমন ধুক ধুক করছে।

'আর একটু হলেই হয়েছিল আজ!'

কল্যাণী কিছু বলল না। সোজা প্রণবের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। অস্ফুটে একফাঁকে বলল, 'তোমার জন্যেই বেঁচে গেলাম। কি আজ হত বলো তো!'

'আমি থাকতে কোন ভয় নেই তোমার।' প্রণব হাসল।

একটু পবে ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখে মৈত্রেয়ী শুভ আর রুবি একটা পাথরের টিলায় বসে আছে। মিহির বিউটি অন্য একটি টিলায়। প্রবীর আরো এগিয়ে একেবারে জলের কাছে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসে পড়ল।

মিহির ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, এত দেরি হলো আসতে!'

কল্যাণী কিছু না বলে মিহিবেব পাশে গেল। মিহির ওব কানেব কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'কি কথাবার্তা হলো শুনি!'

'হয়েছে, অনেক হয়েছে, সব কথা বলব কেন?' কল্যাণী বড বড চোখ কবে তাকাল।

'আচ্ছা, আবাব চোখ পাকানো হচ্ছে!'

কল্যাণী পিঠে চিমটি কাটল।

প্রণব আবো নিচে নেমে এলো।

'অত সাহস না দেখালে কী হয়!' কল্যাণী ওপব থেকে বলল।

জলেব ছাঁট এসে গায়ে লাগছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধোঁয়ার মতন জলের আঁশ উড়ছে।

'কটা ধারায় জল পড়ছে বলো তো ম্যাডাম?'

কল্যাণী কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থেকে হাসতে হাসতে বলে, 'পাঁচটা।'

'হলো না, সাতটা।'

প্রণব জলে হাত ছোঁয়ালো।

'উহুঁ, অত কাছে যেও না, ভীষণ পেছল।' প্রবীর হাত নেড়ে সাবধান করে দিল।

'দেখেছেন, কাণ্ডটা দেখেছেন!' কল্যাণী প্রণবের জন্যে কেমন ভয় পাচ্ছিল। চোখ-মুখ আতঙ্কে কেমন আড়ষ্ট।

মিহির মুচকি হেসে বলল, 'যাও না, এখান থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কাছে গিয়ে বলো।'

'ইস্, আমার বয়েই গেছে!' কল্যাণী আর একটা ধাপ নামল।

'এদিকে এসো মাসি।' মৈত্রেয়ী হাত নাড়ল।

শুভ আরো কয়েকটা পাথর টপকে টপকে নিচে নেমে গেল।

'এই শুভদা, অত দূরে যেও না কিন্তু!' রুবি বারণ করল। তার কথা শুনছে না দেখে এবার মিহিরকে ডাকল, 'পিসেমশায়, দেখ শুভদা কোথায় গেছে!'

মিহির পেছন ফিরে শুভকে হাতের ইশারা করে ডাকল, 'চলে এসো, আর যেয়ো না বলছি, এসো!'

রুবি ওর দিকে চেয়ে জিভ ভেংচাল।

'কি, গান-টান হবে নাকি?' প্রবীর প্রণবকে শুধোয়।

'হবে কি, হচ্ছে শুনছ না, ঝরণার গান।' প্রণব হেসে উঠল জোরে জোরে। কিন্তু জল পতনের শব্দের সঙ্গে কথাগুলো সব মিলিয়ে গেল।

রোদের তেজ বাড়ছিল। ওরা যেন এক শব্দের নেশায় পড়েছিল। কিছুতেই ঘোর কাটতে চায় না। এ যেন এক অন্য জগত। গাছ-গাছালি, কত রকমের পাখির কিচির মিচির গুমগুম একটানা একটা শব্দ। আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে প্রবীর উঠতে উঠতে বলল, 'বাড়ি যেতে হবে না?'

'এখানে সময় যে কিভাবে চলে যায়, টেরই পাওয়া যায় না।' প্রণবও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

এবার ফেরার পালা। ওরা আস্তে আস্তে ফিরছে। মিহির বিউটি রুবি মাঝখানে। প্রবীর শুভ মৈত্রেয়ী সকলের আগে। একটু তফাতে, সবার পেছনে কল্যাণী ও প্রণব।

'দেখে যেন আর আশ মিটতে চায় না।' মিহির মুগ্ধ গলায় বলে।

'কানের মধ্যে এখনও আমার জল পড়ার শব্দ লেগে আছে।' বিউটি একবার পেছন ফিরে তাকায়। ফেরার সময় যেন ওরা অনেক কিছু এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

মিহির এগিয়ে গেল, 'ওঠার সময়ই যত কষ্ট!'

শুভ পিছিয়ে পড়েছে। সে রুবির পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। রুবি মাঝে মাঝে দম নিচ্ছিল, শুভর হাত ধরে টাল সামলাচ্ছিল। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রুবি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। খুব ধীরে ধীরে পা ফেলছিল সে, 'ওরে বাপস্, দম ফেটে যাওয়ার উপক্রম!'

'কথা বলো না।' শুভরও দম ফুরিয়ে আসছে।

মৈত্রেয়ী ওপর থেকে বলল, 'কি রে, আমায় যে তখন খুব বলা হচ্ছিল!'

'এই দেখ, আমি তোমার আগে চলে এলাম।' বিউটি জোরে জোরে পা ফেলে উঠতে লাগল।

কল্যাণীদের দেখা যাচ্ছিল না। ওরা এখনও অনেক নিচে।

'মাসি দেখছি, তখন থেকে খালি পিছিয়ে পড়ছে।'

'তোমার মাসিটি পয়লা নম্বরের লেডুস।' মিহির হেসে উঠেছে। বলল, 'চলো, আমরা আগে আগে উঠে পড়ি।'

'কোমর ধরে গেছে মাইরি।' প্রবীর মিহিরের দিকে তাকাল।

'আর কতদূর বাবা, এখনও যে শেষ হয় না!' রুবি শুভর দিকে চেয়ে আবার বলে, 'এই, আমাকে ধর না একটু।'

শুভ হাত বাড়াল।

কল্যাণী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখানেই তার পা ফসকে গিয়েছিল। প্রণবের চোখে চোখে সে তাকাল। চোখের তারায় কী এক মধুর ইঙ্গিত আবেশ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল,. ঠোঁটে হাসি। মনে হলে বুকটা যেন তার এখনও কেঁপে ওঠে; প্রণবের ওই চওড়া বুকের সঙ্গে সে মিশে গিয়েছিল। এ এক নতুন স্বাদ যেন। কেমন বিহ্বল

কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল কল্যাণী, ভালও লাগছিল। দুজনই চোখে চোখে তাকাল। প্রণব হাসতে হাসতে বলল, 'কি, এ জায়গাটার কথা এখনও ভুলতে পারছ না ?'

'তুমিই বলো না, ভোলা সম্ভব ?' কল্যাণী চোখে চোখে চেয়ে রইল।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। গুন-গুন করে গাইতে গাইতে বলল, 'তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে/ শুধু আমায়, বলো আমায় গোপনে।' প্রণব চোখের ইশারা করল।

'গোপন কথা জেনে আর কাজ নেই গো মশাই ; চলো, এতক্ষণে সবাই উঠে পড়েছে, ছি ছি, কি ভাবছে ওরা।' কল্যাণী এবার তাড়াতাড়ি উঠতে শুরু করে। খুশি ওর সর্বাঙ্গে।

প্রণব হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'ধরো ধরো সখী…।' ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল।

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রণব। কল্যাণীর দিকে হাসি হাসি চোখে চেয়ে বলল, 'এই জায়গায় তোমাকে যা লাগছে না আজ !'

কল্যাণী চোখ টান-টান করে তাকিয়ে হাসে, 'কি রকম শুনি ?'

'সিম্প্‌লি বিউটিফুল।' ওর নাকটা মৃদুভাবে টেনে দিল প্রণব।

'এতক্ষণে বুঝি চোখে পড়ল !'

'পড়েছে, অনেক আগেই পড়েছে।' প্রণব গাঢ় চোখে ওকে দেখতে দেখতে ফের বলল, 'আমি যদি আর্টিস্ট হতাম, তাহলে এই ল্যাণ্ড্‌স্কেপের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তোমার একটা পোর্ট্রেট এঁকে রাখতাম, সত্যি বলছি !' প্রণব মিটিমিটি হাসছে।

'যাও, অত প্রশংসায় কাজ নেই।' কল্যাণী স্নিগ্ধ চোখে হাসল শুধু।

'মাইরি বলছি। কে বাড়িয়ে বলে !'

হাসাহাসি করতে করতে ওরা একসময় ওপরে উঠে এলো। তারপর আরো এক রাউণ্ড কবে পাউরুটি কলা চা হলো।

প্রণব ঘড়ি দেখল, 'বেলা কিন্তু অনেক হলো।'

প্রবীর বলল, 'তবে ভাই সোজা এবার বাড়ি চলো।'

'জোনা যাবে না?' মৈত্রেয়ী তাকাল।

'থাক, আজ আব গিয়ে কাজ নেই, এতেই টায়ার্ড দিদিভাই।' রুবি তাকিয়ে একটু হাসল।

কল্যাণী বলল, 'একই রকম তো, বরং দেখতে এটাই বেশী ভাল।' ওকে বেশ উৎফুল্ল, ঝকঝকে দেখাচ্ছিল।

'একটাই তো দেখলাম, কি করে আর তুলনা কবব!' মৈত্রেয়ী আস্তে আস্তে বলল।

প্রণব হাসি-হাসি মুখে বলল, 'বাড়িতে খুব ভাববে আবার!'

'ঠিক আছে, বাড়িই চলো ছোটমামা।' মৈত্রেয়ীরা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল।

মৈত্রেয়ী কি ভেবে প্রণবের মুখেব ওপর চোখ স্থির বেখে বলল, 'এবার কিন্তু আপনাকে গান শোনাতে হবে প্রণবমামা!'

'এই দুপুরে?'

'হ্যাঁ, এই দুপুরে।' মৈত্রেয়ীর গলায় আবদার ছিল।

আবার ঘবের পথ ধরেছে ওরা। প্রণব ততক্ষণে একটু ভেবে নিয়ে একটা হাসির গান ধরল। 'নাচে মাড়োবার বালা, নাচে তাকিয়া/(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে ঝোপে থাকিয়া।'

'ওরে বাবা, এ যে দারুণ মজার গান!' হাসতে হাসতে মৈত্রেয়ী কল্যাণীর গায়ে ঢলে পড়ছে।

'এই, কি হচ্ছে!' কল্যাণী ওকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল।

সবাই হাসছে তখন।

'থামবে না, থামবে না প্রণবকাকু।' রুবি শুভর গায়ে নুয়ে পড়ল।

প্রণব পেছনে তাকিয়ে বলল, 'কি বিউটি, চলবে তো?'

'খুব ভাল লাগছে।'

প্রণব হাসতে হাসতে আবার শুরু করে, 'পায়জামা পরে যেন নাচে গণ্ডার/নাচে সাড়ে পাঁচমণী ভুঁড়ি পাণ্ডার,/গঙ্গাব ঢেউ নাচে বয়া ঝাঁকিয়া।'

আবার হো-হো কবে হাসল সকলে।

'ওরে বাবা, পেট ফেটে যাওয়ার যোগাড়।'

'চালান চালান।' মিহির হাসি চাপতে গিয়ে আরো জোরে হেসে উঠেছে।

রাস্তার দুপাশের লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে গাড়িটার দিকে।

প্রণব তখনও গাইছে, 'গামা নাচে, ধামা নাচে, মুটকী নাচে,/'

'এমা, কিসব কথা রে, মুটকী নাচে!' রুবি মৈত্রেয়ীকে আঙুল দেখাল। মুখে আঁচল চেপে ধরেছে কল্যাণী।

প্রণব ফিরে তাকায়, 'জামা পরি ভল্লুক নাচিছে গাছে/ঝগড়াটে বামা নাচে থিয়া তাথিয়া।'

প্রবীর তখনো হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, 'এ ভাই যা একখানা ছেড়েছ না!'

'এখনও শেষ হয়নি।' প্রণবও হাসছে, 'ছোট মিঞা, বড় মিঞা ডাকি কোলা ব্যাঙ/থাপুস থুপুস নাচে, নড়বড় ঠ্যাং।......'

সারা পথে এরই জের চলল। ফিরতে ফিরতে ওদের দেড়টা বাজল। সকলের চোখে-মুখে তখনো হাসি লেগে রয়েছে।

নয়

বিজয়ার পর আরো দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে ভাগে ভাগে আরো অনেক জায়গা ওরা দেখে এসেছে। রাঁচী হিল, মোরাবাদী হিল, গোণ্ডা হিল, দামোদর বাঁধ, পাগলদের হাসপাতাল, এমন কি, এগ্রিকালচার কলেজও দেখা শেষ। এসব ঘোরাঘুরির চেয়ে মৈত্রেয়ীরা জলসা নিয়ে আরো ব্যস্ত। মাথার মধ্যে ওই ঘুরছে দিনরাত ; সারাক্ষণই গান নাচ হাসাহাসি আর এন্তার চা চলছে। এখন মুখে মুখে শুধু এই একই আলোচনা। সারা বাড়িটাই যেন আনন্দে মেতে উঠেছে। মৈত্রেয়ীর বাহাদুরি আছে বলতে হয়। বুদ্ধিটা ও-ই প্রথম দিয়েছিল। এমন একটা সুযোগ তো সচরাচর আসে না! সবার মধ্যেই এই নেশাটা ধীরে ধীরে কেমন ছড়িয়ে গেল। দিনগুলো যেন খুব দ্রুতপায়ে চলে যাচ্ছে।

ক্ষীরোদবাবুও ওদের মধ্যে এসে বসে থেকেছেন। ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেসেছেন, গুন-গুন করে সুর তুলেছেন। ঠাট্টা-মস্করা করেছেন তাঁরও যেন এ ক'দিনে বয়েস কমে গেছে। স্নেহলতা এসে উৎসাহ দিয়েছেন। এক জায়গায় গান চলছে, আর এক জায়গায় নাচ আবার কখনো বা দেবযানী কচের গলা শোনা যাচ্ছে। টুকরো টুকরো ছবি। সব কিছু মিলিয়ে ক্ষীরোদবাবু যেন আবার এ-বাড়ির একটা ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর জীবনপাত্র যেন সহসা দুর্লভ সম্পদে ভরে উঠেছে।

সুব্রত মিহির প্রবীর প্রণব ওরা বারান্দায় একটা স্টেজ বানিয়ে দিয়েছে। মৈত্রেয়ী এসে দেখে-টেখে গেল। ওরা 'শ্যামা' করছে প্রণবকে এখানে আড্ডা মারতে দেখে মৈত্রেয়ী হাত ধরে টানতে

টানতে বলল, 'আপনি এখানে কেন, ভেতরে চলুন, এবার পুরোপুরি একটা রিহার্সাল দিয়ে নেব।'

'ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে দেখবে।'

'এখন শেষ হলেই বাঁচি!'

প্রণব আসতে আসতে বলল, 'তোমার যে এত গুণ, তা জানতাম না!'

'তবু তো পাত্তা দিচ্ছেন না!' মৈত্রেয়ী জোরে জোরে হাসল।

'পাত্তা দেওয়ার লোকের অভাব হবে!' প্রণবও হাসছিল।

মৈত্রেয়ী ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'বলুন না, কেমন হচ্ছে!'

'টপ!'

'আরো ভাল হত, সময়ই পেলাম না।'

'পোশাক-টোশাক পরলে, এই দেখবে অন্যরকম হয়ে গেছে।'

বাসনা এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'কিরে, তুই কি কিছু খাবি-টাবি না নাকি?'

'যাচ্ছি; তোমরা কিন্তু আজ আর ছাড়া পাবে না মা, মাসিকেও ডাক। আবার শুরু হবে।'

'এই তো হলো, এবার একটু জিরিয়ে নে।' বাসনা হাসতে লাগল।

'না না, হলো কোথায়, তুমি আগে এসো।'

প্রণবই অধিকাংশ গান গাইবে। বাসনা জয়ন্তীও ওদের সাহায্য করবে।

মৈত্রেয়ী মৃদু হেসে বলল, 'আপনার গানগুলো সবচেয়ে ভাল হচ্ছে।'

প্রণব বলল, 'জয়ন্তীদির গলাও খারাপ নয়।'

'মা-ই ডোবাবে, দেখবেন!' মৈত্রেয়ী মুখ টিপে হাসল।

'কেউ ডুববে না।' প্রণবও হাসতে হাসতে তাকাল।

শুভ এর মধ্যে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। রুবি যেন আরও

উচ্ছল। শুভর কাছে কাছেই ও সবসময় আছে। হাসছে, গল্প করছে, চিমটি কাটছে। কখনো বা নিজের খাবার থেকে খানিকটা ওর মুখে দিচ্ছে। ছুটোছুটি করছে। ওরা রিহার্সাল দেওয়ার জন্য বাগানে আমগাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। রুবি গাছে হেলান দিয়ে শুভকে দেখছিল। মৃদু মৃদু হাসছে ও। মাঝে মাঝে দৃষ্টি আনত রেখে ও অন্যমনস্ক হয়েছে। এখানটায় বেশ ছায়া আছে। পাতার আড়ালে পাখি ডাকছে।

শুভ একটা ডাল ধরে পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওকে দেখছিল। পাতাগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে ও বলল, 'চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে এখানে এলে নাকি ?'

'তুমি তো চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করতে শুভদা !' রুবি হাসল একটু।

'তাই থাক, আমার কোন আপত্তি নেই।'

রুবি একটু সময় নীরব থাকল। ওর চোখে চোখে চেয়ে পরে মৃদু, কোমল গলায় বলল, 'আমি তোমাকে খুব খারাপ করে দিচ্ছি, না ?'

শুভ অন্যদিকে তাকাল। একটা ঢোক গিলে বলল, 'কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি কিছু বুঝতে পারছ না ?' রুবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপলকে ওকে দেখল।

শুভ কি বলবে বুঝতে পারে না। বুকের ভেতরটা যেন তার কিরকম কাঁপতে থাকে। সে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

রুবি এবার ওকে অন্য কথায় নিয়ে যেতে চাইল। সেও যেন এ ক'দিনে কিরকম হয়ে গেছে। সামান্য পরে হেসে হেসে বলল, 'তুমি তো পড়াশুনায় খুব ভাল।'

'জানি না।' শুভ ওর মুখের দিকে চেয়ে এবার হাসতে লাগল।

রুবি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এই যে তোমাকে নিয়ে এত হই হই করছি, ভাবছি, ভাল করছি না এটা।'

শুভ অভিমান করল যেন। ওর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তোমার সঙ্গে তাহলে কথাই বলব না।'

রুবি হাসতে হাসতে বলল, 'আর বলব না, হয়েছে?'

শুভ হেসে ফেলল। খানিক পরে বলল, 'এরকম গল্প করলেই হবে?'

'একটু গল্প-টল্প না করলেও ভাল লাগে না।'

'এখনও আটকে আটকে যাচ্ছে, কী যে হবে বুঝতে পারছি না, মাঝখানে একবার ভুলে গেলেই হলো!'

'কি আর হবে, বাঙাপিসি আর প্রণবকাকু তো থাকবেই। ভুলে গেলে ওরা ধরিয়ে দেবে।'

'এতে সুর কেটে যায় না!' শুভ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকল একটু সময়।

'এমনিতেই তো সুর কেটে যাচ্ছে!' রুবি হাসতে থাকে।

'তোমার জন্যেই।' শুভ তাকাল। ঠোঁট কেটে হাসল।

'কেন, আমার জন্যে কেন?' রুবি ঘাড় কাত করে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। ঠোঁটে হাসি।

শুভ অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি অমনভাবে চেয়ে থাক কেন বলো তো?'

'অমনভাবে মানে?' রুবি তখনো অপলকে চেয়ে থেকে হাসছে।

শুভও শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, 'সে আমি বোঝাতে পারব না।'

'যাও, খালি বাজে কথা!' রুবি খিল খিল করে হাসতে লাগল, 'তুমিও তো হাঁ করে চেয়ে থাক।'

শুভ শান্ত কণ্ঠে একটু পরে বলল, 'শেষে আমি কিন্তু সব ভুলে যাব।'

'শুধু তুমি কেন, আমারও তো কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়।'

'এত মনে থাকে না।'

'যাই বলো, করতে পারলে, একটা দারুণ ব্যাপার হবে।'

শুভ ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'আগে কখনো স্টেজে উঠিনি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে তো?'

'তা না বেরোবার কি আছে, এখানে নিজেরা নিজেরাই তো।'

'অনেক লোক হবে দেখবে।'

'আব সময় নেই, শুরু করে দিই চলো।'

'তুমিই তো দেরি করছ।'

রুবি মুখ তুলে প্রগাঢ়, নরম চোখে ওকে দেখল একবার, 'আর কিছু নাহি কি কামনা...' রুবিব বলা এবং চোখের মধ্যে অন্তরকম এক আবেশ। কেমন এক মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকল ওর দিকে।

'...সুকল্যাণ হাসে, প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।' শুভ মুখ টিপে টিপে হাসল।

'...পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয় মর্মমাঝে।' রুবি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শুভর চোখে চোখ রেখে জোরে হেসে উঠল, 'বুঝলে কিছু?'

শুভও হাসল, 'এই করলেই হয়েছে!'

'কথাগুলো মনে রাখার মতন, না শুভদা?' রুবির কণ্ঠস্বরে কেমন এক কাতরতা, আর্তি ফুটে ওঠে। চোখের দৃষ্টি কি এক অনুচ্চারিত উত্তাপে আবেগে তিরতির করছে।

'নিশ্চয়ই।' শুভ মুখ নিচু করে হাসছে।

'.. বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে/লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে মুদ্রিত পদ্মের কাছে।...'

শুভও যেন এই মুহূর্তে অন্য এক অনুভূতিতে কেমন ডুবে যাচ্ছিল। ওর চোখের মধ্যেও কী এক বেদনা উঁকি দিয়েছে। বলল, '...বলো কী হইবে জেনে/ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,/

একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার/আপনার কথা। ভালবাসি কিনা আজ/সে তর্কে কী ফল।...'

রুবি আর হাসছে না। তাকেও এই মুহূর্তে কেমন দুঃখী করুণ দেখাচ্ছে। গলায় যেন কিসের ব্যথা। বুকে যেন খচ করে কি একটা কাঁটা ফুটে গেল। তুলতে পারছে না কাঁটাটা। কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে তার। বলল, '...যেদিকেই ফিরাইব আঁখি/সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর/ লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রুব,/বারম্বার করিবে দংশন। ধিক ধিক,/কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক,/...'

'...আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে/ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।'_

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা।

শুভ বলল, 'এবার খুব ভাল হয়েছে।'

রুবির দৃষ্টি আনত। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা আমপাতা ছিঁড়ছিল ও। কি ভেবে কিছুক্ষণ পর শুভর দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে, এখনো যেন ওর ঘোর কাটেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুভদা, আমার কি হয়েছে বলো তো?'

'আজ দুদিন ধরে একটু অন্যরকম লাগছে।'

'কিছুই ভাল লাগছে না আমার।'

'কেন?' শুভ ওর চোখে চোখ তাকাল।

'কেন আবার কি, আর ক'দিন পরেই তো আমরা যে-যার জায়গায় চলে যাব।'

'ভাবলে আমারও খুব খারাপ লাগে রুবি।'

'একে একে সব মনে পড়বে।' রুবি অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

শুভও চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। একটু পরে মনের এই বিষণ্ণ ভাবটাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জোরে জোরে সে হাসল, বলল, 'যাওয়ার তো এখনো ঢের দেরি।'

রুবি চোখ তুলেছে। খানিকক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকল। পরে ম্লান একটু হেসে বলল, 'বিশ্বাস কর শুভদা, সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর।'

শুভ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, 'আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে, ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।'

'ছাই ভুলব!'

এইভাবেই কথাগুলো আজ ক'দিন ধরে দুজনের মনের মধ্যে অলক্ষ্যে অহরহ সুরের এক আলাপ বিস্তাব করে চলেছে।

এমন সময় মৈত্রেয়ী এসে দাঁড়াল সেখানে। ওদের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'মুখস্থ হয়ে গেছে?'

'এখনও একটু একটু আটকাচ্ছে।'

'আর সময় নেই কিন্তু!'

'কিছু ভেব না দিদিভাই, স্টেজে উঠলেই দেখবে অন্যরকম।'

'আমার ভয় করছে!'

'মারব এক চড়, ভয় করছে; বলতে লজ্জা করছে না!' মৈত্রেয়ী হাসছিল।

'না গো দিদিভাই, শুভদা দারুণ করছে কিন্তু।'

'করবেই, ছেলে দেখতে হবে তো!' মৈত্রেয়ী পরমুহূর্তেই রুবিকে দেখতে দেখতে বলল, 'এবার ওদিকে চল, আবার তো 'উত্তীয়' হবি।'

রুবি ওর দিকে চেয়ে থাকে একটু সময়। হেসে হেসে বলে, 'আচ্ছা দিদিভাই, এসব কথা মনে হলে দুঃখ হবে না তোমার?'

'এখন ওসব ভাবা-টাবার সময় নেই।' মৈত্রেয়ী ওর চোখেব দিকে তাকাল, বলল, 'মনে আছে তো, আজ আর মাথায় তেল নয়, শ্যাম্পু। একটা ঘুম দিলে ভাল হত, তা আর হবে না।'

'ঘুমিয়ে দরকার নেই, তাছাড়া মাথায় এত চিন্তা ও উদ্বেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে ঘুম হয় না।'

'বেশ ভিড় হবে দেখিস!'

রুবি বলল, 'তুমিই কামাল করে দেবে দিদিভাই।'

মৈত্রেয়ী কি ভেবে এবার নিজের মনেই হাসল। রুবির দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এখন মনে হচ্ছে, জিনিসটা খুব খারাপ হবে না।'

'খারাপ হওয়ার কোন ব্যাপার নয়, একদিকে তুমি আর একদিকে প্রণবকাকু।'

'ঠিক বলেছিস, প্রণবমামা না হলে হতই না, বেশ গলা রে।'

'এজন্যে কিন্তু প্রণবকাকুর কোনরকম দেমাক নেই, তাই না দিদিভাই?'

'কলকাতায় গিয়ে আমাদের ওখানে যেতে বলবি তো!'

'বারে, আমি আবার কেন, তুমি বললেই হবে।'

'বলেছি তো।' মৈত্রেয়ী কি ভেবে হাসল যেন, একটু পরে বলল, 'তোরা খুব গান শুনিস, না?'

'খুব না হলেও, শুনি।'

মৈত্রেয়ী অন্যদিকে চোখ ফেরাল। পরে বলল, 'তোদের হয়ে গেছে?'

'একবার হয়েছে।'

'তাহলে ভেতরে আয়, 'শ্যামা'র স্টেজ রিহার্সাল হবে। তা না হলে, কে কোথায় কিভাবে দাঁড়াবে, কোনদিক দিয়ে বেরোবে, কিছুই বুঝতে পারবে না।'

'চলো তাহলে।' রুবি শুভর দিকে চেয়ে বলল, 'তুমিও এসো।'

শুভ মুচকি হেসে বলল, 'তোমরা এগোও না।'

পথে মণিময়ের সঙ্গে দেখা। হাসতে হাসতে মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরাই খেল দেখাচ্ছিস মাইরি।' পরে রুবিকে দেখতে দেখতে হেসে বলল, 'আর একজন তো চান-খাওয়াই ভুলে গেছে, ঘুমের মধ্যেও বিড়বিড় করছে, জান না কি প্রেম অন্তর্যামী? বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকোবে কোথায়?' মণিময়ের গলায় কৌতুক ও মজা ছিল।

'না, মোটেই আমি বিড় বিড় করি না।' রুবি যেন ঈষৎ লজ্জিত। ও হাসছিল। শুভ চলে গেল।

মণিময় সিগারেট খেতে খেতে মেয়েকে বলল, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই যেন সত্যিকারেরই দেবযানী হয়ে গেছিস।'

'বাবা কিন্তু এসব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে।' রুবি চোখ নত করে তখনো হাসছিল একটু একটু।

'একটুও বাড়াচ্ছি না আমি।' মণিময় অপলকে কেন যেন মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকল অল্প সময়। ওই চোখে কি তখন আচমকা আর কোন প্রশ্ন ফুটেছে?

মৈত্রেয়ী হাসিমুখে বলল, 'কি রকম হচ্ছে বলছ না তো কিছু!'

'ভালই করছিস, তবে—' মণিময় হাসি-হাসি মুখে আবার বলল, 'তোর মামীকে একবার ট্রায়াল দিলে পারতিস।' মণিময় হাসতে থাকে।

'দাঁড়াও, আমি মাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি!' রুবিও হাসছিল ভীষণ।

'বড়মামার খালি ইয়ার্কি মারা কথা!' মৈত্রেয়ী হাসতে গিয়ে বিষম খেল।

মণিময় চুপ করে থাকল অল্পক্ষণ। সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'শঙ্কর টিটোকে তো নিয়েছিস, ওরা না আবার ফাঁসিয়ে দেয়!'

'তুমি তো দেখনি, বেশ ভাল করছে ওরা।'

'ও দুটি যা বুলেট আর বিচ্ছু, হয়তো ওখানেই না, আমি শ্রীশ্রী ভজহরি শুরু করে দেয়।'

মৈত্রেয়ী বলল, 'শঙ্করকে তো খালি, ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর আর ওই বটে ওই চোর করতে শুনছি। মাথার মধ্যে ওসব বিদঘুটে গান আর নেই এখন।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হাত নেড়ে নেড়ে ওই করছে।'

'এ এক মজার ব্যাপার হলো দেখছি!'

'গোটাটাই এখন একটা মেন্টাল হস্‌পিটাল।' মণিময় মুখ ভরতি ধোঁয়া নিয়ে আস্তে আস্তে বের করে দিচ্ছিল।

'তুমি আমাদের একেবারে পাগল বানিয়ে দিলে বড়মামা!'

মণিময় হাসছিল, বলল, 'দেখছিস না, কাকাও এখন কেমন গুনগুন করে গান-টান গাইছে!'

'দাদু তো ভীষণ খুশি হয়েছে।'

'অনেকদিন পর কাকাকে এমন হাসিখুশি দেখছি।' মণিময় মুহূর্তের জন্যে কেমন অন্যমনস্ক হয়।

'এতবড় বাড়িতে লোকজন না থাকলে ভূতুড়ে বাড়ি মনে হয়।' মৈত্রেয়ী চোখে চোখে চেয়ে হাসতে থাকে।

'তোদের এই নাচ-গানে ভূতগুলো সব এখন পালিয়ে গেছে।' মণিময়ের মুখে হাসি।

'আমরা তো সব জ্যান্ত ভূত, তাই!' মৈত্রেয়ীর সঙ্গে রুবিও খিল খিল করে হেসে উঠেছে।

মণিময় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মৈত্রেয়ীকে বলল, 'আর একটা খবর আছে রে!'

মৈত্রেয়ী তাকাল। রুবিও তাকিয়ে আছে।

'শুনলে লাফিয়ে উঠবি।' মণিময় মৃদু মৃদু সিগারেট টানছে।

'কিছু বলছ না তো!'

মণিময় আরো দুদণ্ড সময় নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'পিক-নিকের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেছে।'

'কী মজা, কী মজা!' মৈত্রেয়ী নাচের ভঙ্গিতে হাততালি দিয়ে একচক্কর ঘুরে গেল।

'জায়গাটাও দারুণ বাছা হয়েছে।'

'এখানকার সব জায়গাই দারুণ ভাল লাগছে আমার।' মৈত্রেয়ী আবেগে, খুশিতে চোখ বুজে ফেলেছে।

'তাহলেও এখন যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, তার জুড়ি নেই।'

মৈত্রেয়ী চোখে চোখে তাকাল, 'কোথায় ?'

'নেতারহাট, নাম শুনেছিস ?'

মৈত্রেয়ী ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'নাম তো শুনেছি, যাইনি কখনো।'

মণিময় সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক আগে একবার গিয়েছিলাম, ভারী সুন্দর জায়গা।'

'তবে তো আবো মজা হবে।'

মণিময় যেন তার পুবনো দিনে ফিরে গেছে। চোখেব সামনে এ` এক করে সব আবার ভেসে উঠছে। বুকেব মধ্যে খুশি। কণ্ঠস্ববে উত্তাপ। বলল, 'এক নম্বব, এখান থেকে অনেকটা দূর, ছিয়ানব্বুই মাইল ; পাহাড়েব ভেতর দিযে রাস্তা, একদিকে গভীব খাদ, আর একদিকে জঙ্গল, আব জঙ্গলটা পাহাড়েব গা ধরে ধবে একেবাবে ওপবে উঠে গেছে। ভীষণ থ্রিলিং।'

রুবির মুখ-চোখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। শুধোল, 'কবে যাবে ?'

'লক্ষীপুজোর পবের দিনটাই ঠিক করা হয়েছে।'

প্রণব এসে সেখানে দাঁড়াল, 'একটা সিগারেট দিন তো মণিময়দা।'

'কী ব্যাপার ভাই, তোমার যে আর পাত্তাই নেই।' মণিময় প্যাকেট আর দেশলাইটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

প্রণব সিগারেট বের করে নিল। ধরিয়ে ওগুলো মণিময়েব হাতে দিতে দিতে বলল, 'আমার কোন দোষ নেই, ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

মণিময় এবার মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে শুধোয়, 'প্রণবই তাহলে তোদের চীফ আর্টিস্ট।'

'আঁর্টিস্ট ?' প্রণব অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ আর্টিস্ট, অত অবাক হচ্ছ কেন ?'

মৈত্রেয়ী বলল, 'তা ঠিক, প্রণবমামা না থাকলে কি আর এসব হত ?'

'তাহলেই বোঝ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি ভাই।' মণিময় মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাসছে।

মৈত্রেয়ীরা চলে গেল।

মণিময় কি ভেবে একটু পরে প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল 'তুমি এখন তো আর বেরোবে না ?'

'কেন, আপনারা বেরোচ্ছেন নাকি ?'

মণিময় হাসি-হাসি মুখে বলল, 'ভাবছি প্রবীরের গাড়িটা নিয়ে বাজার থেকে ঘুরে আসব একবার ; তোমাদের যা পাবলিসিটি দেওয়া হয়েছে, লোকজন তো আসবে, কিছু মিষ্টিটিষ্টি আনতে হয়।' মণিময় হাসতে লাগল।

'অত বলতে গেলেন কেন ?'

'আমি কি আর একা বলেছি ভাই ; কাকা বলেছে, কাকীমাও অনেককে নিমন্ত্রণ করে দিয়েছে, তার ওপর তোমার বন্ধু মৃণাল, ও তো খবরটা আরো রাষ্ট্র করেছে।'

'বসাবেন কোথায় ?'

'সে জানি না, তোমার বন্ধুই তার দায়িত্ব নিয়েছে।'

'একটা কেলেঙ্কারী হবে দেখছি !'

মণিময় সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি থাক, আমরা ঘুরে আসছি।'

'থাকতেই হবে, যা ভয় পাইয়ে দিলেন !' একটু থেমে সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে বলল, 'এবার স্টেজ রিহার্সাল, আপনারা না থাকলে কি করে হবে !'

'তোমাদের শুরু হতে হতে আমরা এসে পড়ব।'

এমন সময় মিহির এলো। মণিময়কে দেখে বলল, 'কি দাদাভাই, যাবেন তো ?'

'হ্যাঁ, চলো চলো।'

মিহির প্রণবের দিকে চেয়ে হাসল একটু, বলল, 'খুব ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যান।'

ওরা চলে গেল।

প্রণবের তখনো সিগারেট খাওয়া শেষ হয়নি। সিগারেট খেতে খেতে সে অন্য কথা ভাবছিল। এখানে এসে যেন এদের সঙ্গে সে আরো জড়িয়ে গেছে। কল্যাণীকে কাল থেকে কেমন যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। খুব একটা কাছে কাছে আসছে না ও। মুখখানা একটু শুকনো শুকনো। এলেও খুব কম কথা বলছে তার সঙ্গে। ও কি রাগ করেছে তাহলে? না না, রাগ করবে কেন? কেউ কি কিছু বলেছে ওকে? কিছুই বুঝতে পারছে না প্রণব। বুকের ভেতরটা কেমন খচ খচ করতে থাকে। তবে কি, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তার এই হাসি-ঠাট্টা, মেলামেশাটা ও ভালভাবে নিতে পারছে না! অন্যরকম কিছু ভাবছে? এ এক অদ্ভুত রহস্য! প্রণব নিজের মনেই হাসল একটু।

এমন সময় কল্যাণী এসে পেছনে দাঁড়াল, 'এই যে, চা নাও।'

প্রণব ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল সামান্য, বলল, 'তোমার কি হয়েছে বলো তো!'

'কি হবে, কিছুই না।' কল্যাণী হাসল না। ওর গলায় কোন রকম উচ্ছ্বাস নেই যেন। গম্ভীর একটু।

'আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই. আমি ঠিক বুঝতে পারি।'

'তবে আর জানতে চাইছ কেন?'

'এতেও অপরাধ?'

'হ্যাঁ, অপরাধ।'

প্রণব যেন একটু আহত হলো। অভিমানের গলায় বলল, 'বেশ চাইব না, তাছাড়া আমার অধিকারই বা কতটুকু!' সে

সিগারেটে টান দিয়ে চা খেল নীরবে। তার মুখের হাসি মুহূর্তে কেমন মিলিয়ে গেল। ও এখনও তাকে ঠিক বুঝতে পারল না!

কল্যাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে এখন যেন আরো দুঃখ পেল। আসলে এভাবে সে কথাটা বলতে চায়নি। বলাটা কেমন একটু কর্কশ হয়ে গেছে তার। প্রণবের সঙ্গে এ বাড়ির সম্বন্ধটা অনেক দূরের। হয়তো কিছু ভাবতে পারে। এরপর আর রাগ করে থাকা যায় না, উচিতও নয়। কল্যাণী এবার আগের মতনই হেসে ফেলেছে। আর একটু কাছে সরে এলো ও। পরে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'আবার রাগ আছে!'

প্রণব ম্লানভাবে হাসল, 'না, রাগব কেন?'

কল্যাণী এখন অনেকটা সহজ হয়ে এলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কেমন যেন পরিহাসের গলায় বলল, 'তুমি তো এখন খুব ব্যস্ত।'

প্রণব বলল, 'সেজন্যেই তো তুমি একটু কাছে কাছে থাকলে মনের জোর পাই। অথচ আমি তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি না।'

কল্যাণী কিছুক্ষণ ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকল। বলল, 'আমাকে দেখার ফুরসত কি আর এখন তোমার আছে?'

প্রণব ওর মুখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'মানে?'

'মানেটা খুব কি কঠিন?' কল্যাণী অনিমেষে চেয়ে থাকে।

প্রণব কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুধু একটা কথা মনে রেখো, তোমার জন্যেই এখানে আমার আসা!'

কল্যাণী এবার মজা করে হাসল, 'কাল এত করে ডাকলাম. এলে না কেন?'

'তুমিই বলো না, তখন কি আসা যায়!'

'একবার শুনে গেলেই পারতে।'

'এর জন্যে রাগ করেছ?'

'আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, ঠিক রাগ বলব না, অভিমান।'

'তখন ওভাবে চলে এলে মৈত্রেয়ীরা চটে যেত, এত খেটেখুটে ওরা করছে।'

কল্যাণী চোখ টান-টান করে বলল, 'আমার তো তোমাদের মতন গুণ নেই আর।'

'থাক, কি আছে আর না আছে, সে তো আমিই জানি। তোমার শুনে কাজ নেই।'

'না গো মশায়, তুমি কিচ্ছু জান না। কিচ্ছু না।'

প্রণব গুন গুন করে গেয়ে উঠল, 'ও কী কথা বল সখী, ছি ছি, ও কথা মনে এনো না॥ / আজি এ সুখের দিনে জগত হাসিছে, /··· আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে যে সহে না / সুখের দিনে সখী, কেন ও ভাবনা॥'

'থাক, অত গানের দরকার নেই।'

'কেন, তুমি তো আমার অনেককালের শ্রোতা।'

'হয়েছে, আর নয়।' পরমুহূর্তে আবার ও বলল, 'দাঁড়াও, একটা জিনিস নিয়ে আসি।'

খানিক পরে কল্যাণী ঘুরে এলো আবার। প্রণব চা শেষ করে কাপটা মেঝেয় রেখে দিয়েছে। সিগারেটও শেষ হয়ে এসেছে।

কল্যাণী ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। বলল, 'হাঁ কর।'

'কি ব্যাপার?'

'আগে করই না, ভয় নেই, বিষ-টিষ দেব না।'

'দিলেও কোন আপত্তি নেই, অমৃত ভেবে খেয়ে নেব।'

'কী আমার নীলকণ্ঠ রে!'

প্রণব হাঁ করেছে। কল্যাণী একটা প্যাড়া ওর মুখে পুরে দিল। প্রণব দুষ্টুমি করে ছোট করে ওর আঙুলে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

'উঃ—!' কল্যাণী আঙুল সরিয়ে নিল। পরে হাসতে হাসতে বলল, 'ঠাকুরের প্রসাদ, কাল থেকে রেখে দিয়েছি।'

প্রণব কেমন বিহ্বল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বুকের ভেতরটা যেন তার হঠাৎ কেমন করে উঠেছে। একটু পরে আবেশ জড়ানো গলায় বলল, 'এখানে এসে তোমাকে নতুন করে চিনলাম কল্যাণী।' প্রণব কি মনে করে ওকে আরো কাছে টেনে নিল। চুমু খেল।

কল্যাণীর শরীরে মুহূর্তে শিরশিরে একটা অনুভূতি বয়ে গেল। বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। কান দিয়ে যেন ভাপ বেরোচ্ছে। মুখ-চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে অস্ফুটে বলল, 'কেউ যদি দেখে ফেলত!' ও সরে গেল একটু।

কল্যাণী চুপ করে থাকল। ও যেন কী ভাবছিল তখন। আস্তে আস্তে চোখ তুলে প্রণবকে এক পলক দেখল। বলল, 'আমার কিছুই ভাল লাগছে না কেন বলো তো?'

প্রণবও একদৃষ্টে চেয়ে থাকল একটু সময়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল, 'হয়, মাঝে মাঝে আমারও এমন হয় দেখেছি।'

'কী যে কষ্ট, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।' কল্যাণী আবার চোখে চোখে তাকাল।

প্রণব সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে। কি ভেবে ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে দিয়েই তো আমি বুঝি!'

কল্যাণী নীরবে কী ভাবল। পরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমার কেমন যেন ভয় করছে প্রণবদা!'

প্রণব অনাড়ষ্ট গলায় বলল, 'এবার তো ওদের কিছু জানাতে হয়।'

'আমি মিহিরদাকে বলেছি। তাঁর তো তোমাকে খুবই পছন্দ।'

'মণিময়দাকেও একবার আমার বলা দরকার।'

'এখন আর কিছু বলো না। কথাটা আস্তে আস্তে সবার কানেই উঠবে।'

বিউটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'তোমরা এখানে, খুঁজে খুঁজে মরছি।…দিদিভাই ডাকছে। তাড়াতাড়ি আসুন।' বিউটি দাঁড়াল না আর। যাবার সময় কল্যাণীর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'তুমি না থাকলে জমেই না মাসিমণি।'

'যাচ্ছি রে যাচ্ছি, ছাড় আমাকে।'

প্রণবও ওদের পেছন পেছন এলো।

সন্ধ্যের মুখে মুখেই পাড়ার লোকেরা এসে ভিড় করেছে। মৃণাল বসবার ব্যবস্থা ভালই করেছে। প্রথমে জয়ন্তী একটা গান গাইল। পরে প্রণব। দেখতে দেখতে বাড়ি ভরে গেছে লোকে। তার পরই শুরু হলো 'বিদায় অভিশাপ'। রুবিকে যেন এখন আরো সুন্দর লাগছে। মণিময়ও যেন কেমন একটু অবাক হয়ে গেল। কোথাও টু শব্দ নেই। ওর কণ্ঠস্বরে এত আবেগ, এমন অভিনয়-জাদু কী করে এলো? নিজের মেয়ে বলে চিনতে যেন কষ্ট হয়। মিহির জয়ন্তীও কম অবাক হয়নি। শুভ যে এতটা করতে পারবে, ভাবেনি। শেষ হলে প্রচুর হাততালি পড়ল।

সুব্রত বলল, 'বেশ করেছে কিন্তু!'

'ভালই করেছে; আমি কিন্তু অতটা ভাবিনি।' মণিময় গলা খুলে হাসল। তারও উৎসাহ বেড়ে গেল। অনেকের সঙ্গে প্রাণখোলা হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিল। এরা যেন তারও বয়েস অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

'ওর অভিনয়ের ট্যালেন্ট্ আছে।' প্রবীর একটু আড়ালে গিয়ে সিগারেট ধরালো।

মিহির হাসতে হাসতে প্রবীরকে বলল, 'তোমার দিদিরাও মাঝে মাঝে যা অভিনয় করে না!'

'তোমরাই কম কি মিহিরদা!'

একটু পরেই শুরু হলো 'শ্যামা'। বিউটি আর শঙ্করকে দেখে শোভনারা হেসে ফেলেছে। একজন বজ্রসেনের বন্ধু, আর একজন কোটাল।

দেখতে দেখতে বেশ জমিয়ে ফেলেছে। স্টেজে ওদের বেশ লাগছিল। মৈত্রেয়ীর যেন তুলনা হয় না।

শেষ হতে একটু দেরিই হয়েছে। যাওয়ার সময় লোকে ওদের খুব প্রশংসা করেছে। অনেকে ওদের নিমন্ত্রণও করে গেল।

মণিময় মৈত্রেয়ীকে বলল, 'দারুণ করেছিস, লোকে মনে রাখবে অনেকদিন।'

'দেখলে তো, কি রকম করে দিলাম একখানা!'

'দিদিভাই তো নাচ-টাচ ভালই শিখেছিস দেখছি!' ক্ষীরোদ-বাবুর খুশি যেন আর ধরে না।

বাসনা কাছে ছিল, বলল, 'নাচে তো ও অনেক প্রাইজ-টাইজও পেয়েছে।'

মৈত্রেয়ী কল্যাণীকে জড়িয়ে ধরেছে। বলল, 'কি মাসি, বলো কিছু!'

'আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

'প্রশংসা করতে হয় প্রণবমামার, ওরকম গান না হলে কি এমন নাচ হয়!' মৈত্রেয়ী হাসছিল।

'না, বেশ গেয়েছে প্রণব।' স্নেহলতা বললেন।

কথা বলতে বলতে আরো রাত হলো। এক বিষয় নিয়েই ওদের আলোচনা। শেষ হয়েও শেষ হয় না। বুকের মধ্যে তখনো গভীর আবেগ। একসময় নির্জন নিঃশব্দ হয়ে এলো রাত্রি। চরাচর শান্ত, স্তব্ধ। উৎসব বাড়ি গভীর এক শূন্যতায় ভরে উঠেছে।

প্রণবের মাথায় তখন অন্য ভাবনা। রাত গভীর হলেও তার চোখে আজ ঘুম নেই। বুকের মধ্যে কি একটা কাঁটা যেন বিঁধে রয়েছে। ভীষণ এক অস্বস্তি।

দশ

লক্ষ্মীপুজোও শেষ হলো। সকাল থেকেই তোড়জোড় চলছে। ভেবেছিল, সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়বে, তা আর হলো না। সেই দেরিই হয়ে গেল। প্রবীর আরো দুখানা গাড়ি যোগাড় করেছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বাড়ির সবাই যাবে। ক্ষীরোদবাবু শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হলেন না। শরীরে এত ধকল সইবে না। স্নেহলতা হেমলতাও বাড়িতে থেকে গেলেন। কৃষ্ণাকে যাওয়ার জন্যে শোভনারা সাধাসাধি করেছিল। ও যেতে চাইল না; ওর জন্যে আবার আলাদা ব্যবস্থা, আরো অস্বস্তি। বুবাই গেছে। বেরোতে বেরোতে দেড়টা হয়ে গেল। ওরা খাওয়া-দাওয়া করে সামান্য বিশ্রাম করে নিয়েছে।

'সব নিয়েছিস তো?' প্রবীর লছমনকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।'

'দেখিস আবার, ওখানে কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না।'

শোভনা মৃদু হাসল, 'ভয় নেই, সবই নেওয়া হয়েছে।'

প্রবীর কি ভেবে মণিময়ের দিকে চাইল একবার, 'মুরগীগুলো আবার মরে যাবে না তো দাদাভাই?'

'মরবে কেন, পেছনের ঢাকনাটা তো এজন্যেই সামান্য ফাঁক রাখা হয়েছে।'

প্রবীরের গাড়িতে শোভনা অঞ্জলি মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ীর মেয়ে, টিটো শঙ্কর মণিময় আর প্রবীর। শঙ্কর ছটফট করছিল। আর একটায় বাসনা জয়ন্তী রীণা, মিহির সুব্রত শুভ।

রুবিরা আগে ভাগেই একটাতে উঠে বসে ছিল। রুবি [illegible]াণী মৈত্রেয়ী বিউটি। পেছনের সীটে আর জায়গা নেই। শুভকে

ইশারায় একবার ডেকেছিল রুবি। শুভ ইতস্তত করছিল। শেষে ওর বাবার সঙ্গেই গিয়ে বসতে হলো ওকে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বুবাই কল্যাণীর কোলে।

প্রণব তখনও ওঠেনি। সে দাঁড়িয়ে আছে।

মৈত্রেয়ী হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'এদিকে প্রণবমামা।'

মিহির প্রণবের দিকে চেয়ে হাসল, বলল, 'আমরা বসে গেছি, আপনি ওখানটায় যান।'

'ও প্রণবকাকু, চলে এসো না!'

শোভনা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আর কথা নয়, এবার উঠে পড়ুন গিয়ে।'

মণিময় তাড়া লাগাল, 'হ্যাঁ, আর দেরি করছ কেন?'

প্রণব হাসি-হাসি মুখে বলল, 'আমাকে ফেলে রেখেই তো সব উঠে গেছেন দেখছি!'

প্রবীর বলল, 'ওখানে তোমার ভক্তের দল, চলে যাও।'

শঙ্কর বায়না ধরল, 'আমিও প্রণবকাকুর ওখানে যাব।'

'এই যে প্রণব, তোমার আর এক ভক্ত।' দরজা খুলে দিল মণিময়। শঙ্কর এক দৌড়ে এসে প্রণবের পাশে বসল।

'তাহলে?' প্রবীর তাকাল মণিময়ের দিকে।

'আর কি, এবার স্টার্ট।' একটু পরেই মণিময় হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদেরটায় লোক যেন বেশী, টায়ার না আবার পাঙ্‌চার হয়ে যায়!'

'চুপ করো, বেরোতে না বেরোতেই যত সব অলুক্ষণে কথা!' শোভনা কৃত্রিম ধমক দিল।

আগে মিহিরদের গাড়ি, মাঝে কল্যাণীদের, শেষে প্রবীরদের।

পথে গাড়ি থামিয়ে সিগারেট পান দেশলাই, কিছু মিষ্টিও কিনে নিল। মৈত্রেয়ী রুবিরা কোরাস ধরেছে, 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু…।' মিহির অন্য গাড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে উৎসাহ দিল।

শহর পেছনে বেখে একসময় ওবা বড রাস্তা ধরল। রাতু রোড। বাস্তার দুপাশে বড বড গাছ; আম গাছই বেশী। শাল বট কাঁঠালও আছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাট দেখা গেল। তিনটে গাডিব মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলছে, কে কার আগে যায়। সুযোগ পেলেই একজন আর একজনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে দিগন্ত জুডে সবুজ ধানেব ক্ষেত। ক্ষেতেব বুকে একটার পব একটা ঢেউ উঠছে। জলাব ধাবে বক বসে আছে। এক জায়গায় সাঁওতালবা কোমব জডিয়ে নাচছে। নেশা কবেছে ওবা। মাদল বাজছে। একটাব পব একটা ছবি যেন চোখেব ওপব দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। আব এক জায়গায় দেখল, বড একটা হাট বসেছে। লোকগুলো ওদেব দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে।

মণিময় সিগাবেট ধবাল। প্রবীবকেও একটা দিল। সিগাবেটে টান দিতে দিতে প্রবীব বলল, 'আব একটু আগে বেবোতে পাবলে ভাল হত।'

'মেয়েদেব নিয়ে বেবোনো, এটাই তো ওদেব অনেক তাড়াতাডি হয়েছে।' মণিময় হালকা গলায় বলে বাইবেব মাঠ-ঘাট দেখতে লাগল।

'বাজে কথা বলো না; দাড়ি কাটতে, পায়খানা-বাথরুম যেতে বাবুরা নিজেবাই দেবি করলেন, দোষ এখন আমাদের!' শোভনার গলায় সামান্য কপট ঝাঁঝ ছিল যেন।

'ঠিক বলেছ দিদি।' মৃন্ময়ী হাসল।

'ওবে বাবা, এ যে দেখছি এক বা!' মণিময় হাসতে থাকে।

প্রবীর বলল, 'কি আর হবে, সান্‌সেট্‌টা দেখা হবে না।'

'না না, ওটা দেখতেই হবে।' অঞ্জলি তাকাল ওদের দিকে।

'আজ তো আর হবে না, কাল যদি হয়!'

মণিময় এবার প্রবীরের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, 'কাল আবার ওখানে থাকবি নাকি?'

'সেরকম বুঝলে থাকব, তা না হলে সান্‌সেট্ দেখেই কাট।'

শোভনা বলল, 'আমি ভাই কোনদিন ওখানে যাইনি, দু-চারদিন থাকতে পারলে মন্দ কি!' ও হাসছিল।

'আবার দু-চারদিন? সখ মন্দ না!' মণিময়ের কথাটা যেন ঠাট্টার মতন শোনাল।

'তোমার সখ নেই বলে কি আমারও থাকবে না!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে, থাকবে।' মণিময় হাসতে লাগল।

শোভনাও হেসে ফেলেছে। মৃন্ময়ী হাসতে হাসতে ওর গায়ে হেলে পড়েছে।

'আর বলিস না, এসব শুনলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।'

মণিময় জিভে কামড় দিয়েছে, 'ইস্!'

প্রবীর তাকাল, 'কি হলো?'

'একটা জিনিস যে আনতে ভুলে গেলাম!'

'কি জিনিস?'

'বার্ণল।' মণিময় জোরে জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছিস না, তোর বউদির গা-পিত্তি সব জ্বলে যাচ্ছে!'

সবাই হো-হো করে হাসতে লাগল।

'দেখলি তো ছোট, তোর ভাসুরের কাণ্ডটা একবার দেখলি তো!' শোভনাও বলতে বলতে হেসে ফেলেছে।

প্রবীর একটু পরে বলল, 'বউদির পেছনে তুমি আর লেগো না তো দাদাভাই।'

শোভনা বলল, 'না লাগলে কি আর তোমার দাদার পেটের ভাত হজম হবে!'

মণিময় হাসতে গিয়ে বিষম খেল। কাশি এলো। পরে প্রবীরকে দেখতে দেখতে বলল, 'দেখলি তো, তোর বউদি হলো গিয়ে আমার হজমি গুলি।'

'আবার বাজে কথা!' শোভনা জোরে একটা চিমটি কেটে দিল।

'উঃ!' মণিময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে গেল।

অঞ্জলি মুখ টিপে হাসছিল এতক্ষণ। খানিক পরে বলল, 'দাদাভাই একটুও পাল্টায়নি দেখছি।'

শোভনা একটা এলাচদানা মুখে ফেলে বলল, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে কোথায় একটু ভার স্থির হয়, তা নয়, তোমার দাদা যেন দিনদিনই আরো ছেলেমানুষ হচ্ছে।'

প্রবীর হাসছিল, বলল, 'দাদাভাই গম্ভীর হলে যা বিচ্ছিবি দেখায় না

'অথচ তোর বউদি আমায় গুমরোমুখো না করে ছাড়বে না

'আমার বয়ে গেছে।' শোভনা ঠোঁট উল্টে বলল।

মণিময় খানিকক্ষণ মাঠের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এভাবেই কাটিয়ে যেতে পারলে বুঝব, অনেক পুণ্যি করেছিলাম।'

শোভনা অঞ্জলিব দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার দাদাটির ছেলেমানুষি স্বভাব আর গেল না।'

প্রবীর ডানপাশের একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে শোভনাদের বলল, 'বউদি, ওই যে দেখছ বাড়িটা, ওটাই রাজবাড়ি।'

'রাজবাড়ি?' শোভনা যেন ভীষণ অবাক হলো।

'বিশ্বাস হচ্ছে না তো?'

'ধেৎ, রাজবাড়ি আবার এমন হয় নাকি!'

'হয় হয়, ধারেকাছে এমন বাড়ি আর একটাও নেই। শোনা যায়, একসময় নাকি খুবই জাঁকজমক ছিল, এখন আর নেই কিছু। দেখছ না, সব কেমন ভেঙেচুরে গেছে।'

'এখানকার লোকেরাও তো খুব গরীব, বেশির ভাগই আদিবাসী।' মণিময় বলা শেষ করে চুপচাপ সিগারেট টানল কিছুক্ষণ।

প্রবীর কল্যাণীদের গাড়িটা পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। মণিময়

বাইরে হাত বের করে বুড়ো আঙুল দেখাল। একচোট হাসা-হাসি।

প্রবীর বলল, 'রাতু রোড শেষ, এখন এর নাম বোম্বে রোড।'

সূর্যের আলোটা মাঠের ওপর একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসছে। পড়ন্ত বিকেলের ধূসর ছায়া সর্বত্র। পাখিরা ঘরে ফিরছে। শরতের নীলাভ আকাশ। মাঝে মাঝে শুভ্র, খণ্ড মেঘ। মনের মধ্যে কী এক সুর লাগে যেন। মণিময় প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়। হঠাৎ অনেক কিছু তার মনে পড়ে যায়। কোথায় যেন এখনও একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে তার। আজও তা খুলতে পারল না। এসব আমোদ-আহ্লাদ তো ভুলেই গেছে। কতকাল পর আবার এই পিকনিকে এলো! সেই দিনগুলো যেন কখন একটু একটু করে জীবন থেকে হারিয়ে গেল। একটুও টের পেল না। প্রতিদিনের সংসারের শত কাজে জীবনটা আজ কেমন বাঁধা পড়ে গেছে।

মণিময় ধীরে ধীরে সিগারেট টানছিল। সামান্য উদাসী গলায় বলল, 'কতকাল পরে আবার এই পিকনিক, ভুলেই গেছি সব।'

প্রবীর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব না হলে ভালও লাগে না।'

মণিময় কি ভেবে শোভনার দিকে একপলক চাইল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা প্রতিবারই এরকম পিকনিক করতাম, বিরাট দল হত, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

শোভনা কিছু না বলে চুপ করে থাকল।

অঞ্জলি কেমন আবেগ বোধ করছিল। শোভনাদের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'অনেকগুলো বাড়ি মিলে এই পিকনিক হত, কত লোক! দু-তিনদিন আগে থাকতেই সাজ-সাজ রব পড়ে যেত। আমাদের ঘুম হত না আনন্দের চোটে। কোথায় গেল সেসব দিন!' অঞ্জলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকায়।

'একটা উৎসব-টুৎসবের মতন তখন মনে হত।' মণিময় ম্লানভাবে হাসল সামান্য।

প্রবীর বেজার গলায় বলল, 'সে এক দিন গেছে দাদাভাই, সেদিনের অনেকেই তো আজ আর বেঁচে নেই।'

'ভাবতেও কেমন লাগে রে!' মণিময় ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। একটু পরে কি যেন মনে পড়ল তার প্রবীরের মুখের দিকে চেয়ে শুধোয়, 'সুবলকাকাকে তোর মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকবে না আবার! কী মজার লোক ছিল, তাই না দাদাভাই?'

'কোথাও গেলে-টেলে ওরকম লোক সঙ্গে নিতে হয়। কথার ফুলঝুরি, দলটাকে ভীষণ জমিয়ে রাখত, আর রাজ্যের গল্পও বানাতে পারত।' মণিময় যেন চোখের সামনে সেই দিনগুলো খুব সযত্নে তুলে এনেছে। চোখ-মুখ মুহূর্তের জন্যে কেমন দীপ্ত হয়ে উঠল তার।

প্রবীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুবলকাকা বাড়ি-টাড়ি বেচে দিয়ে সেই যে উধাও হলো, আর এমুখো হলো না।'

মণিময় সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। একটু উসখুস করল। বার দুই কাশল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শেষে বলল, 'কলকাতায় আমার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, একদম চেনা যায় না। আমাকেও প্রথমে চিনতে পারেনি, পরিচয় দিতে চিনল; কিন্তু মুখটা মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল। সেই শেষ দেখা।'

'সুবলকাকীমার জন্যেই এমন হলো।'

'কাকীমাকে কী সুন্দর দেখতে ছিল! ঠিক যেন প্রতিমার মতন চেহারা।'

'আর বলো না দাদাভাই; বাইরে থেকে কাউকে চেনা যায় না।'

মণিময় ম্লান চোখে তাকাল সামান্য, 'সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

শিবুটা তো ওর কাকার কাছেই খেয়ে পরে মানুষ, আর ওই-ই শেষে বুকে ছুরিটা মারল।'

'ওরা পালিয়ে গেলে সুবলকাকা যেন কেমন হয়ে গেল।'

'একে একে কত লোকই তো চলে গেল।' মণিময় একটু সময় উদাসভাবে চেয়ে থাকল বাইরেব দিকে। বুকটা তার ভারী হয়ে উঠেছে। সামান্য অন্যমনস্ক। বিজলীর মুখটা এই মুহূর্তে কেন যেন আবার মনে পড়ছে তার। ও-ও থাকত সেই পিকনিকে। ভারী মিষ্টি ওর চেহাবা। টান-টান চোখ, ঘন ভুরু, থুতনির ওখানটা আরো সুন্দর, মাথা ভরতি চুল। চোখে পড়াব মতন গায়ের রঙ। দেহের গড়নও খুব ভাল। মণিময়ের কাছে বিজলী তখন বেসামাল এক নেশার মতন। ওবা একসময় গল্প করতে করতে আড়ালে চলে যেত। ওর কোলে মাথা বেখে মণিময় চুপচাপ শুয়ে থাকত। বিজলী গুনগুন কবে ওকে গান শোনাত, গায়ে সুড়সুড়ি দিত, চিমটি কাটত। কত গল্প, হাসাহাসি, আহা রে, সে দিনগুলো গেল কোথায়? ওদের ব্যাপারটা এখানের অনেকেই জানত। বিজলী একদিন তাকে অভিমানের গলায় বলেছিল, 'এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না মণিময়দা।'

'আমারও না।'

'তোমাকে ছাড়া এখন আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি।'

ওর কথাগুলোতে কেমন এক নেশা মেশানো থাকত। মণিময় যেন সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। ঘোর কাটলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেও বলেছিল, 'আগে একটা চাকরি পাওয়া দরকার।'

মণিময় চেষ্টা করেও ওই সময়টায় একটা কিছু যোগাড় করতে পারল না। বিজলীরও একদিন বিয়ে হয়ে গেল। মণিময় কিছুতেই আর ওকে নিজের করতে পারেনি। একেই কি অদৃষ্ট বলে? এই কষ্ট সামলাতে তার যে অনেক সময় লেগেছিল।

একবারের পিকনিকের কথা মণিময়ের আজো মনে আছে।

বিজলী তরকারি কুটছে, মণিময় এসে ওর পাশে বসল।

'আমাকে দাও, আমি কুটে দিচ্ছি।'

বিজলী চোখের মনোহর এক ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে বলল, 'থাক, কত যে কাজের জানা আছে আমার।'

'দাওই না।' মণিময় বটিটা টেনে নিয়ে বাঁধাকপি কুটছিল। হঠাৎ এক সময় সে চিৎকার করে উঠল।

'কি হলো?'

মণিময় ততক্ষণে আঙুল চেপে ধরেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে।

'আরো জোরে চেপে ধর।' বিজলী ততক্ষণে নিজের শাড়ির একটা কোণা ছিঁড়ে ফেলেছে। বলল, 'বলেছিলাম না, এখন দেখলে তো!' পরে মাটি থেকে কিছু ঘাস তুলে নিয়ে হাতে ঘসে ঘসে নরম করে বলল, 'হাতটা দাও, কতটা কেটেছে দেখি!'

'অনেকটা।'

বিজলী টোটকা ওষুধ লাগিয়ে ছেঁড়া আঁচল দিয়ে জায়গাটা ভাল করে বেঁধে দিল।

মণিময় হেসে হেসে বলল, 'এর জন্যে তোমার দামী শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললে?'

বিজলী অদ্ভুত এক চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল। নম্র গলায় বলল, 'এটার চেয়ে যে তোমার দামটা আরো বেশী আমার কাছে।'

ও সেদিন কোন জবাব দিতে পারেনি এর।

মণিময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে চেয়ে থাকল। অনেক দিন পরে আবার ওর কথা মনে পড়েছে। আজও যেন ওর জন্যে কোথায় একটু দুঃখ সঞ্চয় করে রেখেছে সে। মুখের ওপর ম্লান এক ছায়া তিরতির করছে এখন। বিজলীর সঙ্গে তো আর কখনো দেখা হলো না তার! ও কি এখনও কর্মক্লান্ত কোন অবসরে তার কথা মনে করে? কেমন আছে ও, ক'টা ছেলেমেয়ে? মণিময় কি ভেবে

নিজের মনেই হাসল। পরে শোভনাকে উদ্দেশ করে যেন মনে মনে বলল : আমার বাইরেটাই তুমি দেখেছ শোভনা, ভেতরটা দেখনি, দেখতে চাওনি কখনো। জান, আমারও জীবনে একটা দুঃখ আছে। হয়তো বলবে, এ আর এমন কি, দুঃখ তো সব মানুষেরই থাকে। তা ঠিক, কিন্তু আমার কথা-টথা শুনে তোমার কি কখনো মনে হয়েছে তা? হাসি-ঠাট্টাই আমার সব নয় শোভনা, সব নয়। চোখ থাকলে দেখতে, ওর সঙ্গে কখনো কখনো আমার কান্নাও যে জুড়ে থাকে।

মণিময়কে এভাবে চুপ করে থাকতে দেখে শোভনার ভাল লাগল না। সে যেন অস্বস্তি বোধ করছে একটু। প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'তোমার দাদাটি যে এখন আবার মৌনী সাধু হয়ে গেলেন!'

প্রবীর হেসে ফেলল, 'অমন করে বললে হবে না।'

'বুঝেছি।' শোভনার গলায় রহস্য। খানিক পরে মণিময়ের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'থাক, আর ভাবতে হবে না, অনেকক্ষণ ভেবেছ।'

মণিময় মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলল, 'লাও ঠেলা, চুপ করে থাকলেও দোষ?'

'চুপ করে আছ না হাতী, কার ছবি অমনভাবে ধ্যান করছিলে আমার জানতে বাকী নেই।'

'জানবে বৈ কি, তুমি যে অন্তর্যামী!' মণিময় হো-হো করে হাসতে থাকে।

'আবার হাসি! ওসব চালাকি টের পাই গো মশাই, টের পাই।' শোভনাও হাসল।

বিকেলের রঙ এখন আরো মরা মরা।

মণিময় আবার একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিলে হয়।'

প্রবীর বলল, 'সামনেই দোকান আছে ; হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নেব। তাছাড়া গাড়িকেও একটু রেস্ট দিতে হবে।'

'মিহিরদের বলতে হবে তো!'

'কিছু বলতে হবে না, ড্রাইভার জানে যে ওখানে গাড়িকে জল খাওয়াতে হবে।'

আরো কিছুক্ষণ পর তিনটে গাড়িই এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা নেমে এলো সবাই। টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। শোভনারা হাঁটতে হাঁটতে একটু আড়ালে গেল।

মণিময় সুব্রতদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে হাসি মুখে বলল, 'যেতে যেতে দেখবে রাত হয়ে যাবে।'

'ভালই তো।' মিহির সিগারেট ধরায়।

'অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যেতে যা লাগবে না!' প্রণব হেসে ফেলেছে। সিগারেটে টান দিয়ে আবার বলল, 'এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।'

'অভিজ্ঞতা বেরিয়ে যাবে, রাস্তা ভাল নয়, মাঝে মাঝে ভাঙা। প্রবীর বলল।

মণিময় বলল, 'এবারকার পিকনিকের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।'

'তা থাকবে।' সুব্রত ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলল, 'জায়গার জন্যেই মনে থাকবে আরো বেশী।'

চা খেতে বিশ্রাম নিতে আরো ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেল এখানে। তারপর আবার যে-যার মতন গাড়িতে গিয়ে বসল। এবার ওরা ডানদিকের রাস্তা ধরল। এদিকে রাস্তা ভীষণ আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু। বিকেলও এখন যায় যায়। দূরের মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ে হিম জমছে। একটু শীত-শীত করছিল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জানলার কাচ তুলে দিল ওরা। দুপাশে পাহাড়ের সারি। ঢালু জমিতে কোথাও ধান, কোথাও সরষের ক্ষেত। পাখিদের

কিচির-মিচির। দিনের আলো দেখতে দেখতে কেমন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

প্রণব কেমন বিস্ময়ের চোখে সব দেখছে। দেখে যেন শেষ করতে পারছে না। কতকাল পরে যেন সে প্রকৃতির এই রঙ্গশালায় আবার অতিথি হয়ে এসেছে। কলকাতার জীবনে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে ও। আর যে কখনো সে এখানে আসবে ভাবেনি। মুগ্ধ, বিনীত ভঙ্গিতে সে তাকিয়ে আছে। আপন খেয়ালেই কখন একসময় সে গেয়ে উঠল, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া···'

গান শেষ হলে মৈত্রেয়ী হাততালি দিল, 'চমৎকার!'

কল্যাণীর চোখেও আবেশ। একটু পরে বলল, 'বেশ লাগছে, না?' বলেই ও প্রণবের দিকে তাকাল একবার। মিটিমিটি হাসছিল কল্যাণী।

প্রণব সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'সত্যিই বোঝাবার ভাষা নেই।'

'যা পার, দু-চোখ ভরে দেখে নাও মাসি।' মৈত্রেয়ী কল্যাণীর কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে রাখল।

রুবি ভয়েব গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখ, ওটা কি প্রণবকাকু?'

'অনেক আগেই দেখেছি, শেয়াল।' প্রণব হাসতে লাগল।

কল্যাণী ওর কাণ্ড দেখে না হেসে পারল না, 'শেয়াল দেখেই এত ভয় তোর?' কল্যাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হাসি-হাসি মুখে বলল, 'কলকাতায় থেকে থেকে কিছুই আর চিনিস না দেখছি।'

'বারে, কলকাতায় আবার শেয়াল আছে নাকি?'

কল্যাণী তখনো হাসছে। বলল, 'সে কি রে, শেয়াল না থাকলে কি শিয়ালদা হয়!' ওর গলায় কৌতুক। শঙ্কর যেন অবাক হয়ে গেছে। সে চট করে বিশ্বাস করে ফেলল। নিশ্চয়ই ওখানে একসময়

অনেক শেয়াল ছিল। না হলে এমন একটা নাম হলো কি করে।

মৈত্রেয়ী কথা শুনে হাসছে তো হাসছেই। একটু পরে বলল, 'তবে তো হাতীবাগানে হাতী পাওয়া যায় মাসি!'

প্রণব হেসে ফেলল। বলল, 'ওই পর্যন্তই থাক, আর মিল খুঁজতে যেও না। শেষে বলবে, বউ বাজারে বউ-ও পাওয়া যায়।'

শঙ্কব বেজায় খুশি। বলল, 'এমা, কি অসভ্য অসভ্য কথা, বউ পাওয়া যায়!'

'তোর চাই নাকি রে একটা?' রুবি ওব দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

'বড়দি, ভাল হবে না কিন্তু!'

কল্যাণী প্রণবের মুখের দিকে তাকায়। মুচকি হেসে বলে, 'বউ পাওয়া অত সোজা নয়।'

একটু পবে মৈত্রেয়ী বলল, 'এসব শেয়াল টেয়াল আমরা চিনব কোথেকে!'

'ঠিক বলেছ দিদিভাই।' রুবি হাততালি দিল।

প্রণব একটু সময় নীরব থাকল। গাড়িটা এখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছে। একপাশে ক্ষেত। তারপরই ঘন জঙ্গল, পাহাড়। তিরতির করে জল পড়ছে। অন্যপাশে কিছু ঘব-দোর চোখে পড়ল। কোন সাহসে যে লোকেরা থাকে এখানে! আবার রাস্তা বেঁকে গেল। প্রণব ওদিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'এসব জায়গায় নিশ্চয়ই বাঘ আছে।'

ড্রাইভার বলল, 'সব রকমের জন্তু-জানোয়ারই আছে এখানে। এখন তো বাবু ওপর থেকে হাতীর দল নেমে আসবে।'

'কেন?'

'ধান-টান খেয়ে যাবে, ফসল নষ্ট করবে।' একটু চুপ করে থেকে

আবার বলল, 'কপাল ভাল হলে বাবু, দু-একটা শের-টেরও মিলে যেতে পারে।'

'দরকার নেই বাবা।' মৈত্রেয়ী কল্যাণীকে আরো ঘন করে জড়িয়ে ধরে।

'এমন করছিস না যে মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি একটা বাঘ এসে লাফিয়ে পড়েছে।'

বিউটি বলল, 'আমার তো খুব মজা হচ্ছে।'

'আসেনি তাই, এলে মজাটা বেরিয়ে যেত।' রুবি ওর চোখে চোখে চাইল।

কল্যাণী চুপ করে আছে। প্রণব ওর দিকে তাকাল। কি ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আবাব কবে তুমি কলকাতায় যাচ্ছ ?'

কল্যাণী ওর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'দেখি, সামনে তো বড় ছুটি আর নেই।' ও অন্যদিকে চোখ সরিরে নিল।

'মাসি তো বড়দিনের ছুটিতে যেতে পার।' বিউটি কি মনে করে হাসল সামান্য।

মৈত্রেয়ী প্রণবের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমাদের ওখানে অবশ্য অবশ্যই যাবেন।'

প্রণব হেসে মাথা নাড়ায়। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, তোমাদের এখানে এসে এবার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হলো।'

'কলকাতায় গিয়ে কি এসব মনে থাকবে আবার ?' কল্যাণী একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রণব হাসল, 'আচ্ছা, কলকাতার লোককে তোমরা কি ভাব বলো তো ?'

'কি ভাবব, কিছুই না।' কল্যাণী মিষ্টি করে হাসল।

'তবে আর ওকথা বলছ কেন ?'

'লোকে তো ভুলেও যায়।' ওর কথার তলায় অন্য রকম ইঙ্গিত ছিল যেন।

'দোষ কি বলো, ব্যাপারটা তো আর একপক্ষের নয়, উভয় তরফের।'

'হয়েছে, কথার ওস্তাদি শুধু!' কল্যাণী চোখের এক ভঙ্গি করল। ঠোঁট কামড়ে হাসল।

'ঠিক বলেছেন প্রণবমামা।'

'তোর প্রণবমামা তো যা বলে সবই ঠিক।'

প্রণব এবার জোরে জোরে হাসে। কল্যাণীর দিকে চেয়ে বলে, 'আমার যুক্তিটা তুমিও উড়িয়ে দিতে পার না। মনে রাখারাখির ব্যাপারটা কখ্খনো একার নয়, যৌথ দায়িত্ব।'

কল্যাণী চোখের চাউনিতে নেশা ছড়ায়। বলল, 'মানলাম মানলাম, হলো? আর কিছু আছে?'

'মানতেই হবে।'

কল্যাণী দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে গাঢ় চোখে ওকে দেখল। বলল, 'যাক গে, কলেজ কবে খুলছে?'

'ভাই-ফোঁটার পরে।'

মৈত্রেয়ী বলল, 'আমরা কালীপুজোর আগেই চলে যাচ্ছি।'

রুবি বলল, 'আমরা বোধ হয় আরো পরে যাব, তাই না প্রণবকাকু?'

'সেরকমই তো শুনেছি।'

বিউটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে বলল, 'আগে যাবে কি গো দিদিভাই, এখানে দেওয়ালীতেই তো আনন্দ!'

'উঃ, কতদিন যে এখানকার দেওয়ালী দেখা হয়নি!' প্রণব খুশিতে চোখ বুজেছে।

মৈত্রেয়ী হেসে ফেলেছে। বলল, 'তবে তো থাকতেই হয়!'

কল্যাণীও ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল, 'আমি জানতাম।'

'মাসি—!' মৈত্রেয়ী ওকে একটা চিমটি কেটে দিল।

প্রণব চুপ করে আছে। এতটা মেশার পরেও তার দ্বিধা কাটেনি। বরং আরো বেড়েছে। এ যে কী অস্বস্তি, কাউকে বোঝানো যাবে না। একমাত্র কল্যাণী ছাড়া এখানে মনের কথা বলার মতন তার আর কেই বা আছে! কথা বলতে বলতে অনেক সময় সে কেমন আনমনা হয়ে যায়। অনেকের নাকি চোখে পড়েছে এটা। আর পড়লেই বা ক্ষতি কি? আস্তে আস্তে সবই জানবে। কতক্ষণ আর লুকিয়ে রাখা যায়।

কল্যাণীর জন্যে আজ ক'দিন ধরে তার দুর্বলতা আরো বেড়েছে। ও কাছে এলে ভাল লাগে। না এলে মনটা অকারণ এক বিষণ্ণতায় ভরে যায়। কল্যাণী মিহিরদাকে সব বলেছে। তাকে কি আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে? দেখে তো মনে হয়, তাকে পছন্দই করে সকলে। সবার মধ্যেই মিশে যেতে পেরেছে। সে যে বাইরের কেউ, এটা এই ক'দিনে যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছে প্রণব। দু-একদিনের মধ্যেই কথাটা জায়গা মতন পেঁছে যাবে। মিহিরদার যে এতে সমর্থন আছে, সে তো কথাতেই বোঝা যায়। অন্যরাও কি ওদের এই সম্পর্কের কথা কিছু আন্দাজ করেনি? যদি অপছন্দই করবে, তবে কি এভাবে ওদের মেলামেশা করতে দিত? মনে মনে কতভাবেই না সে এ ক'দিন ধরে সর্বক্ষণ যুক্তির জাল বুনে চলেছে। তবু বারংবার কি এক সংশয়, দ্বিধা এসে তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে। কল্যাণীও কি এসব নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ওর মনের মধ্যেও নানাধরনের চিন্তার হিজিবিজি দাগ। প্রণবের চেয়ে ও তো আরো ভাল করে এদের জানে। মনের মধ্যে যে কী এক যন্ত্রণা, কষ্ট কেবল ঘুরপাক খেতে থাকে। দুঃখের কথা মনে এলেই যেন আরো কত স্মৃতি ভেসে আসে। সব যেন একসঙ্গে এসে ভিড় করে। তার মার একান্ত দুঃখী ক্লান্ত মুখটা মনে পড়ে যায় কেবলই। সেও কতবার ভেবেছে, কল্যাণীদের অবস্থার সঙ্গে তাদের বিরাট ব্যবধান, কোন রকমের

মিল নেই। তবু কল্যাণীর হাতছানিতে সে এখানে না এসে পারেনি। হৃদয়ের খেলা বড় বিচিত্র। দীর্ঘশ্বাসে বুকের ভেতরটা কেমন ভরে যায়।

এভাবে অন্যমনস্ক থাকতে দেখে কল্যাণী প্রণবকে আস্তে করে একটা ঠেলা দিল, 'অত আর ভাবতে হবে না।'

প্রণব কিছু না বলে ম্লানভাবে হাসল।

কল্যাণী মৃদু মৃদু হাসছে। কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'দেওয়ালীতে বাড়িটা খুব করে সাজাই আমরা, এটাই এখানকার বড় উৎসব। এবার তো ভীষণ ভীষণ আনন্দ হবে, অনেক বাজী পোড়ানো হবে।'

প্রণব মনে মনে ভাবল, এই দেওয়ালীতে ওকে কিছু একটা দিতে হবে। কল্যাণীকে যেন এখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। এক পলক তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল প্রণব। বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছিল। আকাশে এক টুকরো সাদা মেঘ। তার গা থেকে আলোর কণাগুলো শেষবারের মতন মিলিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ পায়ে বনে বনান্তরে অন্ধকার নামছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। তন্ময় ভঙ্গিতে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রণব এক সময় বলে উঠল, 'বিউটিফুল!'

'কি বিউটিফুল?'

'ওই দেখ।' প্রণব আঙুল তুলে আকাশে ছবিটা দেখাল।

কল্যাণীরা কিছু না বলে চুপ করে দেখল।

খানিক পরে প্রণব আবার বলল, 'দেখার যে এখানে কত জিনিস আছে!'

'তার জন্যে চোখ থাকা চাই, সবাই কি আর দেখতে পারে?' কল্যাণী হাসি-হাসি চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল।

'এসব দেখলে মন-টন যেন কেমন হয়ে যায়, আমার তো ভীষণ মনখারাপ হয়।' প্রণব চাইল একবার।

'আমার বাবা কিছু হয়-টয় না।' কল্যাণী দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। প্রণবও জানে, এটা ওর মনের কথা নয়।

মৈত্রেয়ী বলল, 'হ্যাঁ মাসি, এতে আবার মনে হওয়ার কি আছে!'

কল্যাণী চুপ করে থাকল।

প্রণবও কিছু না বলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

নদীটার কাছে এসেই সন্ধ্যা নেমে এলো।

ড্রাইভার বলল, 'এই শুরু হলো পাহাড়ী পথ, এবার দেখবেন কি রকম লাগে!'

কল্যাণীদের গাড়িটা এখন মাঝে। মিত্রিবদাবা সবার আগে, পেছনে প্রবীররা। পথটা এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। শাল গাছ, আরো বহুরকমের গাছ-গাছালি। অন্ধকার ক্রমশই গাঢ় হচ্ছে। বহু ধরনের জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। একপাশে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে গভীর খাদ। কল্যাণী ঘাড় উঁচু করে খাদটা দেখল। মৈত্রেয়ী তাকাচ্ছে না। রুবি চোখ বুজে ফেলেছে। বিউটি সেই অন্ধকারের দিকে কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে। প্রণবের চোখে শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়, চারপাশ থেকে অন্ধকার ছুটে আসছে। গাড়ির হেড-লাইটের সামনে পড়ে সেগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষণ আর কারো মুখে কথা নেই। প্রণব সিগারেট ধরাল।

'এখন যদি একটা বাঘ এসে সামনে পড়ে?' প্রণবের চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছিল না।

'না না, এসব বলো না প্রণবকাকু।'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।' মৈত্রেয়ী আস্তে আস্তে বলল।

বিউটি যেন উপহাস করছে এমন গলায় বলল, 'গাড়িতে বসেও এত ভয়?'

দুপাশেই গভীর জঙ্গল। এখন থেকে শালগাছই বেশী। মাঝে মাঝে গাড়ি খুব আস্তে চলছে। এক জায়গায় তো মাঝারী গোছের

একটা পাথর গড়িয়ে গেল। ভাঙা রাস্তা। মাঝে মাঝেই ভেঙে গেছে। খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে গাড়ি। ড্রাইভার বলল, 'এ বাবু, বর্ষার জলে হয়েছে।'

প্রণব সিগারেট টানছিল। একটু পরে শুধোয়, 'এসব জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়?'

'কেন হবে না বাবু, হিসেবে একটু ভুল হলেই হয়। ফি-বছরই তো একটা দুটো দুর্ঘটনা ঘটে। সবই নসীব বাবু, নসীবে লেখা থাকলে তা তো ঘটবেই।'

প্রণবও কি এই নসীবকে অস্বীকার করতে পারে? পারে না।

কল্যাণী আস্তে আস্তে বলল, 'এখন যদি আমাদের গাড়িটা খাদে পড়ে যায়?'

ড্রাইভার একটা বাঁক নিতে নিতে বলল, 'এসব কথা বলবেন না দিদিমণি।'

প্রণব হাসল একটু, 'পড়লে কি ভাবছ, কেউ আমরা জ্যান্ত থাকব? কেউ বাঁচব না, মরে সব ভূত-পেত্নী হয়ে এখানে অনন্তকাল ধরে ঘুরব।'

মৈত্রেয়ী বলল, 'এখানে তো তাহলে অনেক ভূত-পেত্নী এখনও ঘুরছে।'

'ঘুরছেই তো!'

'এসব বলবেন না তো প্রণবমামা।'

কল্যাণী চুপ করে দুপাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠল। কোথায় গেল সেই ঘুটঘুটি একাকার অন্ধকার! চাঁদের আলোয় সমস্ত পাহাড় অঞ্চলটা এখন কী এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গাছের ডাল, পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে নরম, মাতাল করা জোছনা পথের ওপর এসে পড়েছে। কে যেন দাবার ছকের মতন ছক কেটে রেখেছে পথের দুপাশে, রাস্তার ওপর। দূরে বুনো জন্তু-জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। হিম জমেছে

পাহাড়ের গায়ে। দূরের দৃশ্যগুলো কেমন চকচক করছে। চারদিকটা কী এক নেশায় যেন ঢলে পড়ছে। কেমন আচ্ছন্ন, বেহুঁশ।

'এ অভিজ্ঞতা চিরকাল আমার মনে থাকবে কল্যাণী।' প্রণবের গলা ভারী।

'মনে থাকারই তো ঘটনা! আমিও কোনদিন ভুলব না।'

মৈত্রেয়ী বলল, 'এদিকে ভয়ে মরছি, মাথা ঘুরছে, আর আপনারা বেশ কাব্যি করছেন।'

প্রণব ফিরে তাকাল, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'একটা গান-টান করুন না!'

'এরপর আর গান জমে না, ভীষণ বেসুরো লাগবে।'

মৈত্রেয়ী চোখ বুজে থাকল।

'কি রে, কি হলো তোর?'

'গাটা কেমন গুলোচ্ছে।'

কল্যাণী জানলার কাচটা একটু নামিয়ে দিল। মুঠো মুঠো ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকল। বেশ আরাম লাগছে এখন।

'আর কতটা আছে?' রুবি জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তোরও আবার মাথা-টাথা ঘুরছে নাকি?'

'নাঃ, এমনি জিজ্ঞেস করছি।' রুবি হেসে উঠল।

এই দীর্ঘ পথ আসতে আসতে সুব্রতরা দেশ রাজনীতি চাকরি প্রমোশন পে-স্কেল ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছে। কখনো বাসনা জয়ন্তীও সেসব আলোচনার অংশ নিয়েছে। অসুবিধে হলে নিজেদের ঘরোয়া কথায় ফিরে এসেছে আবার।

শুভ বাইরের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে। রীণা মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলছে।

বাসনা এক সময় হাই তুলতে তুলতে বলল, 'পথ যে আর ফুরোয় না!'

মিহির সিগারেট খেতে খেতে হাসল, বলল. 'এমন যদি হত—

আমরা চলছি তো চলছিই, পথের শেষ নেই, তাহলে কি রকম লাগত দিদিভাই ?'

বাসনা তাকাল, 'আমাকে কেন, জয়ন্তীকে জিজ্ঞেস কর না।'

সুব্রত লঘু গলায় বলল, 'তুমি না ফিজিক্সের লোক।'

মিহির ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসতে লাগল। বলল, 'মাঝে মাঝে কাব্য করতে ইচ্ছে করে।'

বাসনার চোখে কৌতুক। হাসতে হাসতে বলে, 'লুকিয়ে লুকিয়ে আবার কবিতা-টবিতার চর্চা চলে নাকি ভাই ?'

'দৌড় ওই পর্যন্তই।' জয়ন্তী তেরছা চোখে তাকায়।

আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাসনা জয়ন্তীর মুখের দিকে চাইল। বলল, 'এবার একবার তোরা চলে আয় আমার ওখানে।'

'যাব '

বাসনা কেমন উদাস-দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকায়। চুপ করে থেকে খানিক পরে আবার বলে, 'বাবাকে দেখে এবার খুব কষ্ট হলো।'

'শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে।' জয়ন্তী দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলে।

'এই বোধ হয় শেষ-দেখা দেখে গেলাম বাবাকে, আর কি দেখতে পাব ?' বাসনার চোখ ছল ছল করে। গলাটা কেমন ধরে আসে।

'এসব ভাবলে আমারও কিছু ভাল লাগে না দিদি। কতদূরে থাকি, মনটা যে কী করে না রে !'

খানিক পরে বাসনা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, 'সবার সঙ্গে তবু দেখা হলো এবার, সবাইকেই দেখতে ভারী ইচ্ছে করে।'

জয়ন্তী ধীরে ধীরে একটু পরে বলল, 'কল্যাণীকে বিয়ে দিলেই বাবার দায়িত্ব শেষ।'

'দেখ না, ভাল ছেলে-টেলে থাকলে এখন থেকেই কথাবার্তা চলুক।' বাসনা উৎসাহ বোধ করে।

'বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই হলে তো ভালই হয়।'

'সেরকমভাবে খুঁজলে না পাওয়ার কি আছে!'

'আজ্ঞে না, ভাল ছেলে অত চট করে পাওয়া যায় না, আমরা জুটেছিলুম বলে!' সুব্রত হাসতে হাসতে ওদের একবার দেখে নিল।

মিহির সিগারেট মুখে লাগিয়ে রেখে বলল, 'ওদের ভাগ্য সুব্রতদা, ভাগ্য।'

'থাক, আর বড়াই করতে হবে না; ভাগ্য তোমাদেরই।' জয়ন্তী ঘাড় হেলিয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

'ওর বিয়েটা এবার লাগালে মন্দ হয় না; আবার বেশ হই-হই করা যাবে।' বাসনা আরো কি যেন ভাবছে তখন।

সুব্রত সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বলল, 'তাহলে তো সিরিয়াস্‌লি ভাবতে হয়।'

মিহির মুহূর্তের জন্যে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়। তারপর বলে, 'আমার খোঁজে একটি ছেলে আছে, দেখা যাক।'

রীণা হাততালি দিয়ে উঠল, 'আমরা এসে গেছি।'

গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে এসে থেমে গেল টুরিস্ট বাংলোর সামনে। জোছনায় সব যেন এখন ভেসে যাচ্ছে।

সবাই হই-হই করে নেমে পড়ল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই শোভা দেখল খানিকক্ষণ। পরে ঘরে এলো। আগেই সব ঠিকঠাক করা ছিল।

হাত-মুখ ধোয়া, জামা-কাপড় পাল্টানো, চা-টা খাওয়া, গল্প-গুজব চলল আরো কিছুক্ষণ। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল ওরা।

একসময় মণিময় বলল, 'আজ আর গল্প নয়, কাল ভোরে ভোরে উঠতে হবে, না হলে সান্‌রাইজটাও মিস করব।'

বাইরে এলোমেলোভাবে শীতের হাওয়া ছুটছে। জন্তু-জানোয়ারের বিচিত্র ডাকে সবাই রোমাঞ্চ বোধ করছিল। শুয়ে পড়েও কেউ ঘুমোতে পারছিল না যেন।

এগার

'এই ওঠো ওঠো, চারটে বেজে গেছে।'

সবাই একে একে উঠে পড়ল। মুখ-হাত ধুয়ে গায়ে গরম জিনিস চাপিয়ে বাইরে এলো। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে। ছাদে উঠল। অনেকে নিচেই থাকল। খুব ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। অন্য যাত্রীরাও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। তারা বেরিয়ে এসে পূ… আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

জোছনা কেমন ম্লান হয়ে এসেছে। একটা ময়লা আবছা ভাব। তারা ফুটে রয়েছে তখনো, আকাশ পরিষ্কার। শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে।

সুব্রত সিগারেট টানতে টানতে সোৎসাহে বলল, 'মনে হচ্ছে দেখা যাবে।'

মিহির বলল, 'আকাশ তো এখন পরিষ্কার।'

সুব্রত আবার বলল, 'আমাদের কপাল ভাল দাদাভাই।'

'দাঁড়াও, আগে দেখি, তবে তো কপাল।' মণিময় কান মাথা ঢেকে নিয়েছে চাদর দিয়ে। হাতে সিগারেট জ্বলছে।

সুব্রত বলল, 'দার্জিলিং-এ এতবার গেলাম, কোনবারই সান্‌রাইজ দেখা হলো না। ফগ এসে ঢেকে দেয়।'

একদৃষ্টে সবাই পুবের দিকে চেয়ে আছে। অন্যদিকে চোখ ফেরাবার যেন উপায় নেই। পাহাড় আর পাহাড়। ঢেউ-এর মতন সারি দিয়ে চলে গেছে। দূরে রুপোলী সুতোর মতন একটা ধারা এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেছে। পাহাড়ী নদী। চতুর্দিক স্তব্ধ। শঙ্কর হঠাৎ জোরে চিৎকার করল। শব্দটা ভেঙে ভেঙে প্রতিধ্বনির মতন দূর-দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। এমন নির্জনতা আর কি

কোথাও আছে! পাখিরা ডাকছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এ যেন সমাহিত এক ধ্যানমূর্তি। চোখ ফেরান যায় না।

প্রণব আজ এ কোন ছবি দেখছে! তার দৃষ্টি বিহ্বল, বিমূঢ়। মনের মধ্যে কী এক প্রগাঢ় অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মণিময় প্রণবের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে। বলল, 'কি হে, অমন হাঁ করে কি দেখছ?'

প্রণব ঘোর কাটিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'এ ভাবা যায় না।'

'কি- জানি, আমি তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না এর মধ্যে।' মণিময় সিগারেট খেতে খেতে হাসে। সে কান-টান আরো ভাল করে জড়িয়ে নিল।

কল্যাণী একেবারে প্রণবের পেছনে ; ওর চুলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। দু-একবার হাঁচল কল্যাণী।

প্রণব মুখ ফিবিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি মাথায় কিছু একটা দাও।'

কল্যাণী কিছু না বলে হাসল। হঠাৎ কী এক খেয়ালে ওর একটা হাত প্রণবের গালে ছুঁইয়ে দিল।

'ওরে বাবা, বরফের মতন ঠাণ্ডা।'

মিহির পাশে ছিল। কল্যাণীর মাথায় ছোট্ট একটা গাট্টা দিয়ে বলল, 'উহুঁ, ওদিকে দেখ।' মিহির হাসছিল।

অনেকেই ক্যামেরা ঝুলিয়ে তৈরী হয়ে থাকল।

প্রবীরও ক্যামেরা এনেছে, ক্যামেরাটা সুব্রতর হাতে। পব পর ভোরের কতগুলি ছবি নিল।

পুব আকাশের কোণে একটা জায়গায় বিন্দুর মতন আলোর দাগ দেখা গেল। মুহূর্তে মুহূর্তে তার রঙ বদলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আরো অসংখ্য আলোর ফুটকি। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে, চোখের পলক পড়ে না। সবাই কেমন বিস্ময়াবিষ্ট। দেখতে দেখতে দ্রুত অন্ধকার সরে যাচ্ছে।

সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় নরম গলায় অস্ফুটে কল্যাণী বলল, 'মিহিরদা।'

'হুঁ।'

'এসব দেখলে মন এত খারাপ হয়ে যায় কেন বলুন তো?' ওর দৃষ্টি প্রসারিত। গলায় সামান্য উদাস ভাব।

মিহির ওর দিকে চেয়ে হাসল একটু, বলল, 'ওসব মনের ব্যাপার আমি ঠিক ভাল বুঝি না, তুমি প্রণবকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

'আমিও ও-ব্যাপারে আনাড়ী।'

'সত্যিই ভাল লাগে না কিছু।'

মিহির ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল 'লাগবে, আর ক'দিন যাক, দেখবে সব ভাল লাগছে।'

কল্যাণী বলল, 'আমি কিন্তু ইয়াকি মারছি না।'

'আমিই কি মারছি নাকি?' মিহিব সিগাবেট টেনে টেনে আবার বলে, 'যাতে ভাল লাগে, সেই ব্যবস্থাই করছি এবার।'

'যান, আপনাব কেবল বাজে কথা।' কল্যাণী অন্যদিকে চোখ ফেরায়। মুখে মিটিমিটি হাসি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা রঙটা লালচে হলো। আরো অনেক ফুটকি ফুটকি লালচে বিন্দু। সেই বিন্দুগুলো গায়ে গায়ে মিশে গেল।

সুব্রত বলল, 'দেখুন দেখুন, দাদাভাই!'

আরো লাল হয়েছে পুবের আকাশ। মনে হলো, ওখানে যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেছে।

কবি শুভর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখছে। হঠাৎ শুভর দিকে চেয়ে ও বলল, 'এই শুভদা, তুমি শীতে যে কাঁপছ!'

'ভীষণ শীত।'

'এই নাও, আমার চাদর নাও।'

'তুমি ?'

'এতেই দুজনের হবে।' রুবি চাদরের খানিকটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

সবাই অপলকে, বিস্ময়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে বিরাট গোলাকার টকটকে লাল একটা বৃত্ত আচমকা একলাফে পাহাড়ের পাশ দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলল, 'এবার তাহলে বলা যায় দাদাভাই, কপালটা আমাদের ভালই।'

মণিময় অবাক হয়ে গেছে। কেমন অভিভূত। আস্তে আস্তে বলল, 'সত্যিই সুন্দর !'

আজকের এই প্রত্যূষ কি করে যেন ওর কাছেও অন্য এক অর্থ নিয়ে এলো। মণিময় এত ভোরে কোন কালেই ওঠে না। দেরি করে ঘুম ভাঙে ওর। প্রত্যূষের এই শান্ত, সমাহিত ধ্যানস্থ সৌন্দর্য দেখার অবকাশ তার জীবনে খুবই কম এসেছে। কিন্তু আজ যে অভিজ্ঞতা হলো, বাকী জীবন সে তা মনে করে রাখবে। কোনদিনও ভুলতে পারবে না। আশ্চর্য ! কী বিরাট ঐশ্বর্যময় এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষ যেন অনন্তকাল ধরে এই লীলা করে চলেছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ এসব জায়গায় এসে তার এই দুর্লভ রূপ প্রত্যক্ষ করবে। আর নিজেদের বেঁচে থাকাকে অর্থময় করে তুলবে। এই প্রথম, হয়তো আর কখনই এখানে তার আসা হবে না। তবু লোক আসবে, দেখবে, এর শেষ নেই, শেষ হবে না কোন কালে। এভাবেই তো জগৎ চলছে। তার বাবা চলে গেছে। কাকাও আর বেশী দিন নেই। সেও থাকবে না একদিন। কোথায় কোন শূন্যালোকে মিলিয়ে যাবে। কেউ আর খোঁজে পাবে না। শোভনাও থাকবে না। ভাবতেও কষ্ট হয়। কী এক বেদনায় যেন বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। কেমন খালি শূন্য মনে হয় সব। সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। বিজলীর সঙ্গেও চিরকালের মতন তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

হায় রে, জীবনের ধন জন যৌবন, সব আয়োজনই কি এমন ঠুনকো! এতই ক্ষণিকের! চারপাশে কী গভীর এক রহস্য! মণিময় কেমন আচ্ছন্নের মতন চেয়ে থাকে।

সুব্রত পবিহাসেব গলায় বলল, 'দাদাভাইয়ের দেখা যে এখন আর শেষই হয় না!'

মণিময় তখনো চেয়ে আছে। একটু পরে শোভনা এসে আস্তে করে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'কি দেখছ গো অমন করে?'

মণিময়েব চোখে বিষণ্ণ ছায়া। শোভনাব দিকে সে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। ওব জন্যে তার হঠাৎ কেন যেন বড় মায়া হয়। কতদিনেব তার সুখ-দুঃখেব একান্ত সহচরী। সংসারেব কত তাপ-উত্তাপ, হাসি-কান্না, সব কিছুই দুজনে ভাগাভাগি কবে নিয়েছে। বুকেব ভেতবটা আবাব টন টন করতে থাকে। আস্তে আস্তে মণিময় বলল, 'জান শোভনা, আজ আমাব নতুন এক অভিজ্ঞতা হলো।'

'কি বকম?'

মণিময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাব সঙ্গেও আমাব একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, কি আশ্চর্য!' মণিময় চুপ করে থাকে অল্পক্ষণ। পরে ম্লান একটু হেসে বলে, 'আজকেই এটা প্রথম মনে এলো আমাব।'

শোভনাও কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তারও বুকের মধ্যে কষ্টটা ছড়িয়ে যায়। খানিক পবে বলল, 'এসব ভেবে মন খাবাপ কবতে নেই।'

মণিময় কেমন উদাসীন গলায় বলল, 'আগে তো ভাবিনি। এখানে এসে বোধ হয় সবাই-কই এমন কবে ভাবতে হয়।'

শোভনা ওব হাত ধবে টানল, 'চলো।'

মিহিব সামান্য চেয়ে থেকে মুচকি হেসে বলল, 'দাদাভাই যে একেবারে দার্শনিক হয়ে গেলেন!'

মণিময় ততক্ষণে অনেকটা সহজ হয়ে এলো। হেসে হেসে

বলল, 'ওটা ভাই তোমাদের একচেটিয়া ব্যাপার, আমাদের ঠিক মানায় না।' কথা বলতে বলতে ও একটা সিগারেটও ধরিয়ে নিল। সব ফর্সা হয়ে এসেছে। মণিময়রা নিচে নেমে এলো।

চা-টা খেতে খেতে আর একটু বেলা হলো।

মণিময় বলল, 'এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ কি!'

'জায়গা ঠিক করেছ দাদাভাই?' বাসনা চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু তেরছা চোখে তাকায় ওর দিকে।

'এ আর ঠিক করাকরির কি আছে, এক জায়গায় বসে গেলেই হলো।'

'তবু আগে থাকতে কেউ একবার দেখে আসুক না গিয়ে।' জয়ন্তী হাসতে হাসতে বলে।

বাসনা প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'প্রণব আর মিহির, তোমরা দুজনে গিয়ে আগে একবার দেখে এসো তো ভাই।'

'নিশ্চয়ই, এ আর এমন কি!'

'আমিও যাব।' শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি টিটোও বলল, 'আমিও।'

'চলো।' প্রণব সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'আর কেউ যাবে?'

মিহির কি ভেবে কল্যাণীর দিকে চেয়ে হাসল, 'ম্যাডামও চলো· আমাদের সঙ্গে।'

'চলুন।' কল্যাণীও উঠে পড়েছে।

মণিময় বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবে।'

সুব্রত সিগারেট ধরাল, মণিময়ও।

ধোঁয়া গিলতে গিলতে সুব্রত শোভনার মুখের ওপর চোখ রেখে হাসল সামান্য, বলল, 'নাঃ বউদি, চা খেয়ে ঠিক জুত হলো না।'

'এখন ভাই আবার চা করতে পারব না।' শোভনা চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে হেসে ফেলল। বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

'এখনই ঠিক করতে বলছি না, পরে হলেও চলবে।' সুব্রত হাসছে।

'তা করে দেব।' শোভনা ঘাড় হেলিয়ে হাসে।

মণিময় বলল, 'সবাইকেই ভাই একটু হাত-টাত লাগাতে হবে।'

'তোমাদের আর দরকার নেই, আমরাই পারব।' অঞ্জলি হাসতে হাসতে টুকিটাকি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিল।

মণিময় বাসনার দিকে তাকাল, 'তুই কিন্তু ভাই মাংসটা করবি।'

মৈত্রেয়ীরা দৌড়োদৌড়ি করছিল।

'এখন কোথাও যাবি না।' সুব্রত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল।

'যাচ্ছি না, এখানেই আছি আমবা।'

রোদ উঠে গেছে। দূবে পাহাড়েব গায়ে, গাছ-গাছালিব মাথায় তখনো কুয়াশার বেণু লেগে বযেছে। পাখি উড়ছে, চিৎকার চেঁচামেচি বাড়ছে। ওরা রোদে এসে দাঁড়াল। বেশ আরাম লাগছে এখন। কুয়াশাও একটু একটু কবে সবে যাচ্ছে।

প্রণবরা খানিকক্ষণ পর ঘুবে এলো। বাংলোর কাছাকাছি ফাঁকা মতন একটা জায়গা ওরা বেছেছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে খানিকটা নেমে গেছে, তারপর সামান্য সমতলভূমি, পবে আবার কিছুটা উঠে গেছে। অনেকটা চড়াই উৎরাই। মাঝে মাঝে শাল গাছ, রোদও আছে, ছায়াও আছে। তার মধ্যে সবুজ নবম ঘাস।

একটু পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তখনো ঘাস মাটি ভেজা ভেজা। ওদের শব্দে কিছু পাখি উড়ে গেল। চারদিকের ছবিটাও এখান থেকে চোখে পড়ে।

গাড়ি থেকে একে একে সব জিনিস নামানো হলো।

শঙ্কর টিটো একটা বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। বিউটিরাও চুপচাপ বসে নেই। গায়ের গরম চাদর জামা খুলে ফেলেছে। মৈত্রেয়ী রুবি হাত ধরাধরি করে দৌড়চ্ছে। শুভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাসছে। শাল গাছের আড়ালে থেকে কে কাকে

ধরবে সেই লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। এক ফাঁকে রুবি এসে শুভর হাত ধরে টানল, 'ছুটবে এসো, হাঁদার মতন দাঁড়িয়ে আছে।' খিল খিল করে হেসে উঠল রুবি। একটু পরে দুজনই দৌড়তে লাগল।

কেউ কাউকে ধরতে পারছে না। এঁকেবেঁকে খালি দৌড়চ্ছে। মৈত্রেয়ী বিউটি খেলার টানে টানে ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। গাছের আড়ালে পড়েছে ওরা। ধারে কাছে আর কেউ নেই, ফাঁকা। গাছের পাতায় রিণরিণ শব্দ। শাল গাছের নেশা নেশা গন্ধ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। রুবি একসময় একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও হাঁপাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শুভর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হেসে রুবি বলল, 'তুমি এত বোকা কেন গো শুভদা!'

'কেন?' শুভও হাঁপাচ্ছে। ওর মুখটা আরো লাল হয়েছে। জায়গাটা কেমন নির্জন। বাতাসে শালপাতা নড়ছে। গলার স্বরটা কেমন ভেঙে গেল।

রুবি অন্যদিকে চেয়ে থাকে। কী এক আবেগে তার শরীর যেন বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কি কিছু বোঝ না?'

শুভ তাকিয়ে থাকে। রুবি তাকে এখানে এনে এসব কথা বলছে কেন? শরীরে কাঁটা দিল।

'তোমাকে কত ইশারা করে আমাদের গাড়িতে আসার জন্যে ডাকলাম। তুমি এলে না, ভীষণ হাঁদা তুমি।'

শুভ চুপ। রুবি হঠাৎ এগিয়ে আসে কাছে। গাঢ় চোখে ওকে অপলকে দেখে। ওর চোখে যেন এখন অন্য কথা। অন্য নেশা। চোখের পাতা ভারী ভারী। দৃষ্টি সামান্য আচ্ছন্ন। চোখ-মুখ শরীর আরো রক্তিম হয়ে উঠেছে। শুভর গায়েও ওর তাপ লাগছে। খানিক পরে রুবি শুভকে বলে, 'দেখ তো, আমার পিঠে কি একটা কামড়াচ্ছে, উঃ, ভীষণ জ্বালা করছে।'

শুভ ওর পিঠে হাত দিল, 'কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না তো।' শুভর গলা কাঁপল, হাত কাঁপল।

'তুমি ভীষণ বোকা, এভাবে দেখা যায়! আরে বোকারাম, বোতামগুলো খোলই না, ইস, ভীষণ জ্বালা করছে, তাড়াতাড়ি কর।'

শুভর তখনও হাত কাঁপছে।

'না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, ভাল ছেলেই হয়ে থাকবে।' রুবি ব্লাউজের বেতামগুলো পটপট খুলে ফেলে।

শুভর শরীরে মুহূর্তে কী এক বিদ্যুৎ খেলে যায়। এ সে কী দেখছে! তার কেমন ভয় করতে লাগল। সে আড়ষ্ট, ভীরু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

ব্লাউজটা অনেকখানি তুলে ফেলেছে রুবি। আরো কাছে সরে এসে বলে, 'দাও, পিঠটা একটু চুলকে দাও।'

শুভও যেন কী এক নেশায় ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছে। সে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। পরে একটা লাল পিঁপড়ে ধরে এনে ওর মুখের সামনে দেখাল, 'এই নাও।'

রুবি এক ঝটকায় সরে গেল। ব্লাউজের বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ার মতন করে বলল, 'তুমি, তুমি না একটা ভীষণ··।' মুখে আঁচল চেপে ও দৌড়ে চলে গেল।

রুবির এই আচমকা চলে যাওয়ায় শুভ আরো যেন কেমন বোকা হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে কেমন একটু অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটতে লাগল আবার। এই সকালেও তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

লছমন আর একজন ড্রাইভার দুজনে মিলে উনুন বানিয়ে আগুনও ধরিয়ে দিয়েছে। বড় বড় দুটো শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। তার ওপর সবাই বসেছে।

মণিময় একটু কাত হয়ে শোয়ার ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে দিল,

সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'এবার ভাল করে চা খেতে হবে, গায়ের বেজুত ভাবটাই গেল না।'

অঞ্জলি বেগুন আলুর টুকরি নিয়ে বসেছে। বলল, 'আগে জলখাবারের ব্যবস্থাটা হোক, তারপর তো।'

উনুন ধরে গেছে। শোভনা একটা ডেকচিতে বেসন ঢালল, তাতে খাবার সোডা নুন হলুদ জল মেশাল।

অঞ্জলি বেগুন আলু ফালা ফালা করছে। বেগুনী, আলুর বড়া হবে। সকালে তেলেভাজা মুড়ি চা।

উনুনে কড়াই চাপিয়েছে শোভনা, তেল হয়ে এলে বেসন মিশিয়ে বেগুন ছাড়ল।

মণিময় দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'এদিকে নিয়ে আয় রে।'

শোভনা মিষ্টি করে হেসে বলে, 'সবুর সয় না, রামপেটুক সব!'

জয়ন্তী একটা বড় বাটিতে করে গরম গরম বেগুনী নিয়ে এলো। ওদের সামনে রেখে বলল, 'মুড়ি দিয়ে খাও, আরো ভাল লাগবে।'

সবাই একটা একটা করে তুলে নিল।

মণিময় চিৎকার করে উঠল, 'উঃ, আমার জিভ পুড়ে গেছে রে!'

'বেশ হয়েছে, যেমন লোভ!' শোভনারা হেসে উঠল।

শঙ্কর, টিটো ছুটে এলো, 'আমাকে দাও, আমাকে দাও।'

'ওখানে আগে চুপ করে বস, সবাই পাবে।'

মণিময় ডাকল, 'এখান থেকে নিয়ে যা।'

কল্যাণী শোভনাকে সাহায্য করছে, কোমরে আঁট করে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়েছে।

বাসনা আনাজ কুটছে।

মৈত্রেয়ীরা ফিরে এসেছে। ঘামছে।

'কোথায় গেছলি রে তোরা?' জয়ন্তী শুধলো।

'খেলছিলাম।'

একটু পরে রুবি এলো।

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে ওর দিকে চেয়ে বলে, 'কিরে, কোথায় পালিয়ে গেলি তোরা?'

'কোথায় আর যাব, ওখানেই তো ছিলাম।' রুবিকে কেমন একটু মনমরা দেখাচ্ছে।

সামান্য পরে শুভও এলো। রুবি কেন যেন তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারছে না ওর দিকে।

শোভনা কল্যাণীকে বলল, 'তুমি বরং স্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দাও, দেখছ না, চা-চা করে মবে যাচ্ছে।'

কল্যাণী স্টোভ ধরাল। চাযের জল চাপিযে দিযেছে।

মণিময় একটা আলুব বড়া তুলে নিতে নিতে প্রণবকে বলল, 'কিহে, তুমি যে কিছু বলছ না!'

প্রণব মুখ টিপে টিপে হাসছে। বলল, 'গরম গবম তেলেভাজা এসে গেছে দেখে আপনাকে আর বিরক্ত করছি না।'

'প্রফেসরেব কথাটা শুনেছ একবাব?' মণিময হাসছে।

'এসব ক্ষেত্রে বেশী কথা না বলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।' মিহির হেসে হেসে একটা সিগাবেট চেয়ে নিল।

'কি ব্যাপার, এখনও চা দিচ্ছে না কেন এরা?' মণিময উসখুস করল, পবে মিহিবের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি একটা হাঁক দাও তো!'

মিহির ঘোষকেব মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা চা পাইনি এখনও।'

জয়ন্তী সুর করে করে ভেঙ্গাল, 'চা আজ পাবে না।'

সবাই হাসতে লাগল।

প্রণব একটু পরে হাসতে হাসতে মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার একটা দারুণ মজার গান মনে পড়ে যাচ্ছে।'

সুব্রত উৎসাহের গলায় বলে, 'তবে আর চুপ করে আছেন কেন, শুরু করে দিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব জিনিস চেপে রাখতে নেই।' মিহির সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল।

প্রণব গলা ছেড়ে গান ধরে, 'বিভব সম্পদ, ধন নাহি চাই,/যশ মান চাহিনা ; /শুধু বিধি, যেন প্রাতে উঠে/পাই ভাল এক পেয়ালা চা।'

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

বাসনা হাসতে হাসতে শোভনার দিকে তাকায়, 'ও এত মজার গান শিখল কোত্থেকে গো!'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ গায় কিন্তু।'

'কি করে শিখেছে জানি না, তবে শুনে তো মনে হয় ভালই গায়।' শোভনা আবো কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বলল, 'অনেকদিন ধরে তো ওকে দেখছি, স্বভাবটিও খুব ভাল।'

কল্যাণী চা করতে করতে ওদের কথা শুনছে। আর মুখ লুকিয়ে হাসছিল।

বাসনা কি ভেবে শুধোয়, 'বাড়িতে ওর কে কে আছে?'

'মা, ভাইবোন সবাই আছে। ওব একার ওপরই সব দায়-দায়িত্ব।'

'ওব বোনদের এখনও বিয়ে হয় নি?'

'না।' শোভনা বাসনার মুখেব দিকে চাইল একবার, বলল, 'আমি অবাক হয়ে যাই, এত ঝামেলা নিয়েও ও কি করে এমনভাবে হাসে, গান গায়!'

প্রণব আবার শুরু কবেছে, 'তার সঙ্গে যদি টোস্ট ডিম্ব থাকে,/ আপত্তিকর নয় তা ; /শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে/ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।'

জয়ন্তী হেসে কুটিকুটি, বলল, 'একেবারে দাদাভাইয়ের মনের মতন কথা।'

মৈত্রেয়ীরাও হাসছে সমানে। রুবি একটু ম্রিয়মাণ। শঙ্কররা হেসে গড়াগড়ি।

প্রণব বেগুনী মুখে পুরল, 'শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্তেরি আর,/ খাও যার খুশী যা ;/শুধু কেড়েকুড়ে নিও না আমার/আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা !'

মিহির এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল, 'এসে গেছে, এসে গেছে।'

কল্যাণী বলল, 'এই নাও দাদাভাই তোমাদেব চা, উফ্, চায়ের জন্যে মাথা খাবাপ কবে দিলে।'

'সে তুমি কি বুঝবে ম্যাডাম !'

'বুঝে আমার দবকার নেই।' কল্যাণী মুখ টিপে হাসছে।

মণিময় চায়ে চুমুক দিযে পরিতৃপ্ত গলায বলে, 'আঃ, দারুণ করেছিস রে !' মণিময় আবাব একটা সিগাবেট ধরিয়ে নেয়।

'কদিন ধরে খুব সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।' প্রণবও ধরিয়ে নিল একটা।

'আমার তো জিভ এখন জ্বালা কবছে।' মণিময় জিভ বের করে একবাব দেখল।

প্রথম পর্ব শেষ হতে হতে আরও বেলা বাডল। বাতাস এখন শুকনো। ঝকঝকে আকাশ। বোদে পিঠ দিয়ে বসতে আরাম লাগছে।

প্রবীব এক কোণে গিয়ে মুরগী কাটছে। শঙ্কর টিটোও ওর সঙ্গে।

শোভনা উনুনে বাঁধা কপি বসিযেছে। ওতে মাছের মুড়ো, কাঁটা পড়বে। আগেই বাড়ি থেকে মাছ ভেজে এনেছে বাসনাও কাজে ব্যস্ত। রুবি কডাইশুটির খোসা ছাড়াচ্ছে।

মণিময় জয়ন্তীকে বলল, 'তুই এদিকে আয়, একহাত টুয়েন্টি-নাইন হযে যাক।'

'দাদাভাই যা চোট্টামি করে না, হেরে ভুত হয়ে যাবে তোমরা।' মিহির হাসছিল।

'তোমার কাছে কিছুই নই ভাই।' মণিময় সিগারেট খেতে গিয়ে কাশল একবার।

মিহির দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুব্রত ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি চললে কোথায় ?'

'একটু ঘুরে আসি।'

'তাহলে আর খেলাটা কাকে নিয়ে ?'

জয়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'ওরা না হলে খেলা হবে না ভাবছ ? এই শুভ, তুই ওদিকে বস তো।'

মিহির ঝুঁকে এসে মণিময়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শুভকে আপনার পার্টনার নিন, ভাল খেলে ও।'

'কানে কানে আবার কী মন্তর পড়া হচ্ছে !' জয়ন্তী হাসছিল।

মিহির প্রণব কল্যাণী মৈত্রেয়ী বিউটি রীণা ওরা ঘুরতে বেরিয়ে গেল। রুবি যায় নি।

ওরা পালামৌ বাংলোর কাছে চলে এসেছে। মৈত্রেয়ী কেন যেন ফিরে গেল আবার। তলপেটের ওখানে চিনচিন করে ব্যথা করছে হঠাৎ। তাছাড়া হাঁটতেও আর ভাল লাগছিল না ওর।

মিহির একসময় কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এভাবে হাঁটলে তো চলবে না ম্যাডাম।'

'আপনি জোরে জোরে হাঁটুন না, কে বারণ করছে !'

মিহির চোখের কী এক ইশারা করল। পরে জোরে জোরে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা তোমার দলে নেই। চলে এসো বিউটি।' মিহির রীণাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ওরা অন্যদিকে গেল।

কল্যাণী হাসি-হাসি চোখে প্রণবের মুখের দিকে চাইল। আস্তে করে বলল, 'দেখলে, মিহিরদার কাণ্ডটা একবার দেখলে ?'

'দেখলাম তো ! ভীষণ কন্‌সিডারেট।' প্রণবের মুখেও হাসি।

'মিহিরদা ভীষণ ভালবাসে আমাকে।'

'তুমি ওকে সবই তো বলেছ।' প্রণব ওর চোখে চোখে তাকায়।

কল্যাণী আস্তে আস্তে হাঁটছিল, বলল, 'দেখলাম, মিহিরদাকে দিয়েই কথাটা বলালে ভাল হয়।'

প্রণব সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে বলে, 'দেখ কি হয়!'

'এ আর ভাল লাগছে না আমার।' কল্যাণীর দৃষ্টি আনত।

প্রণব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'তোমার বাবাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে।'

কল্যাণী ওর চোখের দিকে চেয়ে হাসে, 'বাবাকেও বলতে পারতাম, কিন্তু দাদাভাই সুব্রতদা মিহিরদা যা বলবে, তাই হবে।'

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে, 'সুব্রতদাকে কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হয়।'

'খুব বড়লোক ওরা।'

কথাটা খচ করে প্রণবের বুকে কেমন বিঁধে যায়। ও চুপ করে থাকল।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে আবার। ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটু উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়াল। শালবন, মাঝে মাঝে অন্য গাছও আছে। এখান থেকে সব দেখা যায়। এরই মাঝে এক-আধ ফালি ফসলের ক্ষেতও চোখে পড়ে। ওদের সাড়া পেয়ে পাখি উড়ে গেল। গাছের ডালে ডালে কিছু লাল বাঁদর লাফালাফি করছে।

এসব দেখতে দেখতে প্রণব একসময় বলল, 'বাহাদুরি আছে, একেবারে পাহাড়ের মাথায় এমন একটা জায়গা তৈরী করা।'

কল্যাণীও কেমন বিভোর, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নরম গলায় একসময় বলল, 'এখানে কিছুদিন থেকে গেলে মন্দ হয় না!'

প্রণব হাসল। পরে হালকা পরিহাসের গলায় বলল, 'চলো তুমি আর আমি এখানে থেকেই যাই।'

'আহা, কী মজার কথা!' কল্যাণী খিল খিল করে হাসল।

'তাহলে ভীষণ মজা হয়!' প্রণবের গলায় কেমন ছেলেমানুষি সুর। চোখের তলায় চাপা এক রহস্য।

'এখনই আর অত মজার দরকার নেই।' কল্যাণী চোখের কোণে নিষেধের এক নরম ভাব ফুটিয়ে তোলে।

প্রণব কৌতুক বোধ করছিল। সামান্য হেসে বলল, 'আরে না, এখনও অধিকারই বর্তাল না, তা মজা!'

কল্যাণীর চোখে-মুখে হঠাৎ একরাশ লজ্জা নেমে এলো যেন। ও মুখ নিচু করে হাসছিল। একটু পরে মুখ তুলে বলল, 'চলো, বসি এখানটায়।'

কল্যাণী প্রণবের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। জায়গাটা নিরিবিলি, নির্জন। ও হাসতে হাসতে বলল, 'মিহিরদারা আর খুঁজে পাবে না আমাদের।'

কল্যাণী ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে মিটিমিটি হাসছে। বলল, 'একবারও একটু যদি ফাঁকায় পাই তোমাকে!'

পাতার আড়ালে থেকে একটা পাখি শিস দিচ্ছে। অসংখ্য টুকরো টুকরো রোদ্দুর আশপাশে পড়ে আছে। ওদের ওখানে ছায়া ছিল।

কল্যাণীর শরীরের মিষ্টি একটা গন্ধ প্রণবের নাকে এসে লাগছে, 'গন্ধটা তো দারুণ!' প্রণব টেনে টেনে ঘ্রাণ নিল।

'কিসের গন্ধ বলো তো?'

'কি জানি, তোমার শরীর থেকেই তো আসছে।' প্রণবের চোখে দুষ্টুমি।

'যাঃ!' কল্যাণী আস্তে একটা চড় মারল ওকে, বলল, 'ওটা চুলের গন্ধ, দেখ।' মাথাটা প্রণবের নাকের কাছে নিয়ে এলো।

প্রণব হাসছিল, 'তা হোক, তোমার শরীরেও ওরকম একটা গন্ধ আছে।'

'অসভ্য!' কল্যাণী চোখ পিটপিট করে ভেংচাল।

প্রণব এবার ঘাসের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। হাতে সিগারেট পুড়ছে।

'কি, একেবারে শুয়ে পড়লে যে!'

'ভীষণ ভাল লাগছে। ইচ্ছে হলে তুমিও শুতে পার।'

কল্যাণী কিছু বলল না, শুধু হাসল। একটু পরে প্রণবের ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি দিল।

'এই, কি হচ্ছে!' প্রণব হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেল।

কল্যাণী একটু কাত হয়ে সরে গেল। হেসে বলল, 'পাবলে না তো, হেবো!'

'হেবো হেবো বলবে না বলছি!' প্রণবও হাসছে।

'বলবই তো।' কল্যাণীর গলায় অন্য স্বর। চোখের রঙ আলাদা।

প্রণব ওর দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারল না। হঠাৎ ওর চোখ দুটোও কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে। কি খেয়াল চাপল মাথায়, উঠে এসে ঝপ করে ওকে ধরে ফেলল। বলল, 'এইবার।'

'এইবার আর কি!' কল্যাণী ওর বুকে মুখ রাখল। নিশ্বাস গরম।

প্রণব কেমন একটু অপ্রস্তুত। ভাঙা গলায় বলল, 'এই!'

কল্যাণী চোখ তুলল।

'তোমার গা এত গরম!'

কল্যাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে। বলল, 'দেখ তো জ্বর এলো নাকি!' বলে একটা হাত টেনে নিয়ে আঁচল সরিয়ে ওর বুকের ওপর রাখল।

প্রণবের মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগল। তার গায়েও যেন তাপ উঠেছে।

কল্যাণী যেন তাকে একটু একটু করে নেশা করাচ্ছে। রহস্যের হাসি হেসে বলে, 'কেউ আসবে না তো এখানে?'

প্রণব অস্ফুটে বলে, 'না না, কেউ আসবে না, কেউ না।' প্রণব ওকে জড়িয়ে পর পর অনেকগুলো এলোপাথাড়ি চুমু খেল। গালে ঠোঁটে চোখে ঘাড়ে। কল্যাণীও এরকম কিছু একটা চাইছিল। ওর চোখে ঘোর। ও-ও তখন প্রণবকে জড়িয়ে ছটফট করছে। গলা শুকিয়ে চট চট করছে। ওর গায়ে যেন কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর নিজেকে ও

একরকম জোর করেই সরিয়ে নিল। আর পারছে না। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল। শাড়ি ব্লাউজ ঠিক করল। শান্ত হতে আরও একটু সময় লাগল।

প্রণব এখন কল্যাণীর কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। কল্যাণী ওর চুলে বিলি কাটছে। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে ডাকল, 'এই!'

'হুঁ।'

আবার চুপ করে থাকে কল্যাণী। একটু পরে বলল, 'তোমরা চলে গেলে আমি এখানে থাকব কি করে বলো তো?' ওকে কেমন কাতর, বিষণ্ন মনে হলো।

প্রণব শুয়ে শুয়েই জবাব দেয়, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার কথা আমারও খুব মনে পড়বে।' ওর গলাও কী এক বেদনায় ভেজা রয়েছে।

'ভাবলে এখনই খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।' কল্যাণী অন্যমনস্ক হয়।

'তোমাকে যে কখনো এত কাছে পাব ভাবিনি কল্যাণী।'

'এর ফলে কষ্ট তো দুজনেরই বাড়ল।' আরো কিছুক্ষণ পর ও আবার বলল, 'যখন দূরে ছিলে তোমার কথা তখন অনেক ভেবেছি, কষ্ট হত খুব; এবার আরো কাছে এলে তুমি, দুজনে আরো ঘনিষ্ঠ হলাম, এখন এর জ্বালা যে আরো বেশী প্রণবদা!'

'এ তো শুধু তোমার একার নয়।'

'তা নয়, কিন্তু আমাকে যে এই নির্জন পুরীতে একা একা থাকতে হবে।'

'আমিও এখান থেকে এবার আর এক নতুন নির্জনতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি কল্যাণী।'

'গিয়ে চিঠি দেবে না?' কল্যাণী গাঢ় চোখে চেয়ে থাকে।

'কেন দেব না? একটা নয়, দেখবে, অনেক অনেক চিঠি দেব।' প্রণব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরমুহূর্তেই শুধোয়, 'তুমি?'

কল্যাণী ঘাড় হেলিয়ে মিষ্টি করে হাসে, 'দেব গো মশাই, দেব।'

প্রণবের হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এবার সে উঠে বসল। একটু পরে থুতনীটা কল্যাণীর কাঁধে রেখে আস্তে আস্তে ডাকল, 'কল্যাণী!'

কল্যাণী মুখ ঘোরায়। ওর গালে প্রণবের গাল লাগছে। কেমন জড়ানো জড়ানো গলায় বলে, 'কি?'

প্রণব সিগারেট ধরিয়ে আরো কী যেন ভাবল। পরে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'জান তো, আমি খুব গরীব।'

কল্যাণী ওর চোখে চোখে চেয়ে আছে। পরে নতমুখী হয়ে অস্ফুটে বলে, 'হঠাৎ এসব কথা?'

'হঠাৎ নয় কল্যাণী, এগুলো তোমাকে জানানো আমার দরকার।' প্রণব সিগারেটে টান দিল কয়েকবার। ওর মুখের রেখায় বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ছোট ছোট অনেকগুলো ভাইবোন, অনেক দায়-দায়িত্ব।'

'আমি সব শুনেছি প্রণবদা।' কি ভেবে কল্যাণী হাসল। খানিক পরে বলল, 'দায়িত্ব নিতে আমি নিজেও অত ভয় পাই না।'

'কথাটা আমার মনে থাকবে।' প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিগারেট টানল। একসময় বলল, 'তোমার জামাইবাবুদের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই এটুকু বুঝেছ, এসব বিষয়-আশয়ে আমার লোভ একটু কম।'

'ভয়টা তোমাকে নয় কল্যাণী, অন্য জায়গায়।'

আবার চুপচাপ। একটু পরে কল্যাণী বলল, 'এবার কলকাতায় গিয়ে তুমি আর আমি দুজনে খুব ঘুরব।' কি মনে পড়ল আবার, বলল, 'তুমি সঙ্গে থাকলে কোন ভয় নেই আমার। ভাগ্যিস সেদিন ধরে ফেলেছিলে আমায়, না হলে তো মরেই যেতাম।'

'মরা কি এত সহজ নাকি!' প্রণব হাসতে লাগল।

বেলা বেড়েছে। ছায়াটা আরো কমে এলো।

কল্যাণী দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'ধরো, সত্যি সত্যিই যদি আমি মরে যাই।'

প্রণব চমকে উঠেছে। চিৎকারের মতন বলল, 'না, এসব কথা তুমি বলবে না, বলবে না।' ও কল্যাণীর মুখে হাত চেপে ধরে।

কল্যাণী খিল খিল করে হেসে উঠে, 'এত ভয় তোমার!'

প্রণব চুপ করে থাকল।

রোদের দিকে চেয়ে এতক্ষণে খেয়াল হলো কল্যাণীর, 'এই প্রণবদা, আজ কপালে ভীষণ বকুনি আছে।' বলতে বলতে উঠে পড়েছে কল্যাণী। প্রণবও হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

প্রণব একবার পেছন ফিরে তাকাল, বলল, 'এখানকার এই গাছপালা পাহাড় আকাশ সবার কাছে আমি চিরদিনের জন্যে ঋণী থেকে গেলাম।'

'এই ঋণ যে আমারও।' ওরা পাশাপাশি উষ্ণ নম্র সান্নিধ্যে আরো কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল।

বাংলোর কাছাকাছি এসে প্রণব কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গালটা ভাল করে মুছে নাও।'

কল্যাণী চোখ নত করল। আঁচল দিয়ে মুখটা বার বার করে মুছে নিল। বুকের ভেতরটা কি এক আবেগে উচ্ছ্বাসে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

সবাই প্রায় চান-টান করে নিয়েছে। কল্যাণী হেসে হেসে এগিয়ে এলো।

শোভনা বলল, 'যাও, আগে চান সেরে এসো, তোমার দাদা ভীষণ রাগারাগি করছে।'

কল্যাণী কিছু না বলে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রণবকে দেখে মণিময় প্রথমটায় কোন কথা বলল না। একটু পরে গম্ভীর, সামান্য ক্রোধের গলায় বলল, 'কোথায় গেছলে তোমরা?'

প্রণব হাসবার চেষ্টা করল, 'এই কাছেই।'

'কাছেই, মিথ্যে কথা বলো না। মিহিররা কখন ফিরে এসেছে, যদি কিছু একটা হয়ে যেত এখানে, কে দায়ী হতো তার! পাহাড়ী জায়গা, কত রকমের বিপদ-আপদ আছে।'

প্রণব কিছু বলতে পারছে না। তবে বুকের ভেতরে কী এক কষ্ট কেবল মোচড় দিয়ে উঠছে। মণিময়দার এই অপ্রসন্ন, উত্তেজি মুখ আগে আর কখনো সে দেখেনি। মুহূর্তে সবকিছু কেমন বিষাদে ভরে গেল। মিহিরও কেমন অপ্রস্তুত।

মণিময় একটু পরে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যে বলল, 'তোমার যদি মাইরি কোন বুদ্ধি থাকে প্রণব।'

প্রণবের চোখদুটো কেমন ঝাপসা হয়ে ওঠে।

খেতে খেতে আরো বেলা হলো ওদের। একটু বিশ্রাম করে আবার তৈরী হয়ে নিল সবাই। রোদ মাঠের ওপর থেকে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। মাটির গ্লাস পাতা পড়ে থাকল।

সকালের সুরটা দুপুরের পর থেকেই কেটে গেছে। মণিময় হাসাবার চেষ্টা করেছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কিও হয়েছে। প্রণবের কাছ থেকে সিগারেটও চেয়ে নিয়েছে। প্রণব সহজ হওয়ার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারেনি। অভিমানে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে। কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। আগের সুর আর উঠছে না।

শোভনা একফাঁকে বলেছে, 'রাগ করতে নেই ভাই।'

কল্যাণীও কারো সঙ্গে কোন কথা বলছে না।

বিকেল হয়ে আসছে। সূর্যাস্ত দেখার জন্যে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠল ওরা। অপেক্ষা করে করেও নিরাশ হতে হলো। আলো ফুরিয়ে আসা আকাশ কখন একসময় কুয়াশায় ঢেকে গেল, দেখা হলো না।

অন্ধকার কেটে চাঁদ উঠলেই ওরা ঘরের পথ ধরবে আবার। এখন তারই প্রস্তুতি চলছে।

বার

সকলের মনেই একটা প্রশ্ন একটু একটু করে দানা বাঁধছিল। বাসনা বলল, 'কি রকম যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি বউদি!' শোভনার চোখে চোখে চেয়ে ও সামান্য গম্ভীর হলো।

শোভনা অবাক হলো যেন, বলল, 'গন্ধ, কিসের গন্ধ?'

বাসনা মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'আহা, যেন কিছুই বুঝতে পারছ না!'

'জানই তো ভাই, আমার বুদ্ধিটা একটু কম, বুঝিয়ে না বললে আবার বুঝি না।'

'তুমি যা এক-একটা কথা বল বউদি!' একটু থেমে শোভনার চোখে চোখ বেখে বাসনা আরো যেন কি ভাবল। পরে সামান্য ঠাট্টার গলায় আবার বলল, 'এ-বাড়ির বাতাসে এখন অন্যরকম এক গন্ধ।'

শোভনা হাসল না, বলল, 'আমি বাপু অতশত বুঝি না, হেঁয়ালি বাদ দিয়ে বলেই ফেল না।'

'সত্যি কিছু শোননি তুমি?' বাসনা অবাক।

'না ভাই, তোমার কথা তো কিছু ধরতে পারছি না।'

'তোমাদের প্রণব গো!' বাসনা একটু গম্ভীর। অপ্রসন্ন।

'হ্যাঁ, কি করেছে প্রণব?'

'সে পরে শুনবে।'

শোভনা চুপ করে থাকে। সেও যে ব্যাপারটা না বুঝেছে এমন নয়। আভাসে ইঙ্গিতে সেও একটা আঁচ করেছে। তবু না বোঝার ভান করেছে সে। কারণ এতে শোভনা যেন একধরনের অস্বস্তি বোধ করছিল। এটা কে যে কিভাবে নেবে, সে জানে না—সবচেয়ে বড় কথা, প্রণব এ-বাড়িতে পরিচিত হলেও ও তাদের সঙ্গে এসেছে;

সুতরাং, ওর সম্পর্কে বিরূপ কোন আবহাওয়া তৈরী হলে শোভনাও দুঃখ পাবে। এটা যেমন একটা দিক, এর অন্য একটা দিকও আছে। এখানে তাদের পরিচয় ধরেই প্রণব এসেছে। কাকীমাও মনে মনে কি ভাববেন। মুখে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও হয়তো মনে মনে এজন্যে তিনি তাদেরই দায়ী করবেন। শোভনার কাছে তাই গোটা জিনিসটাই কেমন অপছন্দের, অস্বস্তিকর। অথচ এ ব্যাপারে সরাসরি কাউকে কিছু বলতে পারছে না। শুধু মণিময়ের সঙ্গে গত রাত্রে শুয়ে শুয়ে এ নিয়ে একটু আলোচনা করেছে। মণিময়ও যেন এটাকে সহজভাবে নিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে সে শোভনাকে বলেছিল, 'আগে জানতে না?'

'কি করে জানব?'

'খুব বাজে ব্যাপার হয়ে গেল।' মণিময় ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

'কিছু বলার এখন দরকার নেই, তার চেয়ে চল, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা চলে যাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিময় বলেছিল, 'কল্যাণীটা বড় বোকামো করছে, এ তো হয়ই না, অসম্ভব।'

শোভনা এ নিয়ে আগেই খানিকটা আলোচনা করে রেখেছে। তবু ওদের সামনে তা বুঝতে দিল না। ওর মুখের ওপর ম্লান একটা ছায়া কাঁপছে। প্রণবকে কিছু বললে তারও খুব কষ্ট হয়। তার ভাল লাগে না। প্রণবকে সে ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করে, ভালবাসে। ওর স্বভাব চরিত্র কত মিষ্টি, কত ভদ্র ছেলে! সংসারে এসবের কি কোন দাম নেই! ও গরীব, এটাই কি ওর অপরাধ! সে নিজেও তো গরীব ঘরে থেকে এসেছে! এ নিয়ে প্রণবকে কিছু বলা মানে, ও আরো কষ্ট পাবে। শোভনার চোখ ছলছল করে।

অঞ্জলি কাছে ছিল, বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

জয়ন্তী বলল, 'আপত্তি কি, প্রণব তো আর আজে বাজে ছেলে নয়।'

বাসনা বলল, 'আমরা তো আর সব জানি না।' ওর গলায় একটু উপেক্ষা ছিল।

'এতে আর জানাজানির কি আছে, দেখে বোঝা যায় না।'

বাসনা একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'কিন্তু ছেলেটাই তো এখানে সব নয়, ছেলের পরিবারটাও দেখতে হয়, তার আত্মীয়-স্বজন ঘর-দোর সব কিছুই।'

অঞ্জলি বলল, 'কাকীমা বোধহয় কিছু কিছু শুনেছে, মোটেই এতে রাজী হবে না।'

জয়ন্তী ওর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'মা যে কি চায়, বুঝি না।'

বাসনা ওর মুখের দিকে তাকাল, 'কেন রে, মা কি চায় আমাদের দিয়ে বুঝিস না?' একটু সময় নীরব থেকে ও ফের বলল, 'প্রত্যেকেরই এক-একটা ইচ্ছে থাকে, সমান-সমান ঘর না হলে আদব-কায়দায় বড় অসুবিধে।'

'সবটাই কপাল বড়দি।'

'এটা কোন কথা নয়।' বাসনা ম্লানভাবে হাসল।

'তোমাদের সঙ্গে আমার কেন যেন মেলে না।' জয়ন্তী চলে গেল।

বাসনাও আর দাঁড়াল না সেখানে।

ওরা চলে গেলে অঞ্জলি বলল, 'তুমি ওসবের মধ্যে যেও না বউদি, কাকীমা খুব চটে গেছে, কল্যাণীকে ডেকে বকেওছে।'

'আমার কি দরকার, তোমাদের ব্যাপার, তোমরা বুঝবে।' শোভনাকে কেমন গম্ভীর ও সামান্য বিরক্ত মনে হলো। হঠাৎ বাড়িটায় কেমন এক সন্দেহ, ফিস ফিস, অস্বস্তি, চাপা ক্ষোভ এসে ঢুকে পড়েছে। গোটা সুরটাই যেন আচমকা কেটে গেল। কিছুতেই বুঝি আর জোড়া লাগবে না। এর মধ্যেও শোভনা প্রণবের জন্যে একটু কষ্ট বোধ করছিল। অনেকদিন থেকেই ওকে দেখছে

তারা। রুবি শঙ্কর তো প্রণবকাকু বলতে অজ্ঞান। আজকের দিনে এমন নিরহঙ্কার ভদ্র সৎ ছেলে খুব কমই চোখে পড়ে। অথচ এদের কাছে এসবের যেন কোন দাম নেই। বাইরের আড়ম্বর ঝাঁকটাই কি সংসারে সব? বেশী কদর কি ওটারই? শোভনার বাবাও গরীব ছিলেন। অভাব দারিদ্র্য ছেলেবেলায় সেও দেখেছে। প্রণবের দুঃখটা যে শোভনাও বুঝতে পারে। বড় ভুল জায়গায় এসে পড়েছে ও। হয়তো ওর সরলতাই ওকে এমন এক চোরা-বালিতে নিয়ে এসেছে। কল্যাণী হয়তো ওকে ভালই বাসে। কিন্তু তার দাম কতটুকু। তাছাড়া সে তো এদের ভাল করেই জানে, চেনে। তবু এমন একটা ভুল করল! কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার।

ক্ষীরোদবাবু মণিময়, প্রবীর এবং জামাইদের তাঁর ঘরে ডেকেছেন। স্নেহলতাও পাশেই বসে আছেন। হেমলতাও কি একটা কাজে এ-ঘরের দিকে এসেছিলেন, এসে আর যেতে পারেন নি।

ক্ষীরোদবাবু সকলের মুখের দিকেই ধীরে ধীরে তাকালেন। ম্লান একটু হাসলেন, শেষে বললেন, 'যে কারণে তোমাদের ডেকেছি, এখানে তোমরা সবাই রয়েছ।' ক্ষীরোদবাবু চুপ করলেন। মনে মনে কি ভাবলেন যেন। পরে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'ভাবছিলাম, কল্যাণীর বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার, আমার বয়েস হয়েছে, শরীরের অবস্থাও ভাল নয়।' ক্ষীরোদবাবু তাকালেন মণিময়ের চোখে চোখে। তিনি যেন তখনও কি ভাবছিলেন। চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'আমার ইচ্ছে, আমি থাকতে থাকতেই ওর বিয়েটা হয়ে যাক।'

স্নেহলতা এবার জামাইদের চোখে চোখে তাকালেন। অল্প একটু হেসে বললেন, 'তোমাদের খোঁজে যদি কোন ভাল ছেলে-টেলে থাকে তো দেখো।'

'কি হে সুব্রত, আছে ?' মণিময় ওর দিকে চাইল একবার।

'ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হলেই ভাল হয়। স্নেহলতা হেমলতার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি কি বল দিদি ?'

'আমারও সেই মত, বংশটা যেন ভাল হয়, বনেদী।'

সুব্রত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমার এক মাসতুতো ভাই আছে, অবস্থা খুবই ভাল, গেল বছর ডাক্তারী পাশ করেছে ও।'

'এ তো জানা শোনার মধ্যেই, খুবই ভাল হয়।'

'দেবি না করে তুমি তাহলে তোমার মেসোর সঙ্গে একবার কথাবার্তা বল সুব্রত।' মণিময় ধীরে ধীরে চোখ ফেরাল। মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, 'কি হে, তুমি কিছু বলছ না যে !'

'আমি আবাব কি বলব, সুব্রতদাই তো যা বলার বলেছে।'

হেমলতা হাসলেন, 'তুমিও বল না, কথা হয় দশখানে, হয় এক জায়গায় '

ক্ষ:বোদবাবু কি যেন ভাবলেন একবার, বললেন, 'সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটি যেন ভাল হয়।'

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, 'একটু চেনা-জানার মধ্যে হলেই ভালমন্দ, স্বভাব-টভাবটা জানা যায়।'

মি'হর সামান্য অন্যমনস্ক। কল্যাণীর মুখটা ভাবছিল শুধু। ও-তো সবই বলেছে তাকে। এ খবর শুনলে কি ও খুশি হবে ? এ কি খুশি হওয়ার মতন কোন খবব ? কেউই খুশি হয় না। এতে ও-ও খুশি হবে না। বরং মুখটা আরো যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠবে। আরো দুঃখী-দুঃখী দেখাবে ওকে। আড়ালে শুধু চোখের জল ফেলবে। আরো মনমরা, নির্জীব হয়ে পড়বে। এখানে প্রণবের কথাটা তাকে একবার বলতেই হবে। মিহির প্রবীরের কথার সুতো ধরে ধীর গলায় বলল, 'সেরকম চেনা-জানা পাত্র তো একজন আমাদের কাছাকাছিই আছে।'

মুহূর্তে সকলের চোখ একসঙ্গে মিহিরের ওপর এসে পড়ল। কেউ কোন কথা বলছে না। শুধু ক্ষীরোদবাবু অন্যদিকে চেয়ে রয়েছেন।

একটু পরে স্নেহলতা শুধোলেন, 'তুমি কার কথা বলছ?'

মিহির শান্ত গলায় বলল, 'আপনারা সবাই তাকে চেনেন।'

মণিময় ওর চোখে চোখে তাকাল, 'কে, প্রণব?'

'হ্যাঁ, আমার তো বেশ ভালই লেগেছে ওকে।'

স্নেহলতা কেন যেন এতে ঠিক খুশি হতে পারলেন না। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু না বলে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন শুধু।

মণিময় একটুক্ষণ নীরব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'এমনিতে তো প্রণব খুবই ভাল ছেলে, সৎ ভদ্র, সে বিষয়ে কারো বলার কিছু নেই, আমি তো ওকে অনেকদিন ধরেই দেখছি।' মণিময় থামল। কি ভেবে এবার হেসে ফেলেছে। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'তা হলেও এটা হয় না, প্রত্যেকেবই একটা আভিজাত্য বংশ-কৌলিন্য আছে ভাই।' মণিময়েব গলা সংযত, দৃঢ়।

মিহির কেমন অবাক চোখে একবার মণিময়কে দেখল। কি আশ্চর্য, নিজের মধ্যেই এত বিরোধ! অথচ বাঙালী জাতের জন্যে এই লোকটাই সেদিন কতই না দুঃখ করেছে। ভণ্ডামি! কথায় আর আচরণে কত তফাৎ! ম্লানভাবে একটু হাসল মিহির। কিছু বলল না।

'এটা তুমি কি বললে মিহির!' সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকায়। একটু পরে আস্তে আস্তে আবার সে বলে, 'এসব কাজ সমানে সমানে হওয়াই ভাল।' ও হাসল।

প্রবীর সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে আনল, বলল, 'অতশত আমার মাথায় আসে না, তবে ওর এক বোন তো টি বি-তে মারা গেছে।'

মিহির ওর মুখের দিকে তাকাল। সামান্য হেসে বলল, 'তুমি না ডাক্তার, এটা একটা কথা হলো ?'

'ডাক্তার বলেই তো মিহিরদা, কথাটা আরো জোর দিয়ে বলছি।' প্রবীর হাসছিল।

মিহির এবার ক্ষুণ্ণ হলো, বলল, 'বেশ তো, তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমার বলার কি আছে!'

সুব্রত হেসে উঠল, 'এটা তোমার অন্যরকম কথা হলো মিহির।'

মণিময় ফের বলল, 'তাছাড়া ওরা অনেকগুলো ভাইবোন, বাড়ি-ঘর-দোর নেই; না না, ওখানে চলে না মিহির, হলে আমি নিজেই প্রস্তাব দিতাম।' বলার মধ্যে ওর অপছন্দটা খুবই স্পষ্ট। যেন দরকার হলে এর চেয়েও আরো রূঢ় কঠিন কথা সে বলতে পারে, বলবেও।

সুব্রত তখনো হাসছে, 'তুমি যাই বল, মাস্টারীতে পয়সা নেই, ওটাও তো দেখতে হবে।'

'তবে তো আমাকেও অপছন্দ কবাব কথা ছিল।'

'এই দেখ, তোমার সঙ্গে ওর তুলনা! ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াও, তাছাড়া দিল্লীতে নিজস্ব বাড়ি।'

'বলুন, বাড়িটাই আমার বড় সার্টিফিকেট!' মিহির সামান্য আহত, ক্ষুব্ধ।

ক্ষীরোদবাবু অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বললেন, 'এসব তর্ক করে লাভ আছে কোন ?'

মণিময় এবার গম্ভীরভাবে বলে, 'ওর জন্যে হঠাৎ তোমার এত ওকালতি ?'

মিহির আড়চোখে তাকাল। ভেতরে ভেতরে ও সামান্য অসহিষ্ণু, উত্তেজিত। একটু উপহাসের গলায় বলল, 'ভুল করছেন, আমি কারো হয়ে এখানে ওকালতি করছি না, তাছাড়া ওটা আমার পেশাও নয়। আপনারা আমার মত চাইলেন, তাই বললাম।'

মণিময় বলল, 'তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'রাগের কথা হচ্ছে না, কল্যাণীকে ছোটবোনের মতন স্নেহ করি বলেই বলেছি। আমার সঙ্গে তো প্রণবের এই ক'দিনের মাত্র পরিচয়। মেয়েটার কথা একবারও ভাবছেন না আপনারা।'

'এতে আর ভাবাভাবির কি আছে?'

স্নেহলতা বললেন, 'সবই বুঝলাম বাবা, বংশ-মর্যাদাও একটা কম কথা নয়!'

ক্ষীরোদবাবু বিব্রত বোধ করছিলেন, বললেন, 'এসব কোন কাজের কথা নয়, ছেলেটা ভাল হলেই হলো।' একটু চুপ করে থেকে আবাব তিনি বললেন, 'এব দরকার আছে খুব।'

দরজার কাছে খুট করে একটা শব্দ হলো। কে যেন ফিরে গেল।

স্নেহলতা ইশারা করলেন। পরে ফিসফিস গলায় বললেন, 'প্রণব বোধ হয় আমাদের কথাবার্তা শুনেছে। ও কখন এলো, টের পাইনি তো!'

'তাই নাকি?' মণিময় তাকাল। একটু চুপচাপ থেকে বলল, 'শুনলে আর কি করব!'

'একদিক দিয়ে এ ভালই হয়েছে, আমাদের আব কিছু বলতে হলো না।' সুব্রত বলতে বলতে মুচকি হাসল।

মিহিরের কেন যেন এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। সে উঠতে উঠতে বলল, 'আমি উঠছি, মাথাটা ভীষণ ধরেছে আমার।' মিহির হাসল না। একটু গম্ভীর, বিষণ্ণ। ধীরে ধীরে ও বাইরে এসে দাঁড়াল। বারান্দায় এসে দেখে দূরে এক কোণায় একটা যুঁই গাছের পাশে কল্যাণী অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মিহির একটা সিগারেট ধরাল। মনে হলো, ওর সামনে সব কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। ক'দিন আগেও বাড়ি জুড়ে কী হইচই! এখন বুঝি একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। মিহির কল্যাণীকে

ডাকতে গিয়েও কি ভেবে ডাকল না। কি ওকে বলবে মিহির! বুকের ভেতরটা কেমন যেন খচ খচ করতে থাকে। মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন আজ আর কিছু নেই তার কাছে। মনে মনে যেন ওকে বলল মিহির: তোমার মিহিরদা হেরে গেল কল্যাণী, হেরে গেল। এবাব তোমাদের এখানে এসে আমি অন্য এক ধারণা নিয়ে যাচ্ছি, জানি না, আর কখনো এখানে আসা হবে কিনা। পার তো, তুমি এটাকে মেনে নিও না কল্যাণী। আমার আশীর্বাদ থাকল পুরোপুরি।

নিঃশব্দ পায়ে সন্ধ্যা নামছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটছে। একমুঠো উদাসী, এলোমেলো হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল।

তের

কি এক কাজে প্রণব এদিকটায় এসেছিল, ঘরে ঢুকতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে তার সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল। শেষের দিকের কিছু কিছু কথা তার কানে গেছে। এ অবস্থায় ভেতরে যাওয়া শোভন নয়, অথচ চলে যে আসবে তারও উপায় ছিল না। কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল প্রণব। অবশেষে অতি সন্তর্পণে, চুপি চুপি ওখান থেকে সে চলে এসেছে। তার সম্পর্কে এদের তবে এই ধারণা? বিশ্বাস করতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। কথাগুলো বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখছিল। বুকের ভেতরটা কেবলই টনটন করে উঠেছে। কি যে করবে বুঝতে পারছিল না। এরপর প্রতিটি মুহূর্ত এখানে থাকা মানে এক ধরনের গ্লানি, অপমান তাকে মনে করিয়ে দেবে। এদের সঙ্গে যে তার মানসিকতা, ভদ্রতাবোধ এগুলোর অনেক ব্যবধান, এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে প্রণব। সমস্ত পরিবেশটাই যেন মুহূর্তে তার কাছে কেমন ঘোলা অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এখানে এখন থাকার অর্থ, নিজেকে ছোট করা, আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া। আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না তার। অথচ এই মুহূর্তে এখানে সকলের সঙ্গেই তাকে হেসে হেসে কথা বলতে হবে, এবং সে যে এদের মনোভাব বুঝে ফেলেছে, এটা তাকে গোপন করে চলতে হবে; ওরাও হাসবে, কথা বলবে, তবু সে হাসির তলায় যে কৃত্রিমতা রয়েছে তা বুঝতে দেবে না। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। মণিময়দা সম্পর্কেও তার ধারণা বদলেছে। হয়তো এরও প্রয়োজন ছিল। এখানে না এলে কি এভাবে এদেরও সে কোনদিন চিনত! এমন স্বার্থপর, 'কন্জারভেটিভ একটা লোককে সে এতদিন অন্যরকম ভেবে এসেছে। কি আশ্চর্য! নিজেরটা ছাড়া জগতে আর কারো দুঃখ মণিময়দা বুঝতে চায় না। বাইরে যে

পোশাকটা পরে আছে, সেটা আসল পোশাক নয়। নকল। সেই মুখোসটাই আজ সরে গেল। এবার যেন ভেতরের সেই অনাত্মীয়, নগ্ন চেহারাটাই ফুটে উঠেছে। প্রণবের কেন যেন মনে হয়েছে, ভদ্রতা-বোধ, সৌজন্য এগুলো পুরুষ-পরম্পরায় রক্তের মধ্যে খেলা করে। মণিময়দার সেই ট্রাডিসন নেই এবং এদের অনেকেরই তা নেই।

ক্লান্ত পায়ে প্রণব ধীরে ধীরে ছাদে উঠে এলো। এখানে কেউ আসবে না এখন। এই মুহূর্তে এমন একটা নিরালা জায়গারই দরকার ছিল তার। আকাশে এখন অনেক তারা ফুটেছে। গাছের পাতার আড়ালে একটা পাখি ডেকে উঠল। ওখানে অন্ধকার একটু ঘন। একটু একটু উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। হিম পড়ছিল। মনটা এসব শোনার পর যেভাবে আলোড়িত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এখন তা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। বাড়ির কথা মনে পড়ল। মার মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। বাণীর চেহারাটাও যেন এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের সঙ্গেই তার রক্তের সম্পর্ক। বাণী বাঁচতে চেয়েছিল, বাঁচে নি। তার বাবাও একজনকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে অন্যরকম শিক্ষা পেয়েছে, এদের সঙ্গে যেন তার অনেক পার্থক্য; অথচ কল্যাণী আলাদা, কৃষ্ণাদিকেও তো এদের গোত্রের মনে হয় না। কল্যাণীর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল; কত কথাই এখন তার মনে পড়ছে! বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। সে যে ভেবে রেখেছিল, দেওয়ালীতে ওকে ভাল কিছু একটা উপহার দেবে। আর দেওয়া হলো না। ও না বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে এবার ওরা দুজনে খুব ঘুরবে, বেড়াবে। এসবই তাহলে শেষ হয়ে গেল! ভাবলেও যে মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। এখানকার সঙ্গে প্রণবের সব সম্পর্কই এবার শেষ। বুকের ভেতরটা আবার হঠাৎ কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে। এখানে সব যেন চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবার। কত কথাই না মনে পড়ে যাচ্ছে তার। চোখদুটো:

কেমন জালা জালা করছে। আকাশের দিকে তাকায় প্রণব। কি ভেবে আস্তে আস্তে গাইল, 'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা/হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই—/আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরো ঝরো বারি ধারা/চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি/আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি/আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—/জনমের মতো হয়ে গেল হারা।'

শেষের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে ঠোঁট দুটো বার বার কেঁপে কেঁপে উঠেছে প্রণবের। চোখের পাতাও কেমন ভারী হয়ে এলো। বুকের ভেতরে কি এক গভীর ব্যথা যেন মৃদু পায়ে হেঁটে চলেছে। গানটা সে শেষ করতে পারল না। শেষের দিকে সুরটা কেমন যেন ফোঁপানো কান্নার মতন ভেঙে পড়ল। বুকের খাঁচাটা গাঢ় বেদনায় ভরে গেছে। সত্যিই জনমের মতই বুঝি তার ভালবাসার পাত্র-পাত্রীরা একে একে এমনি করে চলে গেল। সুর এবং কথাগুলো যেন এখন অন্ধকারের গায়ে গায়ে ঘুরছে। অভিভূতের মতন সে দাঁড়িয়ে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রণবের খেয়াল হলো, তার পেছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। দেখল, কল্যাণী। তার চোখ ছলছল। মুখ-চোখ শুকনো, ফ্যাকাশে। সে কিছু বলার আগেই কল্যাণী বলল, 'এভাবে অন্ধকারে যে তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ?' ধীরে ধীরে কথাটা বলে প্রণবকে একবার অপলকে দেখল, পরে চোখ আনত করল।

প্রণব সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। সে-ও চোখ তুলেছে। ওকে দেখতে দেখতে ম্লানভাবে হাসল একটু, বলল, 'অন্ধকারই যে আজ আমার বড় আশ্রয় কল্যাণী।' প্রণব চোখ সরিয়ে আনল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। পরে আবার সে বলল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'অনেকক্ষণ, তুমি তখন গাইছিলে।' কল্যাণী মুখ তুলে তাকাল। সামান্য ভেবে নিয়ে পরে অস্ফুটে বলল, 'এসব গাইছিলে কেন?'

প্রণব ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, বলল, 'এ ছাড়া যে আর মনে এলো না কিছু।'

কল্যাণী আবার চুপ করে থাকে। তারও বুকের ভেতরে কি এক উথালপাথাল চলছে। চোখ জলে ভরে উঠেছে বার বার। সে-ও নীরবে চোখের জল মুছেছে এতক্ষণ। নিজেকে সংযত রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'ওদেব কথাটাই সব নয় প্রণবদা।' গলাটা কেমন কেঁপে উঠল কল্যাণীর। বুকের ভেতরে আবেগ যেন আবার ফুলে ফুলে উঠতে চায়। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ও। ভেজা নরম গলায় একসময় ও বলল, 'আমার, আমারও একটা কথা আছে, ওদের কথাই সব নয়।'

'এদের কাছে তার দাম আর কতটুকু বল।'

কল্যাণী আরও একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি আমার বাবাকে ভুল বুঝো না, আমি তো তাঁকে জানি।'

প্রণবের গলায়ও অভিমান ফুটে ওঠে, 'কাউকেই আমি ভুল বুঝি নি, শুধু নিজেকেই এতদিন ভুল পথে নিয়ে এসেছি।'

কল্যাণী আবার চুপ করে থাকে। খানিক পরে বলল, 'এত সহজে কিছুই হারায় না।'

'আমার যে আরও হারিয়েছে কল্যাণী, তাই এত ভয়।' প্রণব চোখ তুলে ওকে দেখল একটুক্ষণ। ধীরে ধীরে বলল, 'আমি দেখছি, আমার কপালটা বড় পাথর-চাপা কপাল, সুখ সয় না।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'এভাবে বলো না তো।'

প্রণব হাসল। হাসিটা কেমন শুকনো ও ম্লান দেখাল। একটু নীরব থেকে বলল, 'তোমাদের ক'দিন খুব বিরক্ত করে গেলাম।'

'আবার বাজে কথা বলছ?' গলার স্বরটা একটু ভাঙা ভাঙা, করুণ শোনাল।

প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকল, বলল, 'বিশ্বাস কর কল্যাণী, আমার আর কিছু থাকল না।'

কল্যাণীর চোখে জল। প্রণবকে এক পলক দেখল। কিছু বলল না। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপল সামান্য।

প্রণব বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন ব্যাপারেই মিল নেই, অথচ আমি কি বোকা দেখ, এটা আজই প্রথম টের পেলাম।' হাসবার চেষ্টা করল প্রণব।

'এসব বলে আর কষ্ট দিও না তো আমাকে, আমি আর পারছি না।' কল্যাণীর গলা ধরে এলো। চোখেব পাতা বিষণ্নতায় আর্দ্র।

প্রণবের ভেতরেও অনেকক্ষণ ধরে একটা দুঃখ ছটফট করছে। কথাগুলো সে ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে বলে নি, আসলে নিজেকেই যেন শোনাচ্ছে। আগের কথার সুতো ধরেই আবাব সে বলে, 'চট করে আমি মানুষকে বড় বিশ্বাস করে ফেলি।' আবার ক-মুহূর্ত ভাবল। বলল, 'এই মণিময়দার ভেতরেই যে দুটো ভিন্ন মানুষ পাশাপাশি বাস করছে, এটা আমি আগে কখনো জানতে পাবি নি, জানলে কখনই এমন ভুল করতাম না।'

'দাদাভাই-ই কি এ-বাড়িব সব?' কল্যাণী তাকাল চোখে চোখে। বুকেব ভেতরটা আবার ভারী হয়ে উঠছে।

'হয়তো সব নয়, কিন্তু কথাগুলোর জ্বালা যে এখনও আমি ভুলতে পারছি না।'

'তুমি এমন করে ভাবছ কেন; দাদাভাইয়ের কথা দিয়ে তুমি আমাকে বা আমার বাবাকে বিচার করো না।' কল্যাণী সজল চোখে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

'আমি আমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিচার করছি না।' অল্পক্ষণ নীরব থেকে ফের বলল, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, সবটাই কেমন স্বপ্নেব মতন লাগছে।'

কল্যাণী চোখে চোখে চেয়ে আছে, বলল, 'যা' একটু একটু করে গড়ে উঠেছে, একটা কথায় তা শেষ হয়ে যায় না প্রণবদা। তুমি কি ভাবছ অত সহজেই আমি মেনে নেব এটা?

'কেন, এঁরা তো তোমার মঙ্গলই চান।'

'মঙ্গল না ছাই!' কল্যাণী নিজেকে আর সামলাতে পারল না; চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো তার। চোখে আঁচল চাপা দিল। আবেগে থরথর করে কাঁপছিল ও। সহজ হতে একটু সময় নিল। সব থিতিয়ে এলে মুখটা মুছে নিতে নিতে ও বলল, 'ঠিক আছে, আমিও দেখব!'

অদূরে কোন ঝোপের ভেতর থেকে একটা পাখি কেঁদে উঠল। কেউ কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। অন্ধকারের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল। একসময় প্রণব মন শক্ত করেছে। বলল, 'আমি কালই চলে যাচ্ছি কল্যাণী।' কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা কেমন কেঁপে গেল তার। সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়েও চোখ সরিয়ে নিল প্রণব। আজ যেন সে একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা আবো টনটন করতে লাগল।

কল্যাণীও চমকে উঠেছে। তাকাল। অস্ফুটে বলল, 'কালই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, কালই।' প্রণবের এই মুহূর্তে ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এ জায়গাব সঙ্গেই তার বরাবরের একটা বিরোধ যেন। তার জীবনের দুঃখের পৃষ্ঠাগুলো এখানে অভিশাপের মতন পড়ে থাকল। একদিন সে তার বাবাকে বোনকে হারিয়েছে এখানে, আজ আবার তার ভালবাসা, স্বপ্ন, সব কিছুকে চুপি চুপি রেখে যাচ্ছে। বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। মানুষ কি এতই নির্মম, নির্দয়?

কল্যাণী যেন আর দাঁড়াতে পারছে না এখানে। তার মাথাটা কেমন ঘুরছে; চোখ বার বার ঝাপসা হয়ে উঠছে শুধু। ও মুখে আঁচল ঢেকে ছুটে চলে গেল।

কথাটা একসময় সারা বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়ল। সব সুর এক মুহূর্তে যেন কেটে গেল। এবার সবারই চলে যাওয়ার পালা। ক্ষীরোদবাবুর কাছে এটা যেন দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জনের বেদনার মতন। আর প্রণবকে দিয়েই এর শুরু।

চোদ্দ

সূর্য ডুবছে। আকাশে ম্লান, আবছা ছায়া। মাঠে প্রান্তরে হিম জমছে। থেকে থেকে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছিল। ধূসর ঝিমধরা আলোও যেন যাই-যাই করছে এবার। পাখির দল কুলায় ফিরছে। সমস্ত চরাচরে কি এক বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হচ্ছে। ক্ষীরোদবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে আছেন। দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ, স্থির। গায়ে চাদর জড়ানো। শীত-শীত করছে, তবু ওঠার নাম করলেন না তিনি। আজ ক'দিন ধরে তাঁর এভাবেই কাটছে। ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না। আরো ফাঁকা লাগে। সব সময়ই বিরাট এক শূন্যতা যেন তাঁকে গ্রাস করতে চারপাশ থেকে হা-হা করে ছুটে আসছে। এত নিঃসঙ্গ নিজেকে আর কখনো মনে হয় নি। কিছুই ভাল লাগছে না। ক'দিন আগেও বাড়িতে কত লোকজন, চেঁচামেচি। গোটা বাড়িটাই যেন খুশিতে ঝলমল করছিল। এমন ছবি বহুকাল তিনি দেখেন নি। হিমানীশ, ওর বউ ছেলেমেয়েরা, আর শিবেন এলে ছবিটা নিখুঁত হত। তাহলেও, তিনি এর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন ক'দিন। তাঁর শরীরে কোন কষ্ট, কোন উপসর্গ ছিল না। তখন একবারও মনে হয় নি যে, এই সুখের ছবিটা একসময় তাঁর চোখের সামনে থেকে সরে যাবে; থাকবে না, কোন সময়ই হয়তো আর তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পর কষ্টটা আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। এই নির্জনতা, শূন্যতাবোধ তাঁকে যেন ক্রমশই কোথায় নিয়ে যাবে এখন। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়লে তাঁর বুকের ভেতরটা যে কী করতে থাকে না! এই তো মৈত্রেয়ীরা ঠিক এ জায়গাটায় সেদিন 'শ্যামা' করেছে, রুবিরা 'বিদায় অভিশাপ'। তখন কত লোক, কত আনন্দ! সবার সঙ্গে তিনি এই সুখকে ভাগ করে নিয়েছেন। এটা তখন এক উৎসব-বাড়ি। উৎসব আজ শেষ,

যে যাঁর জায়গায় ফিরে গেছে আবার। কিন্তু তার চিহ্নগুলো এখনো অগোছালভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সত্যটাই আজ তিনি বেশী করে উপলব্ধি করছেন। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যান।

রীণাটা যাওয়ার সময় খুব কেঁদেছিল। তিনিও চোখের জল মুছেছেন। আর কি কখনো তাঁর দেখা হবে এদের সঙ্গে! ক'দিন তো সমানে কান্নার পর্বই চলেছে। বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যায়। আর বুঝি সইতে পারবেন না! সংসারে কাউকেই ধরে রাখা যায় না, এ বোধটাই তাঁকে অহরহ যন্ত্রণা দিয়েছে। ওরা এসে সব কেমন ওলট পালট করে দিয়ে গেল। এ ক'দিন ধরে একটা কথাই তাঁর বার বার মনে হয়েছে, তিনি আর ওদের কখনো দেখতে পাবেন না। এবারের আনন্দটুকুই তাঁর শেষ পাওনা। বাকী যে কটা দিন তিনি বাঁচবেন, এই স্মৃতিই হবে তাঁর আশ্রয়। একটা জিনিস তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এলো। এরার সব মায়া-মমতার বাঁধন ছেঁড়ার পালা। সব ফেলে রেখে চলে যাবেন এখান থেকে। বিদায়, বিদায় তোমাদের সবার কাছ থেকেই। এখন শুধু এরই জন্যে অপেক্ষা করছেন। সেই সুরই যেন তিনি সর্বত্র শুনতে পান আজকাল। কোথায় যাবেন? তা তো তিনি জানেন না! শুধু এটুকুই বুঝতে পারেন, চিরকালের জন্যে তাঁর এই চলে যাওয়া, কেউ আর কোনদিনও তাঁকে ফিরে পাবে না। তিনিও আর ফিরে আসবেন না এদের কাছে। সব কেমন রহস্যে ঘেরা। বুকে বড় ব্যথা। বড় যন্ত্রণা। কেন যে এত মায়া, এত দুর্বলতা! যাদের নিয়ে এই আনন্দ হইচই করলেন এতকাল, সব কিছুর শেষ এবার। সব খেলার অবসান। ভাবলে ভীষণ খারাপ লাগে। তাঁর দাদাও আজ কতকাল হয়ে গেল তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। ইদানীং দাদার কথা খুব মনে পড়ে; তন্দ্রার মধ্যে তিনি মা-বাবার মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁরা এসে তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্ধকারের মধ্যে কানের কাছে ফিসফিস করে কি যেন কথা বলেন। কত কি স্বপ্ন দেখেন তিনি।

ছেঁড়া ছেঁড়া, আবছা স্বপ্ন। শ্মশান, নদী, শেয়াল। দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে। কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে 'বলো হরি, হরিবোল' বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। কী এক অস্বস্তিতে তিনি জেগে ওঠেন। অনেকক্ষণ আর তাঁব ঘুম হয না। ছটফট কবেন।

বাসনা যাওয়ার সময় ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিল, 'এখানে এভাবে একা একা আপনি থাকতে পারবেন না বাবা, হয় প্রবীরের কাছে চলে যান, বা আমার এখানে এসে থাকুন।'

ক্ষীরোদবাবু ওর মুখেব দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আর সময় নেই রে যাওয়ার ; তাছাড়া এই ভিটে ছেড়ে আমি যেতে পারি না, আমার বাবা মা দাদা এখানেই মরেছেন, আমিও ওঁদের পাশেই থাকতে চাই।' ক্ষীরোদবাবুকে কেমন ক্লান্ত উদাসীন, একটু বিষণ্ণও দেখাচ্ছিল তখন।

বাসনা চোখের জল মুছতে মুছতে অস্ফুটে বলেছিল, 'আরেকবার এসে আপনাকে আর দেখতে পাব না।'

ক্ষীরোদবাবুর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, 'আমারও সবাইকে ছেড়েছুড়ে এভাবে থাকতে ভীষণ কষ্ট রে।'

'শরীরের যত্ন নেবেন, চিঠি দিয়ে জানাবেন সব।' বাসনা বলেছিল।

ক্ষীরোদবাবু অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ভগবান তোদের সুখে রাখুন, আশীর্বাদ করছি, সুখী হ তোরা।'

জয়ন্তীরাও তাঁদের জন্যে গভীর এক কষ্ট নিয়ে ফিরে গেছে।

ক্ষীরোদবাবু ওদের দেখে এবার খুশিই হয়েছেন। ওরা ভালই আছে। ওদের ছেলেমেয়েগুলোও ভালই হয়েছে। জয়ন্তীর ছেলে শুভ তো পড়াশুনায় বেশ ভাল, শুনলেও আনন্দ হয়। সুব্রত, মিহির, শুধু ওরাই নয়, মণিময়রাও আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ওরা সুখে

আছে জানলেও বুকটা শান্তিতে ভরে যায়। একমাত্র কৃষ্ণার জন্যেই তাঁর মনটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়। তিনি ওকে এখানে আরো কিছুদিন থাকতে বলেছিলেন। ও থাকল না। ওদের সবার জন্যেই তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ। তিনি যে এদের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন। বংশ-পরম্পরায় দীর্ঘদিনের যে রক্তধারা তাঁর মধ্যে প্রবাহিত, তিনিও উত্তরপুরুষের মধ্যে সেই ধারাই ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি মনে করেন, এই রক্তকে নিজের নিজের সাধনা দিয়ে দোষমুক্ত, পবিত্র ও শোধন করতে হয়; খুব কঠিন সে-দায়িত্ব। কঠিন সে-সাধনা। মাঝে মাঝে নানারকম প্রলোভনে, অসাবধানে দূষিত হয় সে-রক্ত। সেখানে ভাবী কালের কত রকম সর্বনাশ, অনর্থ অপেক্ষা করে। তিনি এটা বিশ্বাস করেন, ভাল বীজ না হলে, ভাল ফসল হয় না। খুব সূক্ষ্মভাবে অন্তরালে নিয়ত এর কাজ চলেছে। তিনি দেখেছেন সংসারে অধিকাংশ মানুষই বাইরেটা দেখে বিচার করে, কোন কিছু তলিয়ে দেখতে চায় না। তিনিও যে সবসময় পারেন, তা নয়। এরা ভালভাবে আছে, এটুকু জেনেই তিনি আনন্দিত; কিন্তু যখনই মনে হয় এসব ছেড়ে তিনি চিরকালের জন্যে চলে যাবেন, আর কখনো ফিরবেন না, এবং সময় খুব কাছে চলে এসেছে, তখন মনটা গভীর এক দুঃখে ভরে যায়। আজ খানিকটা মোহহীন মনে ভেবে দেখলে মনে হয়, এতদিন তিনিও অনেক পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনার পেছনে অন্ধের মতন শুধু ছুটোছুটি করেছেন। কিন্তু তার জন্যে তিনি কোনদিনও তাঁর বিবেক মনুষ্যত্ব পুরোপুরি বিসর্জন দেননি। সান্ত্বনা এটুকুই। এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তিনি কখনো ক্লান্ত, কখনো বা সফল পুরুষ; শুধু তাই নয়, এই বুননের ভেতর দিয়ে দিয়ে আজ এমন একটা জায়গায় চলে এসেছেন যে দেখে মনে হয়েছে, কি দরকার ছিল এর! এখানে তিনিও সবসময় সতর্ক থাকতে পারেন নি। তাঁরও অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে। অনুশোচনা করার মতন কিছু কিছু কাজ তিনিও রেখে যাচ্ছেন। অনেকটা যেন

নেশার মতন। এবার সেই নেশা কেটে গেছে তাঁর। আর সেই সঙ্গে সময়ও ফুরিয়ে এলো। তবু, এখনও কয়েকটা কাজ তাঁর বাকী থেকে গেল। প্রথমত, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, কল্যাণীর বিয়ে। কোনটাবই সমাধান হয়তো তিনি আর করে যেতে পারবেন না। পারলে খুশি হতেন। মনের মধ্যে কেমন খচখচ করতে থাকে।

চলে যাওয়ার আগে মণিময় আর প্রবীরকে একবার ডেকেছিলেন ক্ষীরোদবাবু। বলেছিলেন, 'তোদের একটা কথা বলতে চাই, হয়তো এরপর আর সময় পাব না।'

ওরা চুপ করে থাকল।

ক্ষীরোদবাবু আরো খানিকটা সময় নিয়ে বললেন, 'আমি থাকতে থাকতে এ-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।'

মণিময় আস্তে আস্তে চোখ তুলে কাকাকে একবার দেখল। আরও একটু সময় নিয়ে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ক্ষীরোদবাবু অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। কি ভেবে ওর মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'না বোঝার কিছু নেই; এই বাড়ি নিয়ে একটা কিছু এবার ভাবতেই হবে তোদের।'

মণিময় মাথা নিচু করে রেখে বলল, 'আমার পক্ষে তো এখানে এসে এখন থাকা সম্ভব নয়।'

ক্ষীরোদবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখে-মুখে উদাস, ম্লান এক ছায়া পড়েছে। ধীরে ধীরে বললেন, 'বুঝতে পারছি, তোদের কারো পক্ষেই আর এখানে থাকা সম্ভব নয়।' একটু পরে ফের বলেছিলেন, 'তাই যদি হয়, তবে আর বাড়িটা ফেলে রাখার কি দরকার, বেচে দিলেই হয়।'

মণিময় প্রবীরের মুখের ওপর চোখ রেখে মৃদু হেসে বলেছিল, 'তুই তো এখানে এসে প্র্যাকটিস করতে পারিস?'

প্রবীরও বলে উঠল, 'সে তো তুমিও এসে থাকতে পার।'

ক্ষীরোদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'বলছি তো, বাড়িটা বেচে দিই ; কাজের ক্ষতি করে তোদের কাউকেই এসে বাড়ি পাহারা দিতে বলছি না।'

মণিময় অল্প হেসে বলল, 'এখনও তো মাঝে মাঝে এসে আমরা একটু বেড়াতে-টেড়াতে পারি, বেচে দিলে আর আসা-টাসা হবে না।'

ক্ষীরোদবাবু ওর চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলেন, 'আমরা এতগুলো ভাইবোন এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলাম, তোদের ছেলেবেলাও এখানেই কেটেছে, সারা বাড়ি গমগম করত তখন, আর এখন? সবাই যে যার মতন ছিটকে পড়েছে। এভাবে এত বড় বাড়ি ফেলে রাখলে শেষকালে ভূতের বাড়ি হবে।'

এরপর মণিময়রা আর কোন কথা বলেনি।

ক্ষীরোদবাবু বাড়িটার জন্যে মমতাবোধ করছিলেন। থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বাগানের দিকে। এখন কত ফাঁকা হয়ে এসেছে, অথচ আগে এমন ছিল না। আজ এই অবেলায় তাঁদের অনেকের কথাই মনে পড়ল। এটাই তাঁদের পিতৃভিটা। তিন-চার পুরুষ আগে এই বংশেরই কেউ এখানে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। আজ এতকাল পরে আবার সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। এঁরা আছেন বলে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়, পরে তাও হবে না। সবাই আলাদা, বিচ্ছিন্ন। এমনি করেই একদিন কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক থাকবে না। ক্ষীরোদবাবু দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলেন। ভেতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। তিনি ওদের বলেছেন বটে, বাড়ি বেচে দেবেন। এটা তাঁর মনের কথা নয়। মনের কথা হতে পারে না। এতকালের বাড়ি তিনি ইচ্ছে করলেই বেচতে পারেন না। এখানে তাঁদের কত স্মৃতি, হাসি কান্না। বরং চাপা এক অভিমান, ক্ষোভ ছিল ওঁর মধ্যে।

ওরা সবাই একসঙ্গে এসে থাকুক, এটাই তিনি চেয়েছেন। তিনি যেন চোখের সামনে দেখছেন, বাড়িটার এখানে-ওখানে জঙ্গল হয়েছে, পরিত্যক্ত। ইঁট-কাঠ সব চুরি হয়ে গেছে। সাপ-টাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। দেখতে দেখতে এই বাসযোগ্য ভিটেটাই হিংস্র শ্বাপদে ভবে যাবে। বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। নিজেরা কেউ এসে না থাকলে এই দশাই হবে।

ক্ষীরোদবাবুর বিষণ্ণ চোখদুটোতে এখন কী এক ঘোর নেমেছে যেন। মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া ছুটে আসছে। বাসনার কথা মনে পড়ল, ও আর তাঁকে দেখতে পাবে না, এই ভয়েই মেয়েটার সেদিন কী কান্না! তিনিও জানেন, ওদের সবার সঙ্গেই তাঁর শেষ দেখা। সবার ক্ষেত্রেই তো এই নির্মম নিয়তি অপেক্ষা করে রয়েছে। তবু কেন এত ব্যথা, ছটফটানি, এত আকুলতা!

স্নেহলতা এসে পাশে দাঁড়ালেন। তিনিও যেন কেমন ভেঙে পড়েছেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বললেন, 'ঠাণ্ডায় বসে থাকলে তো শরীর আরো খারাপ হবে, ঘরে চল।'

ক্ষীরোদবাবু স্নেহলতার দিকে চেয়ে থাকলেন একটু সময়। ম্লান-ভাবে হাসলেন সামান্য, বললেন, 'আর খারাপ হওয়ার কি আছে স্নেহ; তবু এখানটায় বসলে একটু ভাল লাগে।'

স্নেহলতা চুপ করে থাকলেন। তিনিও বুকের মধ্যে গভীর এক যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। একটু পরে বললেন, 'বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে, তাকান যায় না।' বলতে বলতে গলাটা কেমন নরম হয়ে এলো স্নেহলতার। চোখ জলে ভরে উঠেছে। আঁচলে চোখ মুছলেন।

'এসব ভাবলে তোমার কষ্টই বাড়বে।'

'আমি কি ভাবতে চাই নাকি, চাইলেই মনে পড়ে যায় সব।'

ক্ষীরোদবাবু চোখ ফেরালেন অন্যদিকে। একটু পরে ধীর গলায় বললেন, 'দেখলাম, এসব ভেবে আর লাভ নেই এখন; ওদের

এখানে এসে থাকার কারো ইচ্ছে নেই। আমরা যে-ক'দিন আছি, এই।'

'হ্যাঁ গো, আমার যে আর এখানে এক দণ্ডও ভাল লাগছে না, ওদের·কাছ থেকে ক'দিনের জন্যে ঘুরে এলেও হয়।' স্নেহলতার গলা ভাঙা ভাঙা শোনাল।

ক্ষীরোদবাবু কিছু বললেন না। তিনিও স্নেহলতার দুঃখ বোঝেন। ওরা আসায় স্নেহলতা যেন আবার সুখের দিনগুলো ফিরে পেয়েছিল। গান-টানও গেয়েছে। স্নেহলতাকে তখন একটু অন্যরকম মনে হয়েছে তাঁর। তিনি বললেন, 'যাও না, ঘুরে এসো, ভাল লাগবে।'

'সে যে কত যাওয়া হবে আমার জানা আছে।' খুব আস্তে আস্তে স্নেহলতা বললেন।

ক্ষীরোদবাবু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন একটু সময়। কেমন যেন মায়া হলো তাঁর। তিনিও জানেন, ও তাঁকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না; যায় নি কখনও। সংসারের কত রকমের ঝড়-ঝাপ্টা তাঁর ওপর দিয়ে গেছে, তখনো স্নেহলতা তাঁর পাশে। অথচ ওকেও ছেড়ে চলে যেতে হবে এবার। ভাবলেও কষ্ট হয় ভীষণ। মনে মনে যেন বলতে ইচ্ছে হলো: স্নেহ, শেষে তোমাকেও ছাড়তে হবে। তোমার কাছে যে আমার ঋণের শেষ নেই। আমি চলে গেলে তুমি এখানে একা একা থাকতে পারবে না, কষ্ট হবে খুব; তুমিও তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমরা তো একদিনের জন্যেও ছাড়াছাড়ি হই নি গো।

ক্ষীরোদবাবু এসব ভাবতে ভাবতে আরো যেন অন্যমনস্ক হলেন। চোখের পাতা কী এক বিষণ্ণতায়, ব্যথায় যেন ভিজে উঠেছে। একটু পরে ওর দিকে চেয়ে ম্লানভাবে হাসলেন একবার, বললেন, 'সত্যি, আমি তোমাদের সবাইকেই বড় দুর্ভোগে ফেলেছি।' বলতে বলতে চোখ অন্যদিকে ফেরালেন।

'হয়েছে, এসব তো অনেক শুনেছি।' স্নেহলতা ওঁর চোখে চোখে

তাকালেন, বললেন, 'আমি যাচ্ছি, আর ঠাণ্ডা না খেয়ে এবার ঘরে এসো।' স্নেহলতা চলে গেলেন।

অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষীরোদবাবু তবু বসে রইলেন।

একটু পরে কল্যাণী এসে চা দিয়ে গেল। তিনি ওর দিকে ভাল করে তাকাতে পারলেন না। মেয়েটা বড় কষ্ট পেয়েছে। ওর কষ্টট অন্যধরনের। মণিময় সুব্রত প্রবীর ওরা কিছুতেই রাজী হলো না। তিনিও ওদের ওপর কিছু বলতে পারলেন না। মিহিরের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল; তাছাড়া এটা তো ঠিক, মেয়ের ইচ্ছেটাও ওদের একবার বিবেচনা করা উচিত। ওর নিজেরও বোঝবার শক্তি হয়েছে। প্রণবকে ওর খুব পছন্দ। হতেই পারে। ওর সম্পর্কে কল্যাণী আগেও তাঁর কাছে কিছু কিছু বলেছে। এবার নিজের চোখেই ছেলেটিকে তিনি দেখেছেন। আলাপ করে ভাল লেগেছে, ভদ্র, রুচিবান। কিন্তু মিহির ছাড়া আর সবারই আপত্তি। ওর মাথার ওপর অনেক দায়-দায়িত্ব। আরে, দায়িত্ব নিতে পারে বলেই তো ছেলেটিকে তাঁর আরও পছন্দ। এসব কাজের ভেতরেই মানুষেব চরিত্র বোঝা যায়। মানুষ খাঁটি হয়ে ওঠে। এই চরিত্রটাই আসল বস্তু। তবু তিনি ওদের কথার সোজাসুজি প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মেনে না নিয়ে উপায়ও নেই তাঁর। ওরা যা ভাল বুঝবে, বলবে, তাই হবে। প্রণবও এখান থেকে হয়তো অন্যরকম ধারণা নিয়ে গেছে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদেই সারা। ওর জন্যে তিনি এই মুহূর্তে চাপা, ভারী এক যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। তিনি যেন ওর হাসিমুখ আর দেখে যেতে পারলেন না। এই কষ্ট নিয়েই তাঁকে চলে যেতে হবে! এ ব্যাপারে স্নেহলতাও তার বিপক্ষে। আশ্চর্য! বুকের মধ্যে যেন এখন ছট-ফটানো এক কষ্ট।

অন্ধকার দেখতে দেখতে আরো ঘন হলো। কেন যেন মনে হচ্ছে, তাঁকে ঘিরে ওখানে এখন কী এক গভীর ষড়যন্ত্র। কল্যাণীকে সুখী দেখে যেতে পারলে তিনি অন্তত অনেকখানি স্বস্তি, শান্তি বোধ

করতেন। কিন্তু তা যেন হওয়ার নয়। তিনি এক অস্থিরতায় কেবলই ক্লান্ত, ক্লান্ত হচ্ছেন। এবার যেন শেষ হয়ে এলো সব। কারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাঁর মা বাবা দাদা আরো অনেকের কথা খুব মনে পড়ছে ক'দিন ধরে। মনে হচ্ছে, জীবনের সেই উচ্ছল সুখের দিনগুলো কি এতই ক্ষণিক, ভঙ্গুর? সে-সব দিন কি আর ফিরে পাবেন না তিনি, ফিরে পাওয়া যায় না? হায় রে, মানব-জীবন! বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। এটাই কি তবে আসল চেহারা? অন্তহীন একাকার অন্ধকার, নিঃসঙ্গতার মধ্যেই কি মানুষের শেষের এই যাত্রা? ক্ষীরোদবাবুর মনে হলো, এখানে তাঁর পাশে কেউ নেই; না ছেলে-মেয়েরা কেউ, না স্নেহলতা। অথচ এর কেন্দ্র বিন্দুতে তিনিই ছিলেন একমাত্র নায়ক। একদিন নিজের হাতেই তিনি এই সংসার সাজিয়েছেন। আজ যেন ওগুলো বিস্মৃত, কোন জীর্ণ স্মৃতির অনুজ্জ্বল, মলিন এক অধ্যায়। সেই ঘন জমাট অন্ধকার যেন তাঁকে এখান থেকে এবার অনেক দূরে নিয়ে যাবে। একে আর ঠেকাতে পারবেন না।

তিনি যেন এখন আবার সেই স্বপ্নের ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন। শ্মশান-যাত্রীরা খই ছিটোতে-ছিটোতে খোল-করতাল বাজিয়ে একটা শব নিয়ে চলেছে। মৃতের কপালে চন্দনের তিলক। চোখের পাতায়, ঠোঁটের ওপর তুলসী পাতা। ধূপকাঠি, ফুলের মালা। এই শেষ সাজও কত সুন্দর, কত করুণ! বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে ওঠে। স্বপ্নের ওই মৃতদেহটা আসলে কার? তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। 'বলো হরি হরিবোল' শব্দটা বাড়তে বাড়তে আবার একসময় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে। চিতা জ্বলছে। পাশেই নদী। দেখতে দেখতে শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সব শেষ। কেন যে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে! গলার কাছে অস্ফুট এক আর্তনাদ। এই মুহূর্তেও তিনি পরমপিতার কাছে মনে মনে বিনীত

প্রার্থনা জানালেন : হে আমার দয়াল ঠাকুর, তুমি এদের সুখী করো, সুখী করো।

বুকের মধ্যে তাঁর তখনো যন্ত্রণা। অথচ তিনি কিছু বলতে পারছেন না। পাখিরাও ঘরে ফিরেছে। প্রান্তরে এলোমেলো হাওয়া। অনেক দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন কানে আসে। আবার সব শান্ত, স্তব্ধ। শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকাব। চোখে ঘোর, আচ্ছন্ন ভাব।

ক্ষীরোদবাবু কেমন অসহায় বিমূঢ়েব মতন বসে থাকলেন শুধু। তাঁর চোখে এখন জল।